নির্বাচিত বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের উপন্যাসে অভিযান প্রকল্প:

বিশ্বযুদ্ধ ও উপনিবেশের চৈতন্য

পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক:

সৈকত ব্যানার্জী

তত্ত্বাবধায়ক:

রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

Certified that the Thesis entitled

নির্বাচিত বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের উপন্যাসে অভিযান প্রকল্প: বিশ্বযুদ্ধ ও উপনিবেশের চৈতন্য

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Rajyeswar Sinha. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for anydegree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Candidate

Prof. Rajyeswar Sinha

Saikat Banerjee

Dated:

Dated:

স্বীকৃতি

‘শিশু-কিশোর সাহিত্য’ আর ‘বড়োদের সাহিত্য’— সাহিত্যের এই দুইভাগের মধ্যে কোনো জলঅচল বিভাজিকা নেই। শিশু কিশোরদের সাহিত্য বড়োদের দ্বারা রচিত তো বটেই, পঠিতও হয় অনেক সময়েই এবং তা কেবল শৈশবের স্মৃতি রোমন্থনের উদ্দেশ্যেই নয়, সাহিত্যের রস আস্বাদনের জন্যও। সাহিত্য পাঠকের রুচিবোধ নির্মাণ করে, এ কথা জানা। শৈশব-কৈশোরে পঠিত সাহিত্য শিশুর মধ্যে রুচির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অবস্থানকে গড়ে তুলতেও সক্রিয় থাকে। বড়োদের শিশু সাহিত্য পাঠ অনেকসময় সেই আশৈশব আঁকড়ে রাখা নৈতিক অবস্থানগুলিকে পুনঃসমর্থন জানায়। চেনা জানার ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে অজানায় অভিযানের কাহিনি শিশু-কিশোরদের মনে রোমাঞ্চ ও বিস্ময় উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অবস্থান নির্মাণের প্রক্রিয়াটিও চালিয়ে যায়। বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় এই ধরনের সাহিত্য তাই শিশু-কিশোরদের দৃষ্টিভঙ্গিকে দীর্ঘকাল ধরে প্রভাবিত করে আসছে। কল্পনাশক্তি ও জানার আকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলার পাশাপাশি নৈতিক ও মতাদর্শগত কিছু উপাদানাও সঞ্চারিত করে আসছে পাঠকদের মনে। শিশু-কিশোরদের চেতনায় কেমন ছাপ এই ধরনের সাহিত্য তৈরি করছে, আর্থ-রাজনৈতিক কেমন বাতাবরণ থেকে এই সাহিত্যগুলির সূচনা ও বহমান থাকা, এই গবেষণায় তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি আমি।

গবেষণা প্রকল্পের অভিমুখ নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোতে স্তরে স্তরে তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলোচনা করে সমৃদ্ধ হয়েছি। কোনো স্বীকৃতিই তার জন্য যথেষ্ট নয়। গবেষণা প্রকল্প নিয়ে ভাবনার প্রাথমিক স্তর থেকে ভাবনাকে রূপদানের পরিকল্পনায় এবং গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নানা জটিল স্তরে যার সহায়তা, মতামত ও প্রেরণা আমাকে উপকৃত এবং উদ্দীপ্ত করেছে তিনি অধ্যাপক আব্দুল কাফি। নিয়মতান্ত্রিক কৃতজ্ঞতায় তার ঋণ শোধ হওয়ার নয়। গবেষণাকালে

বিভিন্ন বইপত্রের সন্ধান ও মতামত দানের মাধ্যমে অকৃত্রিম সহযোগিতা করেছে, সুহৃদ অনল পাল। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সিরিজগুলি যতদূর সম্ভব একত্রে বই আকারে প্রকাশ করেছেন সমুদ্র বসু। বইগুলির সন্ধান দেওয়ার জন্য সমুদ্র বসুর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বইয়ের আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রেখেছে সুহৃদ অর্ণব ঘোষ। গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে দীর্ঘ তর্কবিতর্ক ও মত বিনিময় করে চিন্তাসূত্রকে সংহত করতে সহযোগিতা করেছে সুহৃদ প্রলয় মণ্ডল, বিহঙ্গ দূত ও সহকর্মী অভিজিৎ গোস্বামী। ইংরাজি সাহিত্য বিষয়ে ও ইংল্যান্ডের ইতিহাস বিষয়ে বইপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত দান করে আন্তরিক সহযোগিতা করেছে সহকর্মী, ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষিকা পূজা চ্যাটার্জী। ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা তথ্যকে বিচার করে, মতামত দান করে ও আফ্রিকার ইতিহাসের বিষয়ে বইয়ের সন্ধান দিয়ে অশেষ উপকার করেছেন সহকর্মী, ইতিহাসের শিক্ষিকা ঊর্মি চৌধুরী। প্রযুক্তিগত দুর্বলতাকে দূর করতে সর্বদা সহায়তা করেছেন ঐন্দ্রিলা চক্রবর্তী। এদের সকলের কাছেই আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। বইপত্র পাঠ ও সংগ্রহে আমি সাহায্য পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) ও বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে। নানাবিধ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সন্ধান পেয়েছি জনাই সাধারণ পাঠাগারে (হুগলি)। ডানকুনি পাঠভবন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার (হুগলি) ও কলকাতা পাঠভবন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার (কলকাতা) থেকে বর্তমানে কম জনপ্রিয়, শিশু-কিশোর পাঠ্য নানা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সন্ধান পেয়েছি। এছাড়াও স্থানাভাবে যাদের নাম নেওয়া সম্ভব হলো না, অথচ যাদের পরামর্শ ও সাহায্য ছাড়া এ গবেষণা সম্ভব হতো না, তাদের সকলের কাছেই আমি ঋণী।

মুদ্রণের কাজে অসীম সহযোগিতা করে মুদ্রণ কার্যের ভার লাঘব করেছেন শুভেন্দু তরফদার ও শ্রীতমা সাউ। তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। গভীর মনোনিবেশের পরেও যদি কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে যায় তার দায়িত্ব আমারই। সে কারণে দুঃখিত।

সূচি

ভূমিকা ... ... ১ - ১৭

পরিভাষা ও শব্দ সংক্ষেপ ১৮

প্রথম অধ্যায় –

অভিযান সাহিত্য: বাংলা সাহিত্যের নতুন বর্গ ... ... ১৯ – ৬৫

দ্বিতীয় অধ্যায় –

উপনিবেশের অভিজ্ঞতা, দুই বিশ্বযুদ্ধ ও অভিযান উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ৬৬ – ১১৪

তৃতীয় অধ্যায় —

পথিকৃৎ হেমেন্দ্রকুমার রায় ও ঔপনিবেশিক গ্রস্ততা ... ... ১১৫ – ১৮৮

চতুর্থ অধ্যায় —

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: ঔপনিবেশিক বোধের বৈচিত্র্য ... ১৮৯– ২৫৫

পঞ্চম অধ্যায় —

প্রেমেন্দ্র মিত্র: বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নৈতিকতা ও অভিযানের ভিন্ন বয়ান ... ২৫৬ – ৩২৩

উপসংহার ... ... ৩২৪ – ৩৩০

গ্রন্থতালিকা, পত্রপত্রিকা ও অন্তর্জাল ... ... ৩৩১ – ৩৩৭

ভূমিকা

প্রতিটি সময়ের আছে আলাদা আলাদা কিছু চাহিদা, আর চেয়েও না পাওয়া কিছু আক্ষেপ। আকাঙ্ক্ষা আর অতৃপ্তির এই টানাপোড়েন ছাপ রেখে যায় সাহিত্যের দেহ কাঠামোয়। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৮–২০২০) শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত কমিক সিরিজগুলির রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন, "প্রত্যেক যুগেরই হা-হুতাশ নিতান্তই তাহার নিজস্ব, একান্ত নিজস্ব, প্রত্যেক যুগেরই আছে নিজস্ব অলীক কল্পনা, এবং কল্পনার জীবনমানবক বা অন্য প্রাণী।" যুগের হা-হুতাশের এই নিজস্ব ধরনটি তৈরি হয় সেই যুগের আর্থ-রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, সামাজিক চলনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অস্থির ভাঙচুর আর ব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তনশীলতা থেকে উৎসারিত পুরানো-নতুনের দ্বন্দ্বের কারণে। এই হা-হুতাশ তথাকথিত বড়োদের সাহিত্যের গণ্ডিতেই আটকে থাকে না কেবল। ছড়িয়ে পড়ে শিশু সাহিত্যের মধ্যেও। কারণ, আমরা সবাই জানি, শিশুসাহিত্য মানে শিশুদের দ্বারা রচিত সাহিত্য নয়। শিশুদের জন্য, বড়োরা রচনা করেন সেই সাহিত্য। রচনাকালে রচয়িতা সেই সাহিত্যকে শিশুদের জন্য উপাদেয় ও মনোরম করে তোলার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু তার বড়ো হয়ে যাওয়া মনের বিচারবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি আর শিশুর বড়ো হয়ে ওঠা সম্পর্কে তার আকাঙ্ক্ষাকে দূরে সরিয়ে ফেলে তিনি সাহিত্য রচনা করবেন, এ আশা করা বাতুলতা। আজকের বড়ো যিনি, তার চিন্তার গড়ন দিয়ে তিনি নির্মাণ করতে চান আজকের শিশু তথা আগামীর বড়োকে। শিশু সাহিত্যে তাই কখনো জেনেশুনে, অনেক সময় অজান্তেই ঢুকে পড়ে রচয়িতার নৈতিক অবস্থান। সমাজ, পরিস্থিতি, পরিবেশ সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্লীন থেকে যায় শিশু সাহিত্যে। যুগের হা-হুতাশ শিশু সাহিত্যের সঙ্গ ছাড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) *জীবনস্মৃতি* (১৯১২) গ্রন্থে বলেছিলেন,

> আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম; যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।[২]

শিশু সাহিত্যে শিশুদের বোধগম্য, আনন্দ ও শিক্ষাদানকারী উপাদানগুলির সঙ্গে সঙ্গে থেকে যায়, দেশ ও কাল নির্ভর যে পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে লেখক রচনা করছেন শিশুসাহিত্য সেই সময়ের যুগযন্ত্রণা থেকে উঠে আসা চাহিদা। রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির দাগদোগ ভরা পটে দাঁড়িয়ে, সময়ের চাহিদাকে ধারণ করেই বড়োরা গড়ে তুলতে চায় শিশুদের। তাই শিশু ও শিশু সাহিত্য উভয়েরই থাকে একটি কালগত মাত্রা। নির্দিষ্ট কালপর্বে দাঁড়িয়ে শিশুর জন্য যে সাহিত্য রচিত হয়, আনন্দ ও জ্ঞানলাভের হাতছানিতে শিশু সেই সাহিত্যের কাছে যাওয়ার মাধ্যমে সেই কালগত মাত্রাটিতেও আরও বেশি করে সম্পৃক্ত হতে থাকে। শিশু সাহিত্যের হাত ধরে কালগত নৈতিক অবস্থানগুলি এত সূক্ষভাবে গেঁথে যেতে থাকে শিশুর চৈতন্যে যে তা সুদূর ভবিষ্যতেও শিশুকে চালনা করতে থাকে। যা তারা উপলব্ধি করে ও যা তাদের উপলব্ধিতে না পৌঁছালেও অন্তর্লীন থাকে তাদের পঠিত সাহিত্যে, দুইই তার ভেতরে পাকাপোক্ত করে তুলতে থাকে নৈতিক কতকগুলি অবস্থান, যে অবস্থানগুলি আসলে সাহিত্যের বয়ানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন লেখক, যে অবস্থানগুলি নির্মিত হয়েছে সময়ের অনিবার্য শর্ত মেনে। বিশ শতকের শিশু-কিশোর সাহিত্যে সময়ের অপ্রতিরোধ্য চাহিদা থেকেই উঠে এসেছিল

অভিযানের প্রবণতা। আমাদের বর্তমান গবেষণায় বিশ শতকের সেই অভিযান প্রবণতাই আলোচ্য বিষয়।

বাংলা শিশু সাহিত্য নিয়ে চর্চার দীর্ঘ পথে ইতিপূর্বে অভিযান তথা অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্য নিয়ে আলাদা করে চর্চা না হলেও শিশু-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৯৬–১৯৭৮)। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তার *শতাব্দীর শিশু সাহিত্য* (১৮১৮-১৯৬০) গ্রন্থটি বাংলা শিশু সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক রূপরেখা। বহু লেখক, বিস্মৃতপ্রায় পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের তথ্য এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বাংলার প্রথম অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সূত্রপাতের প্রসঙ্গও তিনি তথ্য আকারে সেখানে পরিবেশন করেছেন। যদিও কেন ও কীভাবে তা বাংলা সাহিত্যের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি হয়ে উঠেছে, এবং কীভাবে গতি পেয়েছে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি নির্মাণের প্রবণতা, তা নিয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্র আলাদা করে আলোচনা করেননি।

বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন আশা গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২৫–১৯৮৭)। *বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ* (১৯৫৯) গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন কীভাবে বাংলা ব্রতকথার ছড়া, পঞ্চতন্ত্র ও কথাসরিতসাগর থেকে ফোর্ট উইলিয়ামের গদ্য চর্চাতেও শিশু সাহিত্যের খোঁজ পাওয়া যায়, যদিও ১৮০০ থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের শিশু সাহিত্য নিয়েই এই গ্রন্থের মূল আলোচনা। অভিযান কাহিনি নিয়ে গ্রন্থটিতে চর্চা করা হয়নি। তবে উনিশ শতকের শিশু সাহিত্যের নানা পর্যায়কে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর বিশ শতকের প্রথমার্ধের শিশু সাহিত্য ও শিশুদের জন্য প্রকাশিত পত্রপত্রিকা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন গ্রন্থের নবম

অধ্যায়ে। পাশাপাশি ইউরোপীয় শিশু সাহিত্যের ইতিহাস ও বাংলা শিশু সাহিত্যে তার প্রভাবের প্রসঙ্গও ছুঁয়ে গেছেন।

বাণী বসু তার *বাংলা শিশু সাহিত্য: গ্রন্থপঞ্জী* (১৯৬২) গ্রন্থটির ভূমিকায় ১৮১৮ থেকে ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দেড়শো বছরের বাংলা শিশুসাহিত্যকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। সেখানে আলাদা করে অভিযান নিয়ে আলোচনা না থাকলেও, গ্রন্থপরিচয় দানকালে অজস্র জনপ্রিয় অভিযান কাহিনির পাশাপাশি বর্তমানে প্রায় হারিয়ে যেতে বসা অভিযান কাহিনির উল্লেখ করেছেন।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার *রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য* (১৯৭০) গ্রন্থে অভিযান বিষয়ে আলোচনা না করলেও শিশুসাহিত্যের স্বরূপ, শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিশুদের কল্পনায় চেনা চৌহদ্দি ভাঙতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত রেখেছেন। এছাড়া বিচ্ছিন্ন কিছু প্রবন্ধে তিনি শিশু সাহিত্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত জ্ঞাপন করেছেন। ‘টারজান থেকে টিনটিন অথবা নব্যনিরক্ষরদের পাঠাভ্যাস’ প্রবন্ধে তিনি বিশ্বরাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো কীভাবে শিশু সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কীভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে শিশুর চৈতন্যে শাসকের রাজনীতি তা আলোচনা করেছেন। ‘বাংলা শিশু সাহিত্যের অদৃশ্য মানুষ’ প্রবন্ধে বাংলা শিশু সাহিত্যে মেয়েদের কীভাবে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে, তা আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি বাংলা অভিযান সাহিত্যগুলি কীভাবে পুরুষ-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে তাও উল্লেখ করেছেন, বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করলেও। ‘লাল খাতা, বহুরূপী কালি, ডেঁয়ো পিঁপড়ে এবং ইত্যাদি’ প্রবন্ধে তিনি সত্যজিৎ রায় রচিত চরিত্র প্রফেসর শঙ্কুর অভিযান নিয়ে আলোচনা করেছেন।শঙ্কুর অভিযানের মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রভাব কীভাবে কাজ করেছে আর কীভাবে তা অতিক্রান্ত হয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস* (১৯৯১) গ্রন্থে বাংলা শিশুসাহিত্যকে উপনিবেশবাদ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আশৈশব শেখা মানেই সে শেখা প্রশ্নহীন নয়। আশৈশব প্রিয় মানেই নয় তা তর্কাতীত। দুই শতাব্দীর শিশুসাহিত্যের লিখন আর ভাবনার প্রবাহে অন্তর্লীন হয়ে থেকেছে যে ঔপনিবেশিক গ্রস্ততা, কীভাবে কতটা প্রভাবিত করে তা আমাদের, কীভাবে তার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকে নানান দার্শনিক চাপান-উতোর, তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তিনি। গোপাল সুবোধ আর রাখাল অবাধ্য। গোপালের মতো হওয়া উচিত সবার, আর রাখাল হলেই সমস্যা। গোপাল আর রাখালের এই আদল গড়ে উঠল কেন, কার স্বার্থে, নৈতিকতার ইতিহাসে কোন পথ অতিক্রম করল তারা, বাংলা শিশু সাহিত্যে কেন গোপালত্ব ছেড়ে রাখাল হতে গিয়েও শেষ অবধি একার্থে গোপালই হয়ে রইল প্রধান সব চরিত্ররা তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থটির 'শাদা মানুষের দায় ও কালো মানুষের দায়িত্ব' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলা অ্যাডভেঞ্চার তথা অভিযান সাহিত্য কীভাবে উপনিবেশবাদ দ্বারা গ্রস্ত হয়ে থেকেছে বিশ শতকের প্রথমার্ধে, তা উল্লেখ করেছেন তিনি। যদিও এই গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু উপনিবেশবাদ ও শিশু সাহিত্য, প্রসঙ্গত সেখানে এসেছে অ্যাডভেঞ্চার। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির গড়ে ওঠা ও বাঁকবদলের ওতপ্রোত সম্পর্ক নিয়ে গ্রন্থটি আলোচনা করে না। অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির কাঠামো ও বিশেষত্ব নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কোনো আলোচনা হয়নি, গ্রন্থটির উপজীব্যও নয় তা। উনিশ শতক থেকে উপনিবেশবাদের প্রভাব বাংলার শিক্ষা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করলেও কেন বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল বাংলা অভিযান সাহিত্যকে তা এই গ্রন্থে আলোচিত হয়নি। অভিযান সাহিত্য ও বিশ্বযুদ্ধ সংলগ্ন ইতিহাসের প্রেক্ষাপট গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু নয় বলেই হয়তো।

বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন নবেন্দু সেন, তার *বাংলা শিশু সাহিত্য তথ্য, তত্ত্ব, রূপ ও বিশ্লেষণ* (১৯৯২) গ্রন্থে। বাংলা শিশুসাহিত্যে পত্রপত্রিকাগুলির গুরুত্ব আলোচনার পাশাপাশি, বিশ শতকের সাহিত্যিকদের শিশু সাহিত্য পর্যালোচনা করেছেন তিনি। ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির অনুবাদ বাংলায় কীভাবে সংঘটিত হতে থেকেছে, কীভাবে বাংলা কিছু কিছু অভিযান কাহিনি, ইউরোপীয় গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনেই রচিত হয়েছে, তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন লেখক। বিশ শতকের সমাজ পরিবেশ কীভাবে পত্র পত্রিকাগুলি মেলে ধরেছে শিশু-কিশোর পাঠকদের সামনে তাও আলোচনা করেছেন লেখক।

তিস্তা দত্ত রায় *বাংলা শিশুসাহিত্য রায়বাড়ি ও পরম্পরা* (২০১৪) গ্রন্থে শিশু ও তার মনোজগৎ সম্পর্কে আলোচনা এবং শিশু সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। শিশুসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় ও সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্য নিয়ে গ্রন্থটিতে আলোচনা করা হলেও অভিযান নিয়ে আলোচনা গ্রন্থটিতে আলাদা করে স্থান পায়নি। সত্যজিৎ রায়ের শিশু সাহিত্যের মধ্যে গোয়েন্দা কাহিনি ও কল্পবিজ্ঞানের উপাদানগুলি এখানে আলোচিত হলেও, অভিযানের উপাদান সেখানে কীভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে তা অনুল্লিখিত থেকে গিয়েছে এই গ্রন্থে।

নির্মাল্য কুমার ঘোষের *বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য পাঠের ভূমিকা* (২০২০) গ্রন্থে বাংলা শিশু সাহিত্যের হাল হকিকত নিয়ে নানা আলোচনার প্রসঙ্গে লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। আলোচনায় এসেছে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গও। ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের লেখক ড্যানিয়াল ডিফো সম্পর্কিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। তবে অভিযান কাহিনিকে আলাদা বর্গ হিসাবে সেখানে দেখা হয়নি। বাংলা

শিশু সাহিত্যে অভিযান প্রবণতা, অভিযান কাহিনির উন্মেষ, তার গতি ও বাঁকবদল, বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব অনালোচিত থেকে গিয়েছে।

বাংলা শিশু সাহিত্যের এই অনালোচিত অভিযান প্রবণতা, অভিযান কাহিনির স্বাতন্ত্র্য, তার গতিপ্রকৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক আমাদের বর্তমান গবেষণার বিষয়। কীভাবে উপনিবেশ ও দুই বিশ্বযুদ্ধের চৈতন্য প্রভাবিত করেছে বাংলা অভিযান সাহিত্যের প্রকল্পকে, তা আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে নতুন বর্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করে অভিযান-সাহিত্য। স্থানিক সরণ ও প্রতিবন্ধকতা জয় করতে করতে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ— এক বিশেষ পুনরাবৃত্তিমূলক প্রবণতার মতো ফিরে ফিরে আসতে দেখা যায় শিশু-কিশোর সাহিত্যে। নায়কের ভ্রমণের দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যের ধারায় নানা সময়ে উপস্থিত থাকলেও অভিযান এক স্বতন্ত্র বর্গ হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে ১৯২৪ সালে *মৌচাক* পত্রিকায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৮৮–১৯৬৩) 'যকের ধন' উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনকাল ও ঔপনিবেশিক শিক্ষার পরিমণ্ডলে গড়ে উঠতে থাকা অভিযান উপন্যাসগুলি ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সহায়ক অভিযান-উপন্যাসগুলির ধাঁচেই আদল পেতে থাকে ক্রমাগত। বিশ শতকের এই অভিযান-উপন্যাসের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কেবল ঔপনিবেশিক শিক্ষাই নয়, চিহ্নিত করতে পারা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রবল ধাক্কাকেও। বিশ্বযুদ্ধে অপ্রস্তুতভাবে জড়িয়ে পড়া বাঙালি নিজেকে আবিষ্কার করে বৃহত্তর পৃথিবীর মাঝখানে। অজস্র জনজাতি, ভিন্নতর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশ শতকের বাঙালি আবিষ্কার করে— পৃথিবীর মানচিত্রের মতোই তত্ত্ব-ধারণা-জ্ঞানের ক্ষেত্রেও দুনিয়া জুড়ে চলছে ভাঙাগড়া। শুরু হয়েছে প্রযুক্তির দাপট। অনড় অবস্থানে আর চলতা

বিহীন থাকা সম্ভব হয় না বাঙালির। নতুন দুনিয়ার প্রতি তার তৈরি হয়েছে নতুন আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা। অথচ উপনিবেশের শিক্ষা ও দর্শন, ধর্মজাত স্থাণুত্ব ও সামাজিক বিধিনিষেধ তার বিশ্ব-জানার পথে হয়ে উঠেছে প্রধান বাধা। একদিকে নতুন পৃথিবীকে জেনে নিতে অভিযানের আকাঙ্ক্ষা ও অন্যদিকে তার সাধ্যহীনতার উপলব্ধির দ্বন্দ্ব থেকেই সৃষ্টি হতে থাকে অভিযান সাহিত্য।

উপনিবেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি, ঔপনিবেশিক গ্রস্ততা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রেক্ষাপট হিসেবে থেকে গেছে বাংলা অভিযান-উপন্যাসের, তেমনই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে তথা বিশ্বরাজনীতির চালচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে ক্রমপরিবর্তনশীল বাঙালির নৈতিকতাও নিয়ন্ত্রণ করেছে বাংলা অভিযান-উপন্যাসগুলিকে। উপন্যাসগুলির প্লট ও চরিত্রে, বয়ান-কৌশলে, নায়কের নৈতিকতা ও দর্শনে, রাষ্ট্র ও নায়কের সম্পর্কে এসে লেগেছে নানামাত্রিক অভিঘাত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা, উপনিবেশ হিসেবে ভারতবাসীর তথা বাঙালির দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, বিশ্বযুদ্ধজাত দুর্ভিক্ষে পীড়িত হওয়া, আগতপ্রায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল বাঙালির অস্থিরতা, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধাচারণের তীব্র ঢেউ ও সাম্রাজ্যবাদী ধারণার বিরুদ্ধতা বাংলা অভিযান সাহিত্যে এনেছিল গুরুত্বপূর্ণ বাঁক বদল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রকল্পিত হওয়া অভিযান ভাবনা প্রথম মূর্ত রূপ নিয়েছে হেমেন্দ্রকুমারের অভিযান সাহিত্যে। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়েও রচিত হতে থেকেছে তার অভিযান কাহিনি। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাই এ গবেষণার অনিবার্য নির্বাচন। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪–১৯৫০) উৎকৃষ্টতম অভিযান কাহিনিগুলি রচনা করেছেন। সংখ্যায় নয়, গভীরতায় তিনি ধারণ করে রেখেছেন মত ও পথের দ্বন্দ্ব জর্জর সেই কালপর্ব। বিভূতিভূষণ তাই এই গবেষণার অন্যতম নির্বাচন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিকাল ও বিশ্বযুদ্ধের সময় ও বিশ্বযুদ্ধ

প্রভাবিত পরবর্তীকাল জুড়ে অভিযান কাহিনি রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও অর্থনৈতিক প্রভাব কীভাবে অভিযান কাহিনিকে প্রভাবিত করেছিল, তা বুঝতে হলে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। এই তিন লেখকের উপন্যাসকে কেন্দ্র করে আমরা বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে অভিযান উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি বুঝতে সচেষ্ট হয়েছি।

গবেষণাপত্রের **প্রথম অধ্যায়ে** আমরা দেখার চেষ্টা করেছি অ্যাডভেঞ্চার শব্দটি কীভাবে বিবর্তিত হতে থেকেছে। অনিশ্চয়তা, অজানাকে জানা, বিপদের ঝুঁকি এবং স্থানিক সরণ ছাড়া অভিযান সম্ভব নয়। এই অনিশ্চয়তা এবং স্থানিক সরণই অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের প্রাকশর্ত। অ্যাডভেঞ্চার (adventure) শব্দটি একাদশ শতাব্দীতে লাতিন উৎপত্তিগত অর্থে ব্যক্তির ওপর আরোপিত ভাগ্য বা দৈবকে নির্দেশ করত, ফরাসি 'অ্যাডভেনির' (advenir) শব্দে যে অর্থ এখনো লেগে রয়েছে। অর্থান্তরিত হতে হতে 'অ্যাডভেঞ্চার' শব্দটি কীভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে এসে, যখন সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও বাণিজ্যযাত্রার প্রবণতা বেড়েছে সেই সময় কোনো অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তির সাহসিকতায় পূর্ণ উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তায় ভরা ঘটনা পরম্পরাকে ইঙ্গিত করতে থাকে তা আমরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে সেই 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর সঙ্গে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে জড়িয়ে পড়ল তাও এই গবেষণায় অনুসন্ধানের বিষয় হয়েছে। উনিশ শতকের ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্য কীভাবে সেই নতুন দেশকে জানতে ও উপনিবেশ স্থাপন করতে ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে পড়ারই জয়গান হয়ে উঠল, কীভাবে অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে মিশে গেল উপনিবেশের ধারণা, তা খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কী কী তা এই অধ্যায়ে যেমন খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে, তেমনই কোন কোন সামান্য উপাদানগুলি অভিযানের ক্ষেত্রে আবশ্যক হয়ে উঠে তাকে একটি বিশেষ সাহিত্যবর্গে পরিণত করে তাও নির্ণয় করা হয়েছে। অভিযান সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্যবর্গগুলি, যেমন গোয়েন্দা কাহিনি, ভ্রমণ সাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পার্থক্য কোথায়, কীভাবে অভিযান সাহিত্য এগুলির তুলনায় স্বতন্ত্র একটি সাহিত্যবর্গ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তা খতিয়ে দেখা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

অভিযানের প্রবণতা বাংলায় অভিযান সাহিত্য রচিত হওয়ার পূর্বে কীভাবে রূপকথা, গীতিকা, মঙ্গলকাব্য, ভ্রমণ সাহিত্য এবং উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম দিকের কিছু উপন্যাসে ফুটে উঠেছে, হয়ে উঠেছে বাংলা অভিযান সাহিত্যের পূর্ব সূত্র, তা বিচার করে দেখা হয়েছে। কীভাবে সেই দীর্ঘপথ পেরিয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে অভিযান কাহিনি একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য বর্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোন পটভূমিতে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে অভিযান কাহিনি নির্মিত হতে শুরু করল সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সময়ে দুনিয়া জুড়ে ব্রিটেন তথা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের রথ ছুটেছিল উপনিবেশ দখল করতে। কাঁচামাল ও সস্তা শ্রম জোটাতে চলেছিল সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি ও অত্যাচার। সেই দখলদারির সঙ্গে ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ধারণ করে, কীভাবে তা উপনিবেশ-ভারতবর্ষের বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করল তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। ভারতবর্ষে প্রাচ্যবাদীদের শিক্ষানীতি পিছু হঠতে বাধ্য হলে ও পাশ্চাত্যবাদী শিক্ষানীতি কার্যকর হলে ইংরাজি শিক্ষা তথা ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার ধাঁচায় বাঙালিকে কীভাবে কেরানি তৈরির উপযুক্ত করে গড়ে তোলা শুরু হল, এবং বাঙালির চৈতন্যে সেই ইউরোপীয় শিক্ষা ও দর্শন কোন সময় থেকে কীভাবে

শিকল পরাতে শুরু করল তা আমরা খুঁজে দেখতে চেয়েছি এই অধ্যায়ে। উনিশ শতক থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি কার্যকর হলেও, কেন বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে অভিযানের প্রকল্প গড়ে ওঠেনি, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পৌঁছে কেনই বা উন্মুক্ত হল বাঙালির অ্যাডভেঞ্চার চর্চা, তা বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ শতকে এসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা বাঙালির এতদিনের অভ্যস্ত জীবনকে ঘিরে কীভাবে প্রশ্ন তুলতে থাকে, কীভাবে বাঙালি জড়িয়ে পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, এই জড়িয়ে পড়ায় কতখানি বাঙালির সাগ্রহ অনুমোদন ছিল, আর কতটা ছিল বাধ্যতা তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি আমরা। এই যুদ্ধ কীভাবে বাঙালির সামনে খুলে দিয়েছিল অচেনা মানচিত্র আর নতুন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তা আমরা বুঝতে সচেষ্ট হয়েছি। আত্মতুষ্ট মনোজগতে আচ্ছন্ন থাকার বদলে বাইরের পৃথিবীকে ছেনে দেখার আগ্রহ কীভাবে তৈরি করে এই যুদ্ধ, কীভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় তার এই আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবন্ধকতার দ্বন্দ্ব থেকে কীভাবে সূচনা হয় অভিযান সাহিত্যের, তা আমরা খতিয়ে দেখেছি এই অধ্যায়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে কীভাবে আর্থিক সংকট তীব্রতর হয়, কৃষিভিত্তিক জীবন যন্ত্রণাদগ্ধ হতে থাকে, কৃষক থেকে শিল্প-শ্রমিক হওয়ার দিকে কেন পা বাড়াতে থাকে মানুষ, তা আমাদের খতিয়ে দেখতে হয়েছে এই অধ্যায়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে বাঙালির জাতীয়তাবাদ কেমন চেহারা নিতে শুরু করেছিল তা আমরা এই অধ্যায়ে বুঝতে চেয়েছি। রাওলাট আইনকে ঘিরে অসন্তোষ, রাওলাট সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ কীভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ার আনছিল তা আমরা বুঝতে সচেষ্ট হয়েছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বাঙালি বিপ্লবীরা কেন ও কীভাবে সামরিক উত্থানের সম্ভাবনা

দেখতে পায়, তা আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি। অভিযান সাহিত্যের সূচনা হওয়ার পটভূমি হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার অভিঘাতে রূপ পাওয়া জাতীয়তাবাদের চেহারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পার হওয়ার এক দশক পরেই ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থান হয়। উগ্র জাতিবিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদের ভয়াল রূপ প্রত্যক্ষ করে পৃথিবী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উপনিবেশ হিসেবে বাধ্যত অংশ নিতে হয় ভারতকে। ভারতীয় অর্থনীতি কীভাবে তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কীভাবে কালোবাজারি ও মজুতদারির মাধ্যমে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, বাংলার গ্রাম শহরে তার ফলে কী প্রভাব পড়ে তা আমরা দেখতে সচেষ্ট হয়েছি, অভিযান সাহিত্যের গতি ও বাঁক বদলের সঙ্গে যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে কীভাবে বাড়তে থাকে ফ্যাসিবিরোধী ভাবনা, তা আমরা দেখার চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ে। ফ্যাসিবাদ বিরোধী অবস্থান, যা কিনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অভিযান সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠবে বারবার, কীভাবে তৈরি হচ্ছিল বাংলার লেখক শিল্পীদের মধ্যে তা আমরা খুঁজে দেখতে চেয়েছি এই অধ্যায়ে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর লড়াই, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, আজাদ-হিন্দ বাহিনীর মুক্তির জন্য আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ ঔপনিবেশিক গ্রস্ততায় কীভাবে ধাক্কা দিতে থাকবে তা আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মাধ্যমে কীভাবে বাংলা অভিযান কাহিনির সূত্রপাত হল ও গতি পেতে থাকল তা আলোচনা করেছি। বিমল-কুমার সিরিজের মাধ্যমে কীভাবে হেমেন্দ্রকুমার গড়ে তুলতে থাকলেন বাংলার প্রথম অভিযান নায়ক বিমলের আদল, সেই নায়কের স্বরূপ কেমন হয়ে উঠল তা হেমেন্দ্রকুমারের উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করে বোঝার

চেষ্টা করেছি। নায়কের নৈতিক অবস্থানের সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে থাকে সমসময়ের চাহিদা, কীভাবে নায়কের অবস্থান ও পাঠকের রুচি এক অপরকে প্রভাবিত করে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালির নিজের জড়ত্বকে আবিষ্কার করা ও নিজের অবস্থানের প্রতি অসন্তোষ কীভাবে ধ্বনিত হয়েছে তা আমরা বিমল-কুমার সিরিজের উপন্যাসগুলিতে সন্ধান করেছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের কেমন চেহারা এই সিরিজে ফুটে উঠেছে, সেই জাতীয়তাবাদের পিছনে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা কীভাবে কাজ করেছে, উপন্যাসগুলিতে সেই জাতীয়তাবাদের কেমন রূপ ফুটে উঠেছে তা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি। ঔপনিবেশিক ধ্যান ধারণা, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের প্রভাব কীভাবে উপনিবেশের অভিযান সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে তা আমরা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। এই সিরিজে কীভাবে, কতখানি প্রচ্ছন্ন থেকেছে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, তা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি। অভিযান উপন্যাসের কথন কৌশল নিয়ে হেমেন্দ্র কুমার রায় কেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গিয়েছেন সমগ্র সিরিজ জুড়ে তা আমরা খতিয়ে দেখতে চেয়েছি।

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের জয়ন্ত-মানিক সিরিজ মূলত গোয়েন্দা সিরিজ হলেও কীভাবে তা অনেক ক্ষেত্রে অভিযানের সমতুল্য হয়ে উঠেছে তা আমরা এই অধ্যায়ে বোঝার চেষ্টা করেছি। কীভাবে গোয়েন্দা জয়ন্ত ও অভিযান নায়ক বিমলকে লেখক উপস্থাপন করেছেন একত্রে, কীভাবে গোয়েন্দা কাহিনির সীমা টপকে বিমলের উপস্থিতি জয়ন্ত সিরিজকে অভিযান কাহিনি রূপে প্রকটতর করেছে তা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি। জয়ন্ত চরিত্রটির নির্মাণে কীভাবে কাজ করেছে সমসময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তা আমরা দেখতে চেয়েছি উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে। পুলিশি ব্যবস্থাকে কেন ও কীভাবে বিদ্রূপ করেছেন লেখক এই সিরিজে তাও আমরা

খতিয়ে দেখতে চেয়েছি। পুঁজিবাদী কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গোয়েন্দা জয়ন্তের পরিকল্পনা কীভাবে নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়েছে তাও আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব হেমেন্দ্রকুমারের কিছু কিছু উপন্যাসে কীভবে দেখা গিয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। পাশাপাশি মহানগরী কলকাতা কীভাবে হয়ে উঠেছে অভিযানের পটভূমি তাও উপন্যাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজে দেখা গিয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে তাঁর স্বল্প সংখ্যক অভিযান উপন্যাসেও ফুটিয়ে তুলেছেন নানামাত্রিক বৈচিত্র্য তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। 'চাঁদের পাহাড়' (১৯৩৬) উপন্যাসে কীভাবে ঔপনিবেশিক অভিযান কাহিনির মতাদর্শের অনুবর্তন ঘটেছে তা আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি। শঙ্কর চরিত্রটিকে কীভাবে আদল দিতে চেয়েছেন লেখক, কীভাবে শঙ্কর হয়ে ওঠে ইউরোপীয় অভিযান ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত, তা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি। বাঙালিয়ানার প্রতি শঙ্করের পিছুটান ও অপর সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপটিও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। আবিষ্কার ও মালিকানার সম্পর্কের মধ্যে কীভাবে মিশে আছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ধরন, তা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি উপন্যাসটির আলোচনায়।

বিভূতিভূষণের 'হীরামানিক জ্বলে' উপন্যাসে সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব কীভাবে কাজ করেছে তা আমরা বুঝতে চেয়েছি এই অধ্যায়ে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভাবধারা কীভাবে এই উপন্যাসে অভিযানের প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে, কীভাবে শিক্ষা, শ্রেণি ও ধর্মের মাত্রাগুলি উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি। পুরুষত্ব সম্পর্কে বিভূতিভূষণ কীভাবে প্রশ্ন তুলতে চেয়েছেন তাও আমরা উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেয়েছি।

‘মরণের ডঙ্কা বাজে’ (১৩৪৪-৪৬ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে চীন জাপান যুদ্ধে পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে ডাক্তারি সাহায্য প্রেরণের ঐতিহাসিকতা কীভাবে অভিযান কাহিনির ভিত্তি প্রস্তুত করেছে তা আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি। বিভূতিভূষণের আন্তর্জাতিকতা বোধের ধরনটি এই উপন্যাস বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক যুদ্ধ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গিকে খতিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে, পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বিভূতিভূষণের অবস্থান কীভাবে নতুন ও পুরাতনের সংঘাত ঘটিয়েছে তা আমরা বুঝতে সচেষ্ট হয়েছি উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করে।

‘মিসমিদের কবচ’ (১৯৪২) উপন্যাসে কীভাবে বিভূতিভূষণ সভ্যের লালসার বিরুদ্ধে নিজের মতামত জ্ঞাপন করেছেন, অন্যান্য অভিযান কাহিনির আদর্শ থেকে সরে এসেছেন কতটা তা আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিযান উপন্যাস কীভাবে অভিযান কাহিনির নৈতিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছে, প্রস্তুত করেছে অভিযানের ভিন্ন বয়ান তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাকলগ্ন থেকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তোলপাড় স্বাধীনতার স্পৃহা, ঘটনাবহুল গণ আন্দোলন, উপনিবেশ বিরোধিতা, কীভবে নায়কের আদল তথা নায়কের নৈতিকতায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে তা আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মামাবাবু সিরিজ পর্যালোচনা করে বোঝার চেষ্টা করেছি। ফ্যাসিবাদ বিরোধী অবস্থান অভিযান উপন্যাসে নতুন বাঁক এনেছে কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি আমরা। শাসিত ও ভূমিজ মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে, অভিযানের উদ্দেশ্য ও ধরনের

মধ্যে অভিনবত্ব সঞ্চার হয়েছে কতটা ও কীভাবে তা আমরা বুঝতে সচেষ্ট হয়েছি মামাবাবু সিরিজের উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে তার পরবর্তী সময় জুড়ে বিজ্ঞানের দ্রুত ও প্রবল অগ্রগতি বিজ্ঞানকে কল্পনাতীত শক্তিধর করে তুলেছে। সেই পটভূমিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র অভিযান ও কল্পবিজ্ঞানের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন কীভাব তা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্পবিজ্ঞান-কেন্দ্রিক অভিযান উপন্যাসগুলিকে আলোচনা করে। ধ্বংসপ্রবণ বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সমালোচনা, যুদ্ধ বিরোধী অবস্থান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি তার আগ্রহ কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে এই অধ্যায়ে। কল্লোল সাহিত্য আন্দোলনের বাস্তবতার ধারণা কীভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিযান কাহিনিকে বাস্তবের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রেখেছে তাও আমরা বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করেছি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা সিরিজ কীভাবে বাঙালির অভিযান প্রচেষ্টার বিদ্রূপ হিসেবে পরিকল্পিত, তা আমরা এই অধ্যায়ে বোঝার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের প্রভাব, দুর্ভিক্ষজনিত হতাশায় আক্রান্ত বাংলার পটভূমি কীভাবে অভিযান উপন্যাসের নৈতিকতায় এনেছে ভিন্নতা, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। রাষ্ট্র-অভিযাত্রী-উপনিবেশের রসায়ন আসলে কেমন, ঘনাদা সিরিজের উপন্যাসের বিশ্লেষণে সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযান উপন্যাসের বয়ান কীভাবে ঔপনিবেশিক গ্রস্ততা কাটিয়ে উঠেছে, কতটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তা বোঝার চেষ্টা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

গবেষণায় উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে চরিত্রগুলির নৈতিক অবস্থান ও অভিযানের গতিপ্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। অভিযানের উপাদানগুলি কীভাবে সেখানে কাজ করেছে তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাবলীর নিরিখে উপন্যাসের বয়ানকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ, উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে সেই তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ও সমসময়ের রাজনীতির যোগসূত্রের সন্ধান— পদ্ধতিগতভাবে এই রীতি অনুসরণ করে গবেষণাপত্রকে রূপদান করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, 'টারজান থেকে টিনটিন অথবা নব্যনিরক্ষরদের পাঠাভ্যাস', *আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য সনদ,* প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১২, পৃ-১৩৫

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* একাদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ-৩৯

পরিভাষা ও শব্দ সংক্ষেপ

পরিভাষা

Geographical Movement— স্থানিক সরণ

Colonial Hangover— ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতা

Eurocentrism— ইউরোপকেন্দ্রিকতা

শব্দ সংক্ষেপ

অনুবাদক— অনু.

সংকলক— সং.

সম্পাদক— সম্পা.

প্রাইভেট লিমিটেড— প্রা: লি:

কম্পানি— কোং

Editor— Ed.

Youth Cultural Institute — Y.C.I.

Indian National Army— I.N.A.

প্রথম অধ্যায়

অভিযান সাহিত্য : বাংলা সাহিত্যের নতুন বর্গ

অ্যাডভেঞ্চার বা অভিযান কাহিনির শরীরী কাঠামোতে যেমন, তেমনি তার পটের অসমান্তরাল কারুকাজের মধ্যেও কাজ করতে থাকে একধরনের গতিশীলতা। যাপনের একঘেয়েমির বিপরীতে যেমন কাহিনির চলন, তেমনি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির নির্মাণ প্রকল্পেও থাকে একরকম অস্থির পরিস্থিতির চালচিত্র। 'অ্যাডভেঞ্চার' আর 'অভিযান' শব্দ দুটিও কাছাকাছি চলে আসে সেই গতিময় অস্থির রেখাপথ ধরেই। অভিযান সাহিত্যের ধরনধারণ, গতিপ্রকৃতি ঠিক কেমন, কীরকম সেই অবয়ব সংস্থান যা দিয়ে নির্দিষ্ট করা যায় অভিযান কাহিনির সংরূপগত কাঠামো, অর্থগতভাবেই বা কীভাবে কাছাকাছি চলে আসে 'অভিযান ও 'অ্যাডভেঞ্চার', শুরুতে সেই আলোচনাটুকু সেরে নেওয়া যাক।

ডোনাল্ড এগুইন ডামাসা (১৯৪৬—)*এন্সাইক্লোপিডিয়া অফ অ্যাডভেঞ্চার ফিকশন* (২০০৯) গ্রন্থের সূচনায় জানাচ্ছেন, আদিম মানুষ যখন দিনের শেষে ফিরে তার সারাদিন কেমন রোমহর্ষক উত্তেজনায় কেটেছে তার গল্প শোনাত, সম্ভবত কেন সে শূন্য হাতে ফিরেছে কিংবা পর্যাপ্ত খাদ্য সে কেন আহরণ করতে পারেনি তা বোঝানোর জন্য, সেই সময় থেকেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির সূত্রপাত।[১] মানব-ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে অ্যাডভেঞ্চারের ভাবনা। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে, যখন মানুষ উৎপাদন করতে শেখেনি, শিকার ও বনজ খাদ্য আহরণই যখন ছিল মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন, সেই সময়ে গোষ্ঠীর নিরাপদ ঘেরাটোপ কিংবা গুহাচত্বর ছেড়ে বিপদসংকুল পথে তাকে বেরোতে হত বাঁচার প্রয়োজনেই। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্য লড়াইয়ের মাধ্যমে অতিক্রম করতে হত বিপদ ও বাধা। অস্বাভাবিক ও আচমকা বিপত্তি ছিল তার রোজকার সঙ্গী। শুধু তাই নয়, মানুষকে তার বাঁচার তাগিদেই স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। খাদ্যের প্রয়োজনে, টিকে থাকার প্রয়োজনে তাকে এক অঞ্চল থেকে গমন করতে

হয়েছে অন্যত্র। সেই গমনের পথ নিশ্চিন্ত-নিরাপদ ছিল না কখনোই। এই অনবরত স্থানিক সরণ তাকে যুগিয়েছে বেঁচে থাকার রসদ। আর একটু একটু করে বাড়িয়েছে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। তার সেই বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে করতে স্থানান্তরিত হতে থাকার গল্পই অ্যাডভেঞ্চার গল্পের প্রাথমিক প্রণোদনা।

'অ্যাডভেঞ্চার' (adventure) শব্দের তাৎপর্য কিন্তু বরাবর একই অর্থবহ হয়ে থাকেনি। জ্যাকস আর্নল্ড (১৯৬১—) তার 'MAN TRANCENDS MAN' (২০১৫) প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, একাদশ শতকে অ্যাডভেঞ্চার শব্দের অর্থ ছিল 'fate of individuals' বা ব্যক্তির ভাগ্য যা তার ওপর আরোপিত হয়েছে। ল্যাটিন বুৎপত্তিগত অর্থে এই মানুষের ওপর আরোপিত হওয়া ভাগ্যের তাৎপর্যই নিহিত আছে অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে, যার নির্যাস ফরাসি 'অ্যাডভেনির' (advenir) শব্দের মধ্যেও দেখা যায়, জানাচ্ছেন জ্যাকস আর্নল্ড।[২] তার মতে, একসময় যখন মানুষের ভাগ্য ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের অধীন বলেই সাব্যস্ত ছিল, বা বলা চলে ব্রহ্মাণ্ডের অমোঘ নিয়মের হাতে সে ছিল ক্রীড়নক মাত্র, তখন মানুষের বেঁচে থাকায় স্ব-অর্জিত কোনো চমক ছিল না। ছিল না স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা কোনো চ্যালেঞ্জ। কারণ মানুষ জানত সমস্তটাই বিধি দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। তখন মানুষের কাছে অ্যাডভেঞ্চার ছিল পূর্বনির্ধারিত, ভাগ্য-নির্দিষ্ট অথচ নিজের-না-জানা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষার এক পরিণাম। ডোয়েন ফার্মার তার 'The evolution of adventure in literature and life' প্রবন্ধে OED বা *Oxford English Dictionary* এর সাহায্যে দেখিয়েছেন কীভাবে অ্যাডভেঞ্চার শব্দের অর্থ বিবর্তিত হয়েছে। ডোয়েন ফার্মার দেখাচ্ছেন তেরো শতকে 'Adventure' শব্দটির অর্থ ছিল, 'That which comes to us, or happens without design'.[৩] অর্থাৎ তেরো শতকেও মানুষের ইচ্ছাধীন পরিকল্পনার বাইরে

ভাগ্য দ্বারা নির্ধারিত যা কিছু আচম্বিতে ঘটে, তাই ছিল অ্যাডভেঞ্চার। পনেরো শতকে এসে এই অপরিকল্পিত আকস্মিকতার সঙ্গে যুক্ত হয় ঝুঁকি, বিপদ ও পরোয়াহীন মনোভাব ('risk taking, danger, recklessnes'[৪])। অর্থাৎ ইচ্ছানিরপেক্ষ ঘটনা থেকে ইচ্ছাকৃত কর্মের দিকে যাত্রা করে অ্যাডভেঞ্চারের অর্থ। ষোলো শতকে অ্যাডভেঞ্চারের অর্থের সঙ্গে যুক্ত হয় অভিজ্ঞতা অর্জনের দাবি। ষোলো শতকে অ্যাডভেঞ্চার অর্থে বোঝানো হতো 'An unusual experience or course of events marked by excitement and suspense, a daring feat, a prodigy or marvel'.[৫] অর্থাৎ, কোন অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা, উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তায় ভরা ঘটনা পরম্পরা, যাতে থাকবে সাহসে ভরপুর কাজকর্ম এবং পরম বিস্ময় কিংবা অসামান্যতা। ষোলো শতকে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে ক্রমশ অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হতে থাকে। তা পরিণত হয় বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক অ্যাডভেঞ্চারে।

জ্যাকস আর্নল্ড জানাচ্ছেন, ষোলো শতক কেবল সমুদ্রপথে পৃথিবীর নানা প্রান্তকে আবিষ্কারের সময়কালই নয়। এই সময় ব্যবসায়ীরা সাহসী অর্থনৈতিক অভিযানে উদ্যোগী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল অজানার উদ্দেশ্যে। তারা সম্ভাবনা ও বিপদ দুই নিয়েই ছিল সতর্ক। ফলে তাদের কাছে অভিযান নিছক খেয়াল খুশির বিষয় কিংবা ভাগ্য নির্ধারিত আকস্মিক বিস্ময় ছিল না। তারা পৃথিবীকে ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন ঘটনাপ্রবাহের হাতে ছেড়ে দিতে ছিল নারাজ। তারা বুঝেছিল পৃথিবী মানুষের করায়ত্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষারত, সেই সব মানুষের যারা মেধাবী ও সাহসী কর্মের মধ্য দিয়ে প্রভু ও মালিক হওয়ার ক্ষমতা রাখে।[৬] তারা বিপদকে পরিমাপ করেছিল, এবং শিখেছিল কীভাবে বিপদকে অতিক্রম করা যায় বা বিপদের সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নক্ষত্র নিয়ন্ত্রিত নিয়তিকে মেনে নেওয়ার বদলে তারা ভাগ্য নিজেদের হাতে গড়তে চেয়েছিল। ফলে তাদের অ্যাডভেঞ্চার ভাগ্যের বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল।

সেলভিয়ান ভেনিয়ের (১৯৭০—) তার 'THE FASCINATION WITH THE IMPOSSIBLE' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, "If we limit ourselves to Europe, the expression of the thirst for adventure has obviously changed over the course of the last two centuries."[৭] কী সেই পরিবর্তন যার মাধ্যমে গত দুই শতাব্দীতে ইউরোপের অ্যাডভেঞ্চার আলাদা হয়েছে আগের অ্যাডভেঞ্চারের ধরনের থেকে? সেলভিয়ান ভেনিয়ের বলবেন,

> For a long time, the adventure story was codified as an anecdote, an opportunity for travelers to reveal the truth about the regions they visited, the peoples they met, the things they saw.[৮]

তখন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে ভ্রমণকারীরা তাদের নিজেদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলত না, যদিও বা বলত তাহলে তা ঘটনাচক্রে উল্লেখের প্রয়োজন হলে তবেই, জানাচ্ছেন সেলভিয়ান ভেনিয়ের। ভ্রমণকারীর চরিত্র সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে এই ধরনটির পরিবর্তন ঘটে। সেলভিয়ান ভেনিয়েরের মতে,

> This changed with the aesthetic revolution of Romanticism. Its direct consequence was the modern adventure novel, which started to develop around the mid-19th century.[৯]

রোমান্টিকতার মাধ্যমেই, পুরাতন ঐতিহ্য যেমন মহাকাব্য কিংবা বীরত্বব্যঞ্জক রোমান্সের উপাদানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই অ্যাডভেঞ্চার শিশুদের জন্য সৃষ্ট কাহিনিতে উঠে এসেছে।

সেলভিয়েন ভেনিয়েরের মতে, উনিশ শতকের বিশেষত্ব হল এই ধরনের কাহিনিকে পার্থিব বাস্তবতার মধ্যে নিয়ে আসা।[১০] তার মতে, পৃথিবী সম্পর্কে নতুন লাভ করা ভৌগোলিক জ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। শিক্ষণীয় ভৌগোলিক

তথ্যকে সরস অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির মাধ্যমে প্রদান করায় তা সহজলভ্য হয়েছিল ইউরোপীয় শিশুদের কাছে। সেলভিয়েন ভেনিয়ের বলছেন, "Pedagogues claimed that young boys dreamed of travels and adventures, and thus had to be drawn to knowledge through what they liked."[১১] শুধু ভৌগোলিক জ্ঞান বিতরণই কিন্তু একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকেনি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৈতিক শিক্ষাদানের চেষ্টাও। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে শেখা, বিপদে দৃঢ় থাকার মানসিকতা, সাহস—এমন কিছু চারিত্রিক গুণাবলী তৈরি করার চেষ্টাও করতে থেকেছে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। তবে এমন কতকগুলি সময় নিরপেক্ষ, সাধারণ নৈতিকতাই শুধু শেখাতে চায়নি উনিশ শতকের ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চার। সেলভিয়েন ভেনিয়েরের মতে উনিশ শতকের বুর্জোয়া সমাজের নৈতিকতাকেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি পৌঁছে দিতে চাইছিল শিশু-কিশোরদের কাছে। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময় থেকে অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে ইংল্যান্ডের অবস্থা কেমন ছিল সে কথা বোঝাতে গিয়ে এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট (১৮৯০—১৯৪৪) জানিয়েছেন,

> There was a revolution in commercial enterprise, due to the great increase of available markets, and, as a result of this, an immense advance in the use of mechanical devices.[১২]

উৎপাদনশক্তি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিকে যেমন ইংল্যান্ড সমৃদ্ধ হতে থাকে অন্যদিকে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং উদ্বৃত্তের জন্য বাজারের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। আবার এই সমৃদ্ধির বিপরীতে ইংল্যান্ডের আরেক ছবিও তুলে ধরেছেন এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট,

> On the other side of this picture of commercial expansion we see the appalling social conditions of the new industrial

> cities, the squalid slums, and the exploitation of cheap labour (often of children), the painful fight by the enlightened few to introduce social legislation and the slow extension of the franchise.[১৩]

এই সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষী এমন অসংখ্য মানুষ দেখা যায়, ইংল্যান্ডের সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ব্যাকুলতায় উদগ্রীব। এই উদ্যমী, ভাগ্যান্বেষী অংশকে যদি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সুযোগ না দেওয়া যায়, তাহলে পরিসর না পাওয়া এই প্রবল উদ্দীপনা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। বিঘ্নিত হতে পারে রাষ্ট্রীয় স্থিতাবস্থা। অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলির মাধ্যমে সুদূর নতুন স্থানে নিজের ভাগ্য গড়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে তাই উৎসাহ দেওয়া হতে থাকল। সেলভিয়েন ভেনিয়ের বলবেন,

> ...the 19th century, thermodynamics offered a new metaphor for this old wisdom: neither steam nor desire could be compressed, so plans had to be made for "safty valves." In this novel formula, those "safty valves took the form of Europe's colonies abroad.[১৪]

ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের একদিকে কাঁচামাল ও বিপুল উদ্বৃত্তকে চালান করার বাজারের জন্য প্রয়োজন ছিল উপনিবেশ, অন্যদিকে উৎসাহী ভাগ্যান্বেষীদের বহির্মুখী করারও প্রয়োজন ছিল অভ্যন্তরীণ স্বার্থে। ফলে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনিগুলির পটভূমি হয়ে উঠেছিল উপনিবেশমুখী। ঔপনিবেশিকের নৈতিকতাই সেখানে হতে থেকেছিল অনুসরণীয়। ইউরোপীয় শিশু কিশোররা কেবল সেখান থেকে নব আবিষ্কৃত পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞানই অর্জন করবে না। তার সঙ্গে দীক্ষিত হবে ঔপনিবেশিক আদর্শে। আগ্রহী হবে দূর দেশে অভিযান করে সেখানে নিজ দেশের পতাকাকে উড়িয়ে দিতে। এক কথায় সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সহযোগী হবে তারা। এই মানসিকতাকে ছড়িয়ে দিতে দিতে ঔপনিবেশিক বোধ ও অ্যাডভেঞ্চারের আগ্রহ জড়িয়ে

গিয়েছিল ওতোপ্রোতোভাবে। সাহিত্যের একটি পৃথক ও নতুন বর্গ রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকালীন অ্যাডভেঞ্চার হয়ে উঠেছে উপনিবেশ চিন্তার সহায়।

ডোয়েন ফার্মার অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্যকে তিনটি আলাদা বর্গে ভাগ করার মাধ্যমে অ্যাডভেঞ্চারের তিনটি আলাদা ধরনকে চিহ্নিত করেছেন। আলাদা বর্গের তিনটি উদ্দেশ্যকে আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

এক, দুর্ঘটনা (accident): চরিত্রের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে আকস্মিক দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে অজানা পটভূমিতে পৌঁছানো ও বিপদের মুখোমুখি হয়ে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ, এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের কেন্দ্রীয় বিষয়। এই প্রকার অ্যাডভেঞ্চারকে ডোয়েন ফার্মার 'adventure in its old sense'[১৫] বলেছেন। এইরকম অ্যাডভেঞ্চার প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, ঘটনাচক্রে চরিত্ররা জড়িয়ে পড়ে অ্যাডভেঞ্চারে।

দুই, ঝুঁকির জন্য ঝুঁকি নেওয়া (risk for its own sake): বিপদের উত্তেজনাকে অনুভব করার জন্যই অ্যাডভেঞ্চারকে স্বাগত জানানো হয় এক্ষেত্রে। এখানে বিপদের মুখোমুখি হয়ে আনন্দ পাওয়া ছাড়া, বা ঝুঁকির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য অ্যাডভেঞ্চারারের (adventurer) থাকে না। ঝুঁকির জন্যই ঝুঁকি নেওয়া যেমন ঝুঁকি বা বিপদের প্রতি মানুষের অন্তর্লীন আগ্রহকেও প্রকাশ করে, তেমনি তথাকথিত অকারণ ঝুঁকির প্রতি আগ্রহী করে তোলার পিছনে সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিও পরোক্ষে ক্রিয়াশীল থাকে অনেক ক্ষেত্রেই।

তিন, বিনিময় প্রত্যাশী যৌক্তিক অ্যাডভেঞ্চার (return: rational adventure): এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চারে ঝুঁকি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারার সেই ঝুঁকির বদলে কিছু ফেরত প্রত্যাশা

করে, কেবল মাত্র বিপদের আনন্দেই বিপদকে বরণ করা তার উদ্দেশ্য নয়। এমন কিছু বিনিময়ে তার চাই যা এই মরণপণ বিপদের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। বিপদের বদলে কীরকম ফেরত প্রত্যাশা করে সে? ডোয়েন ফার্মার জানাচ্ছেন,

> This genre of adventure is motivated by a purpose with personal or social benefit, such as comercial enterprise, empire building, or scientific discovery.[১৬]

খেয়াল রাখা প্রয়োজন, উনিশ শতকের ব্রিটিশ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলি এই ফেরত প্রত্যাশী উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে উঠেছিল। আধুনিক অ্যাডভেঞ্চারের ধারণার সঙ্গে এই ফেরত বা 'return' এর ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে আছে।

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিকে সাহিত্যের বিশেষ একটি বর্গ রূপে চিহ্নিত করে জন. জি. কাওয়েলতি (১৯২৯—) তার *Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture* (১৯৭৬) গ্রন্থে বলবেন,

> The central fantasy of the adventure story is that of the hero— individual or group— overcoming obstacles and dangers and accomplishing some important and moral mission.[১৭]

এই অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের বাংলা আমরা করব 'অভিযান সাহিত্য'। সংসদ বাংলা অভিধান অনুসারে অভিযান শব্দটির অর্থ 'জয়, দেশ আবিষ্কার, শত্রু দমন, অজানাকে জানা, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সদলবলে যাত্রা।'[১৮] বোঝাই যাচ্ছে অনিশ্চয়তা এবং স্থানিক সরণ ছাড়া অভিযান সম্ভব নয়। 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১৯৩৭) অনুসারে, অভিযানের অর্থ— বিরুদ্ধে গমন করা।[১৯] অর্থাৎ স্থানিক সরণ ও প্রতিবন্ধকতা অভিযানের প্রাথমিক শর্ত। আবার স্থানিক সরণ ও প্রতিবন্ধকতা অ্যাডভেঞ্চারেরও কেন্দ্রীয় বিষয়। সেইদিক থেকে অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যকে

অভিযান সাহিত্য বলতে আমাদের বাধা নেই। অ্যাডভেঞ্চার তথা অভিযান সাহিত্য অন্যান্য সাহিত্যবর্গগুলির তুলনায় স্বতন্ত্র একটি বর্গ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে কীভাবে তা আমাদের বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। অ্যাডভেঞ্চার তথা অভিযান সাহিত্যের কতকগুলি বিশেষ উপাদানকে আমরা আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারি, যে উপাদানগুলির সমন্বয়ই অভিযান সাহিত্যকে সাহিত্যের একটি বিশেষ বর্গ করে তুলেছে—

স্থানিক সরণ : দৈনন্দিনের পরিচিত বিশ্ব থেকে দূরের পটভূমিতে স্থানিক সরণ ছাড়া অভিযান সম্ভব নয়। স্থানিক সরণহীন রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনি যার ফলে অভিযান হিসেবে গণ্য হতে পারে না। স্থানগত পরিবর্তনের মাধ্যমেই উন্মোচিত হতে থাকে নতুন নতুন পট। লব্ধ হয় নতুনতর অভিজ্ঞতা। এই স্থানিক সরণ কখনো আকস্মিক ঘটনার ফলে হতে পারে, কখনো বা তা যাপনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, কখনো বা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য হয়। কিন্তু প্রতিদিনের চেনা চৌহদ্দি থেকে বাইরে বেরোনো অভিযান কাহিনির আবশ্যিক শর্ত। অভিযাত্রী অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে অনভ্যাসের দিকে, সুবিধাজনক অবস্থান থেকে অ-সুবিধার দিকে পা বাড়ায় স্থানিক সরণের মাধ্যমে।

অভিজ্ঞতা অর্জন : দৈনন্দিন দুনিয়ার বাইরে অজানা পৃথিবী কিংবা তারও বাইরে কোথাও যাত্রা মানেই তো জানার গণ্ডিকে আরেকটু বাড়িয়ে নেওয়া। সেই গণ্ডির মধ্যে তখন ঢুকে পড়তে থাকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আর সেই অভিজ্ঞতানির্ভর জ্ঞান। নতুন জানা বিশ্ব তখন সরবরাহ করতে থাকে এতকাল অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকা অজানা তথ্যভাণ্ডার। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে, যেমন গুপ্তধন লাভ কিংবা নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার, চরিতার্থ করতে বেরিয়ে ভিন্নতর

পরিবেশের মধ্যে থেকে আহরিত হয় অভিজ্ঞতা। কখনো বা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাই প্রধানত ক্রিয়াশীল থাকে অভিযানের পিছনে।

প্রতিবন্ধকতা ও বিপদ : প্রতিবন্ধকতাই অভিযানের যাত্রাপথে বিপদ নির্মাণ করে। বিপদসীমা লঙ্ঘন করলে তবেই তৈরি হয় উৎকণ্ঠা। এই উৎকণ্ঠাই অভিযান কাহিনির ধারক হয়ে ওঠে ক্রমশ। ভ্রমণ কাহিনির থেকে তাকে আলাদা করে দেয়। এই প্রতিবন্ধকতা কখনো হয় প্রাকৃতিক, কখনো বা মানুষের তৈরি। অতিপ্রাকৃত কিংবা কল্পবিজ্ঞান ঘটিত প্রতিবন্ধকতাও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে। প্রতিবন্ধকতা একদিকে যেমন হয়ে ওঠে অভিযানকারীর বিরুদ্ধ শক্তি, আরেকদিকে অভিযানকারীর সামনে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার উৎসমুখ খুলে দেওয়ারও প্রধান কারিগর সে। অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে প্রতিবন্ধকতার বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে জন. জি. কাওয়েলতি বলছেন, "perhapes the basic moral fantasy implicit in this type of story is that of victory over death."[২০] মৃত্যুই সবচেয়ে বড়ো ও প্রত্যক্ষ বিপদ যা অভিযান কাহিনিতে জয় করা হয়। এছাড়াও সংস্কৃতি অনুসারে আলাদা আলাদা কিছু বিপদ তথা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার বৈচিত্র্যের কথাও বলবেন তিনি।[২১]

আবিষ্কার : স্থানিক সরণের মাধ্যমে নতুন তথ্য ও অভিজ্ঞতা লাভ যখন ঘটে, অজানা বিষয় যে মুহূর্তে চলে আসে জানার আওতায়, তখনই অভিযানকারী নতুন আবিষ্কারের মুখোমুখি হয়। এই আবিষ্কার কিন্তু গবেষণাগারে বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ঘটিত আবিষ্কার তথা 'ইনভেনশন'(invention) নয়। পূর্ব থেকেই যার অস্তিত্ব আছে, কেবল মানুষের জানার আওতার বাইরে ছিল যা, তাকে খুঁজে বার করা তথা 'ডিসকভারি' (discovery) অর্থেই এখানে 'আবিষ্কার' শব্দটি প্রযোজ্য। অভিযান সাহিত্যে এই আবিষ্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকস্মিক এবং

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই ঘটে, নয়তো উৎকণ্ঠার পরিবেশ জমে উঠতে পারে না। আবিষ্কারের আগে যা আবিষ্কৃত হবে তা রহস্যে আচ্ছাদিত হয়ে থাকবে। এই রহস্যের পর্দা সরিয়েই আবিষ্কার ঘটাবে নায়ক। খেয়াল রাখতে হবে এই আবিষ্কারের বিষয়টি অভিযান সাহিত্যে ঘটানো হয় মূলত একপাক্ষিকভাবেই। অর্থাৎ স্থানিক সরণ যার ঘটেছে, সেই অভিযানকারীই আবিষ্কারক। যদিও বা কখনো বিপরীত দিকে ঘটে যায় এই আবিষ্কার, অভিযান কাহিনিতে তার গুরুত্ব থাকে না বিশেষ। কারণ গোটা কাহিনি পরিচালিত হয় অভিযানকারীর দৃষ্টিকোণ থেকেই।

নায়ক : অভিযান কাহিনির কেন্দ্রীয় আকর্ষণই হল নায়কের চরিত্র ও যে বিপদের সঙ্গে সে লড়াই করছে, সেই প্রতিবন্ধকতার ধরনের বৈচিত্র্য। জন. জি. কাওয়েলতি মনে করেন আলাদা আলাদা সংস্কৃতির অভিযান নায়কদের (adventure hero) ধরনের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও মূলত দুটি প্রধান ভাগে অভিযান নায়কদের ভাগ করা যায়— অতিনায়ক (super hero) এবং সাধারণ নায়ক (ordinary hero)। অতিনায়কের ক্ষেত্রে তার অতিমানবীয় ও অপার্থিব ক্ষমতা তাকে সাধারণের থেকে উঁচুতে স্থাপন করে। কিন্তু সাধারণ নায়ক শুরু থেকেই সাধারণ মানুষের থেকে খুব আলাদা বলে চিহ্নিত হয় না। তার মানবীয় গুণের প্রাচুর্য— বল, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সতর্কতা, জ্ঞান ও দক্ষতাই তাকে সাধারণ মানুষ থেকে নায়ক করে তোলে। আধুনিক অভিযান কাহিনিতে এই মানবীয় সাধারণ নায়কদের অভিযানই বর্ণিত হয়েছে বেশী। তবে জন. জি. কাওয়েলতি জানাচ্ছেন সাধারণ নায়ক ও অতিনায়কত্বের গুণের সংমিশ্রণে গড়ে তোলা নায়কের উপস্থিতিও কখনো কখনো দেখা যায়।[২২] অভিযান নায়কের বিপদসংকুল পথ ও পরিবেশের মধ্যে যাত্রা এবং দুঃসাহসিক কাজকর্মের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের কাহিনিই

অভিযান কাহিনিতে বর্ণিত হয়। নায়ক তার কায়িক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক বলের দ্বারা হয়ে ওঠে অনুসরণীয়। নায়কের কর্মকাণ্ড যেমন অভিযান কাহিনির কেন্দ্রীয় বিষয়, তেমনই নায়কের নৈতিক অবস্থানই হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ কাহিনিটির নৈতিক অবস্থান।

উপরোক্ত উপাদানগুলি কোনোটি যদি কোনো কাহিনিতে উপস্থিত না থাকে তাহলে আমরা তাকে যথার্থ অ্যাডভেঞ্চার বা অভিযান কাহিনি বলতে পারব না। যদি স্থানিক সরণ ছাড়া নায়ক বিপদের সম্মুখীন হয় কিংবা বিপদ জয় করে, তাহলে তা রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনি হতে পারে, কিন্তু অভিযান কাহিনি নয়। আবার বিপদের ঝুঁকিহীন স্থানিক সরণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন যদি ঘটে তাহলে তা ভ্রমণ কাহিনি হতে পারে কিন্তু প্রতিবন্ধকতা ও বিপদ— এই উপাদানটির অনুপস্থিতির ফলে তা অভিযান কাহিনি হয়ে উঠতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হল, অনেক ভ্রমণ কাহিনির মধ্যেও কি আমরা বিপদের সম্মুখীন হওয়া প্রত্যক্ষ করি না? ভ্রমণকাহিনির মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও, সেই বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা বা বিপদ উত্তরণের ঝোঁক ভ্রমণকারীর থাকে না, বিপদকে এড়িয়ে ভ্রমণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনই তার লক্ষ্য। ফলে ভ্রমণসাহিত্যে বিপদের সঙ্গে লড়াইয়ের বর্ণনা নয়, বরং গুরুত্ব পায় পথ ও অভিজ্ঞতার বর্ণনাই। আবার অনেক সময় কল্পবিজ্ঞান কিংবা ভূতের গল্পেও অভিযানের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা থাকে। সেক্ষেত্রে দেখা প্রয়োজন অভিযানই সেখানের কেন্দ্রীয় বিষয়, নাকি ঘটনাক্রমে অভিযান প্রবণতাটির খণ্ডিত প্রয়োগ ঘটেছে কেবল। তবে কল্পবিজ্ঞান ও অভিযান, কিংবা অলৌকিকত্ব ও অভিযান যুগপৎ থাকতে পারে কোনো কোনো কাহিনিতে। সেক্ষেত্রে আমরা কল্পবিজ্ঞান কেন্দ্রিক অভিযান কাহিনি কিংবা অলৌকিক অভিযান কাহিনি হিসেবেও তাদের চিহ্নিত করতে পারি। গোয়েন্দা গল্প কিংবা রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পের ক্ষেত্রেও অভিযান প্রবণতার উপস্থিতি দেখতে পাওয়া

যায় একইভাবে। তদন্ত নির্ভর গোয়েন্দা কাহিনি যদি চেনা জায়গার ঘেরাটোপ ছেড়ে বিপদসংকুল পথে পা না বাড়ায় তাহলে তা অভিযান তথা অ্যাডভেঞ্চার হতে পারবে না। রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনিগুলির ক্ষেত্রেও স্থানিক সরণ উপাদানটির উপস্থিতি অনুযায়ী স্থির করা প্রয়োজন তা অভিযান সাহিত্যের বর্গীভূত হতে পারবে কিনা। আধুনিক সাহিত্যের বর্গগুলির এবং অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যের সংরূপগুলির মিলেমিশে যাওয়ার প্রবণতা প্রায়সই দেখতে পাওয়া যায়। তাই ডোনাল্ড এগুইন ডামাসা বলবেন,

> Modern adventure novels are frequently labeled thrillers. They do not constitute a distinct separate genre such as detective stories or romances or science fiction, but, rather intersect and overlap them all.[২৩]

তবু অভিযান কাহিনিকে আমরা তার পাঁচটি উপাদান– স্থানিক সরণ, অভিজ্ঞতা অর্জন, প্রতিবন্ধকতা ও বিপদ, আবিষ্কার ও নায়কের সার্বিক উপস্থিতির মাধ্যমে স্বতন্ত্র বর্গ হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম। অভিযান নায়কের দৈনন্দিনের যাপন ছেড়ে নতুনের উদ্দেশ্যে স্থানিক সরণ, যুগপৎ অজানাকে জানা এবং ভিন্ন, অভিনব কোন অজানাকে খোঁজার চেষ্টায় বিপদসীমা অতিক্রম করে অভিজ্ঞতার ঝুলি ভর্তি করে নেওয়া– এই বিশেষ কাঠামোটিই অভিযান কাহিনিকে সাহিত্যবর্গ রূপে সুনির্দিষ্ট করে দেয়। খেয়াল রাখা প্রয়োজন, অ্যাডভেঞ্চার বা অভিযানের পিছনে প্রত্যক্ষভাবে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কার্যকরী থাকতে পারে, কিন্তু কেবলই উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক নয় তা। অ্যাডভেঞ্চার টার্গেটমুখী ঠিকই, কিন্তু টার্গেট পূরণের থেকেও এখানে বড় হয়ে দাঁড়ায় তার প্রচেষ্টা। গন্তব্য নয়, পথই সেখানে মুখ্য। বা পথ ও পথের বিপদ নিজেই এক অন্যতম গন্তব্য।

বাংলা সাহিত্যের ধারায় অভিযান সাহিত্য একটি বিশেষ বর্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। তবে তার আগেও বাংলা সাহিত্যে অভিযানের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। অভিযান একটি উপাদান রূপে কীভাবে সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তা সত্ত্বেও কেন আমরা সেইসব সাহিত্যকে অভিযান সাহিত্যের বর্গের অন্তর্ভুক্ত করতে পারছি না, তা আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যের অভিযান প্রবণতার ইতিবৃত্ত খুঁজতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হয় মৌখিক সাহিত্যের দিকে। অনেক রূপকথার গল্পে আমরা বিপদের সঙ্গে লড়াই করে নায়কের ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে অভিযানকে শনাক্ত করতে পারি। যেমন ধরা যাক 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে। কলাবতী রাজকন্যাকে লাভ করার জন্য বুদ্ধু ভুতুম সুপুড়ি গাছের ডোঙায় চেপে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। পাতাল পুরীতে পৌঁছে বুদ্ধু কাঁথা-সেলাই-করা বুড়ির হাজার সেপাইয়ের হাতে বন্দী হয়। বুদ্ধিবলে সেখান থেকে উদ্ধার হয়ে বুদ্ধু কলাবতী রাজকন্যাকে খুঁজে বার করে। তাকে কৌটোয় করে নিয়ে আসার সময় শুকপাখী ঢোল ডগরে ঘা দিলে দোকানীদের কৌটোর সঙ্গে কলাবতীর কৌটো মিশে যায়। বারবার ঢোল ডগরে ঘা মারার মাধ্যমে, বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধু কলাবতীর কৌটো উদ্ধার করে। রাজকন্যার জন্য খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে বুদ্ধু অজগরের আক্রমণের সম্মুখীন হয় ও অজগরকে বধ করে। তারপর কলাবতী রাজকন্যা ও রাজপুত্র দাদাদের নিয়ে নৌকায় উঠলে, রাজপুত্রদের ষড়যন্ত্রে বুদ্ধু ও ভুতুমকে আহত হয়ে জলে তলিয়ে যেতে হয়। কিন্তু অবশেষে রক্ষা পেয়ে তারা ফিরে আসে ও রাজকন্যা, রাজত্ব, সুখ, শান্তি, রূপের গৌরব সবই লাভ করে।[২৪] এই স্থানান্তরে গিয়ে বারবার বিপদের সম্মুখীন হওয়া এবং

বারবার বিপদ অতিক্রম করার উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে রূপকথা অভিযান কাহিনির উপাদান খানিক বহন করে।

'ডালিম কুমার' গল্পেও ডালিম কুমার তার সাত ভাইয়ের সঙ্গে দেশভ্রমণে বার হয়। কিন্তু রাক্ষসী রাণীর ষড়যন্ত্র সেই ভ্রমণকে বিপদ সংকুল করে তুলে অভিযানে পরিণত করে। ডালিম কুমারের চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়া, রাজপুত্রদের পাশাবতীর কবলে পড়া, ডালিমকুমারের হাতে সূতাশঙ্খ বধ, পাশাবতীর পরাজয়— এভাবে প্রতিবন্ধকতা ও বাধা অতিক্রমের মধ্য দিয়ে ডালিমকুমারের অভিযান সম্পন্ন হয়।[২৫] 'পাতাল-কন্যা মণিমালা' গল্পেও রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র দেশভ্রমণে যায়। কিন্তু পথের বিপদ তাদের ভ্রমণকে অভিযানের সমতুল্য করে তোলে। এভাবে কোথাও অভীষ্ট লক্ষ্য সাধনের জন্য —যেমন কলাবতী রাজকন্যার গল্পে, আবার কোথাও নিছক দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মাধ্যমে— যেমন ডালিমকুমার কিংবা মণিমালার গল্পে রূপকথার নায়করা অভিযানে জড়িয়ে পড়ে।[২৬] আবার 'নীলকমল আর লালকমল' গল্পে অজিত-কুসুমকে রাক্ষসী রাণী চিবিয়ে খেলে, লোহা ও সোনার ডিম হয়ে যাওয়া দুই ভাই ডিম ফেটে বেরোনো দুই ভাই দেশান্তরে চলে যায় ও নানা বাধা-বিপত্তির সঙ্গে মোকাবিলা করে।[২৭] এভাবে রূপকথার নায়করা অভিযান শেষে সাধারণত সুখ-সমৃদ্ধির সঙ্গে লাভ করে রাজকন্যা, নারী-পুরস্কার। জন জি. কাওয়েলতি এই ধরনটি সম্পর্কে বলবেন,

> Often, though not always, the hero's trails are the result of the machinations of a villian, and, in addition, the hero frequently recieves, as a kind of side benefit, the favors of one or more, attractive young ladies.[২৮]

খেয়াল রাখা প্রয়োজন, মৌখিক পরম্পরার এই ধরনের অভিযানে নায়কের চরিত্রের বিকাশ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের শর্তটি পূরণ হতে পারে না। রূপকথার গল্পের উদ্দেশ্যও নয় তা।

অভিযানের উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করানোর চেষ্টা নয়, কল্পনার জগতে দৌড়ের জন্যই এই সব রূপকথার গল্প সৃষ্ট। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ—

> যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্লসন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।[২৯]

অভিযান কাহিনি নির্মাণের জটিলতা, নায়কের অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া, ও চরিত্রের বিকাশের অবকাশ সেখানে না থাকাই স্বাভাবিক। *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ* (২০০৪) গ্রন্থে বলা হয়েছে, কাহিনির ঘটনার সঙ্গে পাত্রপাত্রীর সম্পর্ক থাকলেও, তাদের ব্যক্তিগত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বলে কিছু থাকে না। চরিত্রদের কিছু টাইপ পরিচয়ের উপরে ঘটনা নির্মিত হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য না থাকায় ঘটনাধারার মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ঘটনার ক্রমেও থাকে না যুক্তির পারম্পর্য— "লোককাহিনির প্লট যৌক্তিক বা মনস্তাত্ত্বিক হেতুবাদহীন ঘটনা পারম্পর্যের ধারা।"[৩০] ঘোরপ্যাঁচহীন লোককথার প্লট দ্রুত সমাপ্তির দিকে এগোয়। অভিযানের উৎকণ্ঠা তাই জমে উঠতে পারে না সেখানে। তবু অভিযানের আদল রূপকথায় স্পষ্টতই প্রকাশ পেয়েছে।

অভিযান কাহিনির পূর্বসূত্র আমরা খুঁজে পেতে পারি গীতিকার মধ্যে। মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার কিছু কিছু পালার ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অভিযানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমের জন্য নায়ক নায়িকার, বিশেষত নায়িকার বিপদের সম্মুখীন হতে হতে গমন করার মাধ্যমে অভিযানের আদল ফুটে ওঠে। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় প্রেমের পথে প্রতিবন্ধকতার মাত্রা আরও তীব্রতর হয়েছে সমাজ-অসমর্থিত প্রেম হওয়ায়। সামাজিক স্বীকৃতির

অভাবেই নায়ক-নায়িকাকে অনেক সময় চেনা বেষ্টনীর বাইরে বেরোতে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা আঠারো শতকে দ্বিজ কানাই রচিত মহুয়া পালাটিকে দেখতে পারি।

মহুয়া পালা অনুসারে, গারো পাহাড়ের বনপ্রদেশে বাস হুমরা বেদের। তার পালিত কন্যা মহুয়া। বেদের দল নদের চাঁদের বাড়িতে খেলা দেখাতে এলে নদের চাঁদ মহুয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়। ক্রমে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হুমরা বেদের এই সম্পর্ক পছন্দ না হওয়ায় বেদের দল মহুয়াকে নিয়ে স্থানত্যাগ করে। বিরহের আগুনে তপ্ত নদের চাঁদ মহুয়ার খোঁজে গৃহত্যাগ করতে চাইলে নদের চাঁদের মা বিদেশে পথে ঘাটে পুত্রের বিপদের কথা ভেবে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে; কিন্তু প্রেমিকা মহুয়াকে খোঁজার জন্য নদের চাঁদ গোপনে গৃহত্যাগ করে। মহুয়া পালার প্রথম অভিযান নদের চাঁদের, প্রেমিকা মহুয়ার সন্ধানে। মাসের পর মাস সন্ধান করে অবশেষে নদের চাঁদ মহুয়াকে খুঁজে পায়। মহুয়ার হাতের রান্না খেয়ে নদের চাঁদ জাতি বিসর্জন দেয়। এরপর নদের চাঁদকে দলে রাখার আশ্বাস দিলেও হুমরা বেদে মহুয়ার মাধ্যমেই নদের চাঁদের প্রাণনাশের পরিকল্পনা করে; কিন্তু সে পরিকল্পনা বানচাল করে নদের চাঁদ ও মহুয়া দেশান্তরে পালিয়ে যায়।

নদের চাঁদ ও মহুয়ার পালানো এই পালার দ্বিতীয় অভিযান, যেখানে একের পর এক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে থাকে তারা। তাদের সামনে পথরোধ করে দাঁড়ায় গহন নদী। সাঁতার না জানা মহুয়ার পক্ষে সে নদী পার হওয়া অসাধ্য। সাধু বনিকের নৌকায় এরপর তাদের জায়গা হলেও, সাধু বনিক মাঝিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নদের চাঁদকে জলে ফেলে দেয় এবং নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে মহুয়াকে কাছে পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বুদ্ধিবলে মহুয়া পাহাড়ি তক্ষকের বিষ মেশানো খয়ের খাইয়ে সকলকে অজ্ঞান করে, নৌকা সমেত সাধু বনিকদের ডুবিয়ে দেয়।

এই অভিযানের পরের অংশটুকুতে মহুয়া একা একা নদীর পারের বনে নদের চাঁদকে খুঁজে বেড়ায়। বনের পশুপাখিরা কেউ তাকে খোঁজ দিতে পারে না। অবশেষে ভাঙা মন্দিরের মধ্যে নদের চাঁদকে খুঁজে পায় মহুয়া। এক সন্ন্যাসী নদের চাঁদের প্রাণরক্ষা করে। কিন্তু মহুয়ার রূপে লুব্ধ সন্ন্যাসী মহুয়াকে যৌন প্রস্তাব দিলে, মহুয়া আত্মরক্ষার স্বার্থে নদের চাঁদকে কাঁধে তুলে রাতের অন্ধকারে পালায়। বিপদের সম্মুখীন হওয়া ও বিপদকে অতিক্রম করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় অভিযান সম্পন্ন হয় মহুয়া পালার। অরণ্যে নদের চাঁদ ও মহুয়া সুখে সংসার করতে থাকে। কিন্তু হুমরা বেদের দল তাদের খুঁজে বার করে ও তাদেরকে ঘিরে ফেলে। হুমরা মহুয়াকে নির্দেশ দেয় নদের চাঁদকে হত্যা করে সুজন বেদেকে বিয়ে করতে, কিন্তু মহুয়া নিজের বুকে ছুরি মেরে আত্মহত্যা করে। নদের চাঁদকে বেদের দল হত্যা করে।[৩১]

বিপদবরণ করা, বিয়োগান্তক অথচ লড়াকু প্রেমের জয়গানে মুখরিত মহুয়া পালা করুণ পরিণতিতে শেষ হয়। সমস্ত প্রতিবন্ধকতার ঊর্ধ্বে প্রেমের মাহাত্ম্য ঘোষণাই এই পালার, তথা গীতিকা সাহিত্য সংরূপের প্রধান লক্ষ্য। অভিযান উপাদানটি এখানে প্লটের স্বার্থে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে প্রেমের টানে নিজ চেনা বেষ্টনী ছেড়ে বিপদের মধ্যে অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে প্রেমের গভীরতা ও উন্মাদনাকেই মহিমান্বিত করা হয়েছে, অভিযান সেখানে একটি কার্যকরী উপাদান। তবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন গীতিকায় অভিযাত্রীরা অনেক সময়েই মেয়ে, সামাজিক নিষেধের বাধা টপকিয়ে যারা প্রেমের জন্য বিপদ বরণ করে অজানা পথে বেরোয়। পুরুষের তুলনায় মেয়ে চরিত্রদের পক্ষে এই বেরিয়ে পড়ার অসুবিধা অধিক হওয়াতে মেয়ে-চরিত্রের দৃঢ়তাও যেমন বেড়েছে, তেমনই মেয়ে বলেই, যৌনতা লোলুপ পুরুষ প্রধান অজানা পথঘাট তার সামনে আরও বেশি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ গ্রাম্য মানুষদের

মাধ্যমে সৃষ্ট হওয়ায় অভিযানের ধরন ও বাধাগুলির মধ্যেও গ্রামীণ বাস্তবতার অভিজ্ঞতাও ধরা পড়েছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু স্থানে অভিযানের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বহতা থেকেছে মঙ্গলকাব্যের ধারা। মঙ্গলকাব্যগুলির শরীরী গঠনে অনেক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে অভিযানের প্রবণতা। উদাহরণ স্বরূপ আমরা মনসামঙ্গলের কাহিনির দিকে তাকাতে পারি। মনসামঙ্গল কাব্যের আখ্যান পুজো প্রচলনে উদগ্রীব মনসা ও মনসা বিরোধী, শিবভক্ত চাঁদের নিরলস দ্বন্দ্বের কাহিনি। মনসামঙ্গলের কাহিনি কাঠামোর মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে অভিযানের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে চাঁদের স্ত্রী সনকার মনসা পুজোর ঘট চাঁদ লাথি মেরে ভেঙে দেয় এবং মনসাকেও হেঁতাল লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তারপর চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য যাত্রায় বেরোয়। চোদ্দ ডিঙা নিয়ে পাটনে পৌঁছে চাঁদ দ্রব্যসামগ্রী বিনিময়ের মাধ্যমে মূল্যবান দ্রব্যে নিজের চোদ্দ ডিঙা পূর্ণ করে তোলে। সেইসময় মনসা পুনরায় আবির্ভূত হয়ে চাঁদের কাছে নিজের পুজো চায়। কিন্তু চাঁদ সওদাগর সেই প্রস্তাবে রাজি হয় না। এরপর মাঝসমুদ্রে মনসার আক্রোশে অসময়ে বান আসে। চারিদিক জলে উত্তাল হয়ে যায়। চাঁদের চোদ্দ ডিঙা অতলে ডুবে যায়। চাঁদ সমুদ্রের জলে ভাসতে থাকে। চাঁদ ডুবে গেলে যেহেতু মনসার পুজোর প্রচার হবে না, তাই মনসা তার কাছে তীরে পৌঁছাবার আশ্রয় ফেলে দিলেও, মনসার সহায়তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে চাঁদ মুখ ফিরিয়ে নেয়। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও মাথা নত না করে চাঁদ মনসার বিরুদ্ধতা জারি রাখে। তবু চাঁদ তীরে গিয়ে পৌঁছায়। বারো বছর প্রবাসে নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে পথের ভিক্ষুক রূপে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ নিজের দেশে এসে পৌঁছায়। বাণিজ্য যাত্রায় বেরিয়ে মনসার ষড়যন্ত্রে বিপদের সম্মুখীন

হয়ে, সেই বিপদের সামনে মাথা নত না করে অনেক চেষ্টায় চাঁদের এই ফিরে আসা মনসামঙ্গলের প্রথম অভিযান লক্ষণ।

মনসামঙ্গলের দ্বিতীয় অভিযান দেখতে পাওয়া যায়, মনসা প্রেরিত সাপের দংশনে মৃত লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য বেহুলা যখন স্বামীর দেহ নিয়ে গাঙ্গুরের জলে ভেলা ভাসায়। ভেলা ভাসতে ভাসতে গোদার ঘাটে এসে ঠেকে। গোদা সেখানে বঁড়শীতে মাছ ধরছিল। বেহুলার রূপে লুব্ধ বেহুলাকে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার কঠিন প্রতিজ্ঞা ছেড়ে তাকে বিয়ে করতে বলে। ক্রুদ্ধ বেহুলা তাকে অভিশাপ দেয়, যতদিন না বেহুলা দেবপুর থেকে ফিরে আসছে ততদিন তার পায়ে বঁড়শী বিঁধে থাকবে। এরপর বেহুলার ভেলা আপুয়া ডোমের ঘাটে গিয়ে পৌঁছায়। আপুয়া ডোমও বেহুলাকে একই প্রস্তাব দিলে, তাকেও বেহুলা অভিশাপ দেয়। আপুয়া ডোম নদীর তীরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকে। এরপর মোনা ধোনারাও বেহুলাকে বলে তাদের একজনকে বিয়ে করতে। নাও উল্টে গিয়ে তারাও শাস্তি পায়। তারপর নেতা মনসার আদেশে বাঘ হয়ে লখিন্দরের গলিত মাংস খেতে আসে। বেহুলা নিজেকে বলি দিয়ে বাঘের পেট ভরাতে চায়। নেতা চিলের রূপ ধরে লখিন্দরের পাঁজর ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়। বেহুলা আঁচল দিয়ে ঢেকে স্বামীর পাঁজর রক্ষা করে। এভাবে পথের নানা বিপদের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে বেহুলা নেতা ধোপানীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে স্বর্গের নেতা ধোপানীর অনায়াসে ছেলের প্রাণহরণ ও কানে মন্ত্র বলার মাধ্যমে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া দেখে বিস্মিত বেহুলা তার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়; কিন্তু মনসার দ্বারা হত লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য নেতা ধোপানী তাকে দেবপুরীতে দেবতাদের কাছে যেতে বলে। নেতা ধোপানীর সঙ্গে বেহুলা দেবতাদের কাছে যায় ও সেখানে নৃত্যের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করে।

মহাদেবের কথায় মনসা লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেয়, চাঁদ মনসার পুজো করবে, এই শর্তে। অজানা পথে অজস্র বাধা জয় করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে বেহুলার অভিযান সম্পন্ন হয়।[৩২]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অভিযানের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় বণিক খন্ডে, ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রায়। ষোলো শতকে রচিত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খন্ডে অভিযানের চিহ্ন বিশেষ না থাকলেও বণিক খন্ডে ধনপতি ও চণ্ডীর দ্বৈরথের ফলে ধনপতির সিংহল যাত্রার সময় বিপদ ঘনিয়ে আসে। খুল্লনা চণ্ডীর পুজো করছে জেনে চণ্ডীর ঘটে লাথি মেরে ধনপতি সিংহলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বেরোয়। ক্ষুব্ধ চণ্ডী ধনপতির ডিঙা ডুবিয়ে তাকে প্রাণে মারবে বলে ঘোষণা করে। পদ্মাবতী তাকে বোঝায় ধনপতি মরলে চণ্ডীর পুজোর প্রচলন হবে না। ফলে ছয় নৌকা ডোবালেও একটি নৌকায় ধনপতি সিংহল যাবে বলে স্থির হয়। ধনপতির যাত্রাপথের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন মুকুন্দরাম। নবদ্বীপ, পাড়পুর, শান্তিপুর, আম্মুয়া, গুপ্তপাড়া, কোদালিয়া ঘাট, হালিশহর পেরিয়ে ত্রিবেণীতে এসে পৌঁছায় ধনপতির বাণিজ্য তরী। সেখান থেকে সপ্তগ্রাম হয়ে খড়দহ, কাঙরনগর, পেরিয়ে আরও নানা স্থান পেরোতে পেরোতে ধনপতি মগরায় এসে পৌঁছায়। সেখানে চণ্ডীর পরিকল্পনায় তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়। চণ্ডীর আদেশে হনুমান ডিঙার ছাওনি ভেঙে ফেলে। দেবীর আদেশে যাবতীয় নদনদী মগরায় এসে হাজির হয়। ডিঙার চারপাশে কুমীর, ভয়ঙ্কর দর্শন গিরিগুহা, এবং ধারালো, খরস্রোতা জলের উপস্থিতি বিপদ ঘনিয়ে তোলে। ধনপতি আরাধ্য শিবকে ডাকতে শুরু করলে চণ্ডী ধনপতির ছয় ডিঙা বরুণের কাছে রাখতে আদেশ দেয়। বরুণ দুটো ডিঙা টেনে নেয়, বাকি চারটে হনুমান লাথি মেরে ভেঙে দেয়। একমাত্র ধনপতির মধুকর ডিঙা ভেসে থাকে।

এরপর ধনপতির নৌকা সঙ্কেতমাধবের দেউল, নীলাচল, চড়ই গুহা, কলধৌতপুর, চন্দ্রসিদ্ধ দ্বীপ, জোঁক দহ ও অন্যান্য নানা দ্বীপ পেরিয়ে রামের সেতুবন্ধ ও চন্দ্রচূড় পর্বত পার হয়ে কালিদহে পৌঁছায়। সেখানে ধনপতি চণ্ডীর ছলনায় কমলে কামিনী দর্শন করে। এরপর ধনপতি সিংহলে পৌঁছায়। পথের বর্ণনা ও পথের বিপদে ধনপতির সিংহল যাত্রা অভিযানগন্ধী হয়েছে। ধনপতি সিংহল রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েও কমলে কামিনী দেখাতে না পেরে বন্দী হয় কারাগারে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দ্বিতীয় অভিযান শুরু হয় শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার মাধ্যমে। মাতৃস্নেহের বাধা কাটিয়ে শ্রীমন্ত সিংহল যাত্রা করে। শ্রীমন্তের যাত্রা পথেরও দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন কবি। ললিতপুর, ভাওসিংহের ঘাট, পূর্বস্থলির ঘাট, নবদ্বীপ, হয়ে ধনপতির পথেই যাত্রা করে শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তও মগরায় এসে চণ্ডীর ষড়যন্ত্রে বিপদের মুখে পড়ে। প্রবল দুর্যোগ শুরু হয়। আবারও দেবীর আদেশে হনুমান ডিঙার ছাউনি ভেঙে দেয়। নানা নদনদী মগরায় এসে মিলিত হয়। দেবীর নাম করে শ্রীমন্ত জলে ঝাঁপ দেয় ও দেবী তাকে কোলে তুলে নেয়। এরপর দেবীর নির্দেশেই দুর্যোগ কেটে যায়। শ্রীমন্তর নৌকা ক্রমে দ্রাবিড় দেশে এসে উপস্থিত হয়। তারপর হাদিয়া দহ পেরিয়ে শ্রীরাম নির্মিত সেতুতে পৌঁছায় শ্রীমন্ত। এরপর চন্দ্রকূট পর্বতে যক্ষরাজের দেশ হয়ে কালীদহে পৌঁছালে শ্রীমন্তও চণ্ডীর ছলনায় কমলে কামিনী দর্শন করে। তারপর সিংহল রাজ্যে প্রবেশ করেও শ্রীমন্ত বিপদমুক্ত হয় না। রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েও ধনপতির মতোই শ্রীমন্ত কমলে কামিনী দেখাতে ব্যর্থ হয়। রাজা শ্রীমন্তের নৌসম্পত্তি হরণ করে ও সঙ্গীদের ওপর অত্যাচার করে। মুক্তির আশায় শ্রীমন্ত দেবীর স্মরণাপন্ন হয়। দেবী প্রথমে ছদ্মবেশে শ্রীমন্তকে রক্ষা করতে আসে। শ্রীমন্তকে হত্যা করার চেষ্টা চললে দেবীর কৃপায় তার

প্রাণ রক্ষা হতে থাকে। এরপর দেবীর নির্দেশে দেবীর সৈন্যদল বেরিয়ে এসে যুদ্ধ শুরু করে। তারপর রাজা নতজানু হলে দেবী শ্রীমন্তকে মুক্তি দিতে বলেন ও কমলে কামিনী দেখান। ধনপতি ও শ্রীমন্তর সিংহল অভিযানের যাত্রাপথ ও পথের বিপদ মোটের ওপর একই রকমের। কেবল প্রথম ক্ষেত্রে দেবীর কৃপা না থাকায় ধনপতিকে বিপদে পড়তে হয় ও কারারুদ্ধ হতে হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেবীর কৃপায় শ্রীমন্ত বিপদমুক্ত হয়। সিংহল যাত্রার অংশ বাদ দিলে চণ্ডীমঙ্গলের বাকি অংশ কিন্তু অভিযানের সংস্পর্শহীন। সিংহল যাত্রাতেও নানা ভিন্নতর প্রসঙ্গ, বন্দনা ও পৌরাণিক কাহিনি যুক্ত হয়ে অভিযানের গতিকে ব্যাহত করেছে। তবু যাত্রাপথের বর্ণনা ও পথের বিপদের মাধ্যমে অভিযানের আবছা আদল ফুটে উঠেছে ধনপতি ও শ্রীমন্তর সিংহল যাত্রায়।[৩৩]

ধর্মমঙ্গল কাব্যকাহিনির মধ্যেও অভিযানের প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করতে পারি। ধর্মমঙ্গলের কাহিনিতেই আমরা অভিযান নায়কের আদলটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখি। হরিশচন্দ্রের আখ্যানের মধ্যে অভিযানের চিহ্ন না থাকলেও লাউসেনের কাহিনির মধ্যে অভিযানের ছাপ বর্তমান। ধর্মমঙ্গলের কাহিনি অনুসারে গৌড়েশ্বরের সামন্ত কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেনকে শৈশব থেকেই রঞ্জাবতীর ভাই, খলনায়ক মহামদ নানাভাবে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় জন্মানো ধর্মভক্ত লাউসেন বারবারই ধর্মের আশীর্বাদে নিরাপত্তা পায়। পিতামাতার শিক্ষায় ও ধর্মের আশীর্বাদে লাউসেন চরিত্রবান ও বীরযোদ্ধা হয়ে ওঠে। ভাই কর্পূরকে নিয়ে সে ময়নাগড় থেকে গৌড়েশ্বরের রাজসভার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পথের বিপদ লাউসেনের এই ময়নাগড় থেকে গৌড় অবধি যাত্রাকে অভিযানের সমতুল্য করে তোলে। পিতামাতা তার গৌড়েশ্বরের সভায় যাওয়া নিয়ে আশঙ্কিত হলেও অভিযান নায়কের মতোই

লাউসেন সে আশঙ্কায় দমে না গিয়ে যাত্রা করে। পথে লাউসেন দুর্দান্ত বাঘ ও নরখাদক কুমীরকে বধ করে বীরত্বের পরিচয় রাখে। কিন্তু পথের বিপদ তাতেই শেষ হয় না। জামতী নামক স্থানে এক নারী লাউসেনকে বিপন্ন করার চেষ্টা করে, কিন্তু চরিত্রবান লাউসেন সেই বিপদ থেকে চরিত্রের দৃঢ়তার গুণে উদ্ধার হয়। গোলাহাটে পৌঁছালে রানী সুরীক্ষা হেঁয়ালী জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে তাকে বন্দী করার চেষ্টা করে। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার জোরে লাউসেন সব হেঁয়ালীর উত্তর দিয়ে পরিত্রাণ পায়। গৌড়ে প্রবেশ করেও তারা বিপদমুক্ত হয় না। মহামদ তাদের চোর হিসেবে প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র করে। মহামদ ঘোষণা করে, কারো ঘরে প্রবাসী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেলে তাকে রাজদণ্ড ভোগ করতে হবে। আশ্রয়দাতাকে বিপদে না ফেলার জন্য লাউসেন ও কর্পূর নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে গাছের তলায় আশ্রয় নেয়। মহামদের নির্দেশে সেখানে রাজার পাটহস্তী বেঁধে রেখে লাউসেনকে হাতি-চোর বলে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজার সামনে লাউসেন নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করে ও প্রকৃত পরিচয় উদঘাটন করে। প্রীত রাজা তাকে রাজসম্মানে ভূষিত করে। ফেরার পথে কালু ডোম ও তার স্ত্রী লখ্যার সঙ্গে লাউসেনের পরিচয় হয় ও তাদের সে ময়নাগড়ে নিয়ে আসে। কালু ডোম লাউসেনের প্রধান সেনাপতি হয়। গৌড় অভিযানে লাউসেন নিজের বলবীর্য, বুদ্ধিমত্তা ও চরিত্রগুণের মাধ্যমে একের পর এক বিপদ খণ্ডন করতে করতে এগোয়, অভিযান নায়কের মতোই।

গৌড় অভিযানই ধর্মমঙ্গলের একমাত্র অভিযান নয়। এরপর গৌড়েশ্বর লাউসেনকে নানা রাজ্যে অভিযানে পাঠাতে থাকে মহামদের কুপরামর্শে। কামরূপ রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, লাউসেনকে গৌড়েশ্বর যুদ্ধে পাঠান। সেনা নিয়ে যুদ্ধাভিযানের পথে লাউসেনের রাস্তায় পড়ে কানায় কানায় পূর্ণ ব্রহ্মপুত্র নদ। লাউসেন সেই ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করে জপমালার সাহায্যে

কামরূপের মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তাড়িয়ে কামরূপ অধিকার করে। কামরূপ রাজা লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। ফেরার পথে মঙ্গলকোটের রাজা গজপতির কন্যাকেও সে বিয়ে করে। বর্ধমানের রাজকন্যাকেও সে ফেরার পথে বিয়ে করে। এভাবে অভিযানের পুরস্কার হিসেবে তার নারীলাভ ঘটতে থাকে। এরপর গৌড়েশ্বর সিমূলার রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়াকে গৌড়েশ্বর বিয়ে করতে চাইলে, কানাড়া যখন তাতে আপত্তি করে তখন অপমানিত গৌড়েশ্বর নয় লক্ষ সেনা নিয়ে সিমূলায় উপস্থিত হন। কানাড়া একটি লোহার তৈরি গণ্ডার এনে শর্ত দেয়, যে এক আঘাতে এই গণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করবে, কানাড়া তাকেই স্বামী হিসেবে স্বীকার করবে। গৌড়েশ্বর তা না পারলে, লাউসেনের ডাক পড়ে। লাউসেনের লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করে। এরপর কানাড়ার সঙ্গে লাউসেনের এই চুক্তিতে যুদ্ধ হয় যে লাউসেন পরাজিত হলে কানাড়া তাকে বিয়ে করবে। লাউসেন পরাজিত হয় ও কানাড়ার সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

বারবার ষড়যন্ত্র করেও বিফল হয়ে মহামদ গৌড়েশ্বরকে বুঝিয়ে ঢেকুর গড়ের ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে, যার হাতে লাউসেনের পিতা কর্ণসেন বিপর্যস্ত হয়েছিল, লাউসেনকে প্রেরণ করে। লাউসেন যুদ্ধাভিযানে গিয়ে অজয় নদের তীরে ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ধর্ম ঠাকুরের কৃপাধন্য লাউসেন ও পার্বতীর কৃপাধন্য ইছাই ঘোষের যুদ্ধ যেন আসলে দুই দেবতারই লড়াই। পার্বতীর সাহায্যে অসামান্য বিক্রম দেখিয়েও ইছাই ঘোষ ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেনের কাছে পরাজিত হয়। ধর্মঠাকুরের কৃপাতেই লাউসেনের এই উন্নতি বুঝে মহামদও ধর্মঠাকুরের পুজো শুরু করে। কিন্তু মিথ্যা ভক্তিতে বিরক্ত ধর্মঠাকুর সে পুজোয় বাধা দিতে গৌড় নগরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি এনে জলস্রোতে সব কিছু ভাসিয়ে দেওয়ার উপক্রম করে। গৌড়েশ্বর আবার

লাউসেনের স্মরণাপন্ন হন। রাজ্যের পাপ দূর করতে লাউসেন হাকন্দ নামক স্থানে গিয়ে দুশ্চর তপস্যায় নিজেকে নিয়োজিত করে। সেই সুযোগে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করলে কালু ডোমের মৃত্যু হয়। কিন্তু তার স্ত্রী লখ্যা মহামদের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের নদীর তীর অবধি তাড়িয়ে দেয়। এরপর লাউসেন ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাতে সক্ষম হয়। মহামদেরও শাস্তি হয়।[৩৪]

প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ধর্মমঙ্গলেই অভিযানের লক্ষণ সবচেয়ে সুস্পষ্ট। অভিযান নায়কের অনেকগুলি গুণ লাউসেনের মধ্যে দৃষ্ট হওয়ায় অভিযানের প্লট শক্তিশালী হয়েছে আরও। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলায় ধর্মঠাকুরের কৃপা থাকলেও লাউসেন অনেক বেশী সক্রিয়। লাউসেনের সক্রিয়তা এবং বারংবার তার অভিযানে বেরোনোর ফলে ধর্মমঙ্গল কাব্যে অভিযান আরও স্পষ্টত দৃষ্ট হয়েছে।

এছাড়াও কিছু কিছু অপ্রধান মঙ্গল কাব্যে অভিযানের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়, তবে তা প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির তুলনায়ও অস্পষ্ট। 'কালিকামঙ্গল'-এ যেমন কালীর থেকে প্রাপ্ত শুকপক্ষীর সাহায্যে সুন্দরের রাজকন্যা বিদ্যার উদ্দেশ্যে অদৃশ্য যাত্রা, মালিনীর ঘর থেকে বিদ্যার ঘর অবধি সুরঙ্গ পথে যাতায়াত, কোটালকে ফাঁকি দিয়ে চলাফেরার মাধ্যমে অভিযানের ক্ষীণ চেহারা কোথাও কোথাও দেখা যায়।[৩৫] আবার সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাসের 'রায় মঙ্গল' (১৬৮৬) অনুসারে পুষ্পদত্তের মধুকর নামে জাহাজ নির্মাণ করে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করায় অভিযানের চিহ্ন খানিক পাওয়া যেতে পারে। এ অভিযানে নিখোঁজ পিতাকে উদ্ধার করাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পথে পীরের মোকাম দেখে সে পোতের কর্ণধারের নিকট তার ইতিহাস জানতে চায়। কর্ণধার পুষ্পদত্তকে দক্ষিণ রায় ও বড় গাজী খাঁর বিরোধ ও

মিলনের কাহিনি শোনায়। তারপর পুষ্পদত্ত সমুদ্র অতিক্রম করার সময় জলের ওপর তুরঙ্গ নামে এক বিচিত্র নগর দেখতে পায়। পুষ্পদত্ত রাজাকে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে, কিন্তু রাজাকে অদ্ভুত নগরী দেখাতে না পেরে সে কারারুদ্ধ হয়। অবশেষে দক্ষিণ রায়ের স্তব করে সে মুক্তি পায়, কারারুদ্ধ পিতাকে মুক্ত করে এবং রাজকন্যা রত্নাবতীকে বিয়ে করে স্বদেশে ফিরে আসে।[৩৬] রায়মঙ্গল কাব্যে পুষ্পদত্তের এই অভিযান চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডের শ্রীমন্তের অভিযানের সঙ্গে সমরূপ। আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪) জানিয়েছেন,

> দেখা যাইতেছে যে, দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে বড় গাজী খাঁর— যুদ্ধ-বৃত্তান্তই এই কাহিনির মৌলিক অংশ— এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অংশ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি হইতে অবিকল গ্রহণ করা হইয়াছে।[৩৭]

এইরকম কিছু কিছু অপ্রধান মঙ্গলকাব্যে এবং প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে অভিযানের কিছু আদল আমরা খুঁজে পেতে পারি; কিন্তু অভিযানের রোমাঞ্চ দান করা এই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল দেবী কিংবা দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার। মঙ্গলকাব্যে নির্দিষ্ট দেব-দেবীর পুজো না করলে কেমন ভয়ানক বিপদ হতে পারে এবং পুজো করলে কীভাবে সমস্ত বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, সেই উপদেশ দেওয়ার জন্যই গল্পগুলি নির্মিত। ফলে দেবদেবীর প্রশস্তিই এখানে প্রধান উপজীব্য। অভিযানের কিছু উপাদান থাকলেও আমরা এগুলিকে অভিযান কাহিনি বলতে পারি না।

মঙ্গলকাব্যে অভিযানের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আঠারো শতকে রচিত 'তীর্থমঙ্গল' কাব্যের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। যদিও 'তীর্থমঙ্গল' যথার্থে মঙ্গলকাব্য নয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য তীর্থমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে বলবেন, "ক্রমে 'মঙ্গল' শব্দটি এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল যে, যে কোনও বিষয়ক মাহাত্ম্যপূর্ণ কাব্য হইলেই তাহা মঙ্গল নামে অভিহিত হইত।"[৩৮] আঠারো

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিজয়রাম সেন রচিত 'তীর্থমঙ্গল' আসলে কাব্য আকারে রচিত ভ্রমণকাহিনি। বাংলা ভ্রমণকাহিনির প্রাথমিকসূত্র রূপে তীর্থমঙ্গলকে দেখা যেতে পারে। চব্বিশ পরগণা জেলার চিকিৎসক বিজয়রাম সেন, পলাশীর যুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে জলপথে কাশীযাত্রা করেন। খিদিরপুর থেকে কৃষ্ণচন্দ্রের নৌকা পুঁটিমারীতে পৌঁছালে বিজয়রাম সেন ঘাটে এসে তার সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সঙ্গে চিকিৎসক থাকলে সুবিধা হতে পারে ভেবে কৃষ্ণচন্দ্র তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হন। এরপর নবদ্বীপ, ঝিনুকঘাটা, জলঙ্গী, রাজমহল, মুঙ্গের, গয়া, রামনগর, কাশী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যগিরি ঘুরে ১১৭৭ সনের ভাদ্র মাসে তারা খিদিরপুরে ফিরে আসেন। এই ভ্রমণের মধ্যে একবার মারাত্মক বসন্তরোগ দেখা দেয়, বিজয়রামের চিকিৎসায় অনেকে রোগমুক্ত হয়। বিজয়রাম প্রতিটি স্থানের যথাযথ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন কাব্যে।[৩৯] তবে ভ্রমণসাহিত্যের সঙ্গে এই কাব্যের যতটা মিল, অভিযানের বিপদ-ঝুঁকি-প্রতিবন্ধকতা-উৎকণ্ঠার অভাবে অভিযান সাহিত্যের সঙ্গে আমরা সেভাবে কাব্যটিকে মেলাতে পারিনা। পরবর্তী কালের ভ্রমণ সাহিত্যের সঙ্গেও অভিযান সাহিত্যের একই কারণে অমিল থেকে যাবে। তবে আঠারো শতকে বাঙালির ঘর ছেড়ে বেরোনোর চিহ্ন হিসেবে, কাব্যটি স্মরণযোগ্য।

মধ্যযুগের সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদগুলির মধ্যেও আমরা অভিযানের বীজ লক্ষ্য করতে পারি। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন মহাকাব্যেই অভিযানের খানিক চিহ্ন বর্তমান থাকে। রামায়ণে অযোধ্যা থেকে রাম-লক্ষণ-সীতার বনবাসে যাত্রা ও নানা প্রতিবন্ধকতা উত্তরণ, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ ও তারপরে রামের লঙ্কাভিযান, দুস্তর পথের বাধা পেরিয়ে নতুনতর স্থানে পৌঁছাতে থাকা, বিপদবরণ ও সংগ্রামের মাধ্যমে জয়লাভ অভিযানের চেহারাকে প্রকট

করে তোলে। মহাভারতেও পঞ্চপাণ্ডবের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের সময় নানা পথে ভ্রমণ, নতুন নতুন স্থানে যাত্রা এবং শক্তি ও বুদ্ধিবলে বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করাতে অভিযানের কাঠামোটি বর্তমান। মহাকাব্যের বিপুলতা নানা বিচিত্র সন্নিবেশের মধ্যে অভিযানকেও ধারণ করে রেখেছে। মধ্যযুগের বাংলায় কৃত্তিবাস ওঝার (সপ্তদশ শতাব্দী?) রামায়ণ পাঁচালীতে ও অন্যান্য রামায়ণ অনুবাদে এবং কাশীরাম দাসের ((সপ্তদশ শতাব্দী) ও অন্যান্যের মহাভারত অনুবাদে অভিযানের উপাদানটি কাহিনি কাঠামোর মধ্যে থেকে গিয়েছে।

উনিশ শতকের গদ্যকাহিনির মধ্যেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা অভিযানের চিহ্ন দেখতে পাব। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের (১৮৪০—১৯৩২) *দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ*। রচনাটিতে আমরা অভিযানের আদল ফুটে উঠতে দেখি। কথকের সমুদ্রযাত্রা ও যাত্রাপথে প্রবল ঝড়ের মুখে বোটে করে সমুদ্রে ভাসার বর্ণনা অভিযান তথা অ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়া নিয়ে আসে—

> আমি কাল্পনিক ভয়ে সীৎকার করিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, যদি জাহাজ রক্ষা পায়, তবে সেই দশা হইবে, যদি রক্ষা না পায় তবে অবশ্য মৃত্যু। এই চিন্তিয়া জাহাজের ছাদে যে বোট্ থাকে, তাহা সমুদ্রে সত্বরে ভাসাইলাম এবং তৎক্ষনাৎ তাহার উপরে লাফিয়া পড়িলাম। তরঙ্গের বেগে বোট্ বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইল। আমি তাহাকে বায়ুর গতিতে সমর্পণ পূর্ব্বক স্থির ভাবে উপবিষ্ট থাকিলাম।[৪০]

স্থানিক সরণ ও বিপদের সঙ্গে মোকাবিলার চেষ্টায় অভিযানের চিহ্ন এখানে প্রকট। এরপর কথক অচেতন অবস্থায় সমুদ্রতটে গিয়ে পৌঁছায়। কমলাদী নামের যুবতী ও তার মায়ের সেবায় সুস্থ হয়ে ওঠে। কমলাদীর সঙ্গে বিবাহের পরিকল্পনা হলেও কথকের ঘরছাড়া মন তাকে আবার পথেই টেনে নিয়ে যায়। এরপর মহীশূরে হায়দারের সেনা হিসেবে কথকের নিযুক্ত হওয়া,

দস্যুদের ধরিয়ে দেওয়া ও সেনার অর্ধেক ভাগের নেতা হওয়া, টিপুর সঙ্গে বিরোধ, মহীশূর ত্যাগ করে মালোয়ার পথে যাত্রা, ইংরেজদের হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে অরণ্য ও পাহাড়ি পথে মালোয়া পৌঁছানো ইত্যাদি বিচিত্র ঘটনা বর্ণিত হতে থেকেছে। বিবিধ নারীর প্রতি প্রেমের আসক্তিও প্রকাশ পেতে থেকেছে স্থানে স্থানে। অভিযান কাহিনির অঙ্কুর এই রচনায় কোথাও কোথাও দেখা গেলেও কাহিনি হিসেবেও 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' জমাট বাঁধতে পারেনি, অ্যাডভেঞ্চার হিসেবেও প্লট দানা বেঁধে ওঠেনি। উনিশ শতকের বাঙালির কাছে দূরদেশে রোমাঞ্চকর ভ্রমণ, যথেচ্ছ নারী সান্নিধ্য লাভ ও নায়কোচিত বীরত্ব দেখানোর মতো বিষয়গুলি যেন কিছুটা কষ্টকল্পনা ছিল। দূরের পটভূমিতে অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্নকে কাঠামো দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা থেকে সে ছিল বঞ্চিত। রচনাটির বয়ানে সেই না-দেখতে-পারা স্বপ্নেরই যেন বর্ণনার চেষ্টা চলেছে। উনিশ শতকের বাঙালির অ্যাডভেঞ্চারের দুরাকাঙ্ক্ষা যে ব্যর্থই হয়েছে, তারই প্রতীক যেন এই রচনা। বাঙালিকে দূর পটভূমিতে অ্যাডভেঞ্চারের গল্প নির্মাণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক অবধি। সে কথায় আমরা পরে আসব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮—১৮৯৪) 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) কিংবা 'রাজসিংহ'(১৮৮২)-এর মতো উপন্যাসে অভিযান তথা অ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়া আছে বলে মনে হতে পারে। উপন্যাসগুলির রোমান্সধর্মীতার কারণেই অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে কিছু কিছু মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু খেয়াল রাখা প্রয়োজন, রোমান্স ও অ্যাডভেঞ্চারের সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য হল রোমান্সের ক্ষেত্রে বিপদযাত্রায় নারী-পুরুষের প্রেম সম্পর্ক স্থাপনই প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সামাজিক ও মানসিক বাধা অতিক্রমেরও প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে প্রেমের আগ্রহের থেকে নায়কের বিপদ ও বাধার সঙ্গে লড়াইয়ের

আগ্রহই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নায়কের প্রেম সম্পর্ক নয়, বিপদ বা বাধা বা শত্রুর সঙ্গে কেমন সম্পর্কে সে জড়াচ্ছে তাই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চারে। রোমান্সে অ্যাডভেঞ্চারের উপাদান কিছু কিছু থাকলেও বিপদ সেখানে প্রেমের সামনে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে প্রেমের সম্পর্ককে মজবুত গঠন দিতেই ব্যবহৃত হয়।[৪১] ফলে অভিযান উপন্যাস হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। তবে 'কপালকুণ্ডলা'য় প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলার সামাজিক নাগপাশে জড়িয়ে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে বন্ধনমুক্ত হতে চাওয়া, উনিশ শতকের সমাজে অবরুদ্ধ নারীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে ইঙ্গিত করে, যা ইউরোপীয় রোমান্টিকতার ধারণাকে বহন করে নিয়ে আসে।

বাঙালির চেনা ঘেরাটোপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কথা আরেক সাহিত্যবর্গে কিন্তু বলা হতে থেকেছে। ভ্রমণ সাহিত্যের মধ্যে বাঙালির ঘর ছেড়ে বেরোনোর কথা বারেবারে উঠে এসেছে। সতেরো শতকে নরহরি চক্রবর্তী *ব্রজ পরিক্রমা* ও *নবদ্বীপ পরিক্রমা*-য় শ্রীচৈতন্যের ভ্রমণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। আঠারো শতকের *তীর্থমঙ্গল* -এর কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এরপর গদ্য সাহিত্যে প্রথম ভ্রমণকাহিনি রূপে আত্মপ্রকাশ করে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের(১৮৩৪-১৮৯৯) *পালামৌ*। প্রমথ নাথ বসু ছদ্মনামে তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ছয়টি কিস্তিতে (পৌষ ১২২৫ থেকে ফাল্গুন ১২২৮ বঙ্গাব্দ অবধি) 'পালামৌ' রচনা করেন। উনিশ শতকেই প্রথম বাঙালি হিসেবে রামমোহন রায়(১৭৭২-১৮৩৩) ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডে যান। ১৮৪২ সালে ইংল্যান্ডে যান প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)। তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ১৮৬২ সালে বিলাত যাত্রা করেন। শিক্ষিত, মেধাজীবী বাঙালির কাছে প্রবাস তখন ক্রমশ পরিচিত হচ্ছিল। উনিশ শতক থেকেই তাই লেখা চলছিল ভ্রমণবৃত্তান্ত। উনিশ শতকেই রচিত হয় যদুনাথ সর্বাধিকারীর (১৮০০-১৮৭০)

তীর্থভ্রমণ। তীর্থের উদ্দেশ্যে যদুনাথ সর্বাধিকারী কাশী যাত্রা করেন। সেইসময়েই ঘটে সিপাহী বিদ্রোহ। সিপাহী বিদ্রোহের বর্ণনা ও তীর্থযাত্রার দিনলিপি মিলেমিশে কোথাও কোথাও অভিযানের রোমাঞ্চ এনেছে তার রচনায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ ভ্রমণ করে 'ভ্রমণকারি বন্ধু হইতে প্রাপ্ত' শিরোনামে ১২৬১ বঙ্গাব্দ থেকে *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় ভ্রমণ লিপি লিখতে থাকেন। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের *য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি* । এরপর বিশ শতকের শুরুতে জলধর সেনের (১৮৬০-১৯৩৯) *প্রবাস* (১৮৯৯), *হিমালয়* (১৯০০), *পথিক* (১৯০১) -এর মতো পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হতে থাকে। মোট চোদ্দটি ভ্রমণ কাহিনি লেখেন তিনি। ভ্রমণ সাহিত্যের এই ধারায় স্থানিক সরণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ঘাটতি না থাকলেও অভিযান কাহিনির বিপদ ও বিপদের সঙ্গে লড়াই, উৎকণ্ঠা, নায়ক চরিত্রের অবস্থান এখানে দেখা যায় না। বাংলা অভিযান সাহিত্যের পূর্বসূত্র রূপে তবু ভ্রমণসাহিত্যগুলি উল্লেখের দাবি রাখে।

ভ্রমণসাহিত্যের ধরনকে কিছুটা আত্মসাৎ করেই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস রচনা করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব ১৩২২ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের মাঘ পর্যন্ত 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনি' নামে প্রকাশিত হয়। ১৩২২ বঙ্গাব্দের মাঘ ও ফাল্গুনে রচয়িতার নাম 'শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা' বলে প্রকাশ করা হয়। চৈত্র সংখ্যায় অর্থাৎ তৃতীয় কিস্তি থেকে শরৎচন্দ্রের নামেই তা ছাপা হতে থাকে। গ্রন্থাকারে মাঘ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে *শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব* নামে উপন্যাসাকারে রচনাটি প্রকাশিত হয়। নামকরণ ও নাম পরিবর্তন থেকেই বোঝা যায়, প্রাথমিক ভ্রমণকাহিনি নির্মাণ প্রচেষ্টা থেকে উপন্যাসের দিকে যাত্রা করেছে রচনাটি। তাহলেও নিছক ভ্রমণ কাহিনিই কি হয়ে থেকেছে উপন্যাসের

প্রথম অংশগুলি? ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনার সঙ্গে সেখানে এসে মিশেছে অভিযানের উপাদান। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের রাতের অন্ধকারে গঙ্গার বুকে মাছ চুরির জন্য ডিঙিতে ভেসে যাওয়া, খরস্রোতা নদী, ভয়ঙ্কর অন্ধকার, বুনো শুয়োর, সাপের বিপদ, জেলেদের হাতে ধরা পড়ার ভয়, ভূতের ভয়, মৃত্যুর আশঙ্কা তাদের এই অভিযানকে উৎকণ্ঠা ও রোমাঞ্চে ভরপুর করে তুলেছে। উপন্যাসের শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথ অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে আমরা তাকে অভিযান কাহিনি বলতে পারি। তবে সামগ্রিক উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের জটিল বুনোটই প্রধান উপজীব্য বিষয়। রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের সম্পর্কের টানাপোড়েন, যার ওপর পড়েছে অন্যান্য চরিত্রদের জীবন অভিজ্ঞতার প্রভাব, সেই টানাপোড়েনই এই উপন্যাসের মূলগত বিষয়।[৪২] উপন্যাসটি সামগ্রিক বিচারে অভিযান উপন্যাস নয়, তবে শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথের অভিযান বাংলা অভিযান সাহিত্য রচনা শুরু হওয়ার আগেই যে দাগ রেখে গেছে, অভিযান সাহিত্যের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসেও তা ফিকে হয়ে যায়নি।

অভিযান সাহিত্য রচনা শুরু হওয়ার আগেই নিটোল উৎকণ্ঠাপূর্ণ এই অভিযানের প্লট সুসাধ্য হয়েছে অভিযান নায়ক রূপে ইন্দ্রনাথকে গড়ে তোলার মাধ্যমেই। শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের ফুটবল মাঠে প্রথম আলাপের সময় থেকেই শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের সাহসী ও দয়ার্দ্র চরিত্রে মুগ্ধ, যেমনটা অভিযান নায়ক সম্পর্কে তার সঙ্গীরা হয়ে থাকে। ইন্দ্রনাথের ভয়হীন, ডাকাবুকো মনোভাব, দুর্বার প্রাণশক্তি, উদার মানসিকতা, অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার সংবেদনশীলতা ইন্দ্রনাথকে নায়কোচিত বীরত্বে উত্তীর্ণ করেছে। এই বীর নায়কের মহত্বের বারবার বন্দনা করতে দেখা গিয়েছে শ্রীকান্তকে। অভিযান নায়কের সাহস ও শক্তির পাশাপাশি শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথ চরিত্রের মধ্যে নৈতিক এমন এক অবস্থান গ্রহণের শক্তি জুগিয়েছেন, যারা

সাহায্যে সমাজপ্রচলিত রীতি ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণে সক্ষম হয়েছে সে। সামাজিক অনুশাসনকে অস্বীকার করার স্পর্ধা আছে বলেই ইন্দ্রনাথ জাতপাতের তোয়াক্কা না করে সদ্যমৃত যুবকের দেহ নৌকায় তুলে নিতে পারে। সমাজ পরিত্যক্ত অন্নদাকে সাহায্য করতে পারে দ্বিধাহীনভাবে। ইউরোপীয় শিক্ষা তথা যুক্তির ধাঁচার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগই হয়নি যে অভিযান নায়কের, প্রচলিত সামাজিক নিয়মনীতিকে অস্বীকার করার এই স্পর্ধা সে পেল কীভাবে? বাংলা অভিযান নায়করা অধিকাংশই ইউরোপীয় যুক্তির আদলেই পাকাপোক্তভাবে গঠিত হয়েও এই নৈতিক উদারতা লাভ করতে পারেনি। সে কথায় আমরা পরে আসব। শ্রীকান্ত বলবে, ইন্দ্রনাথ এই শক্তি পেয়েছে তার অকপট হৃদয়ের শুদ্ধতার মাধ্যমে। তিনি বলবেন,

> কপটতা ইন্দ্রের মধ্যে ছিলই না। উদ্দেশ্যকে গোপন রাখিয়া কোন কাজ সে করিতেই জানিত না। সেই জন্যই বোধ করি তাহার সেই হৃদয়ের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সত্য কোন অজ্ঞাত নিয়মের বশে সেই বিশ্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিখিল সত্যের দেখা পাইয়া, অনায়াসে অতি সহজেই তাহাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত! তাহার শুদ্ধ সরল বুদ্ধি পাকা ওস্তাদের উমেদারী না করিয়াই ঠিক ব্যাপারটি টের পাইত।[৪৩]

সমাজ অনুশাসনকে হেলায় উড়িয়ে দেওয়ার এই মানসিকতা ইন্দ্রনাথের সাহসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে অভিযান নায়ক হিসেবে অনন্য করেছে। ইন্দ্রনাথ আরেক স্থানেও অভিযান নায়ক হিসেবে বিশেষত্বের পরিচয় রাখে। আমরা বাংলা অভিযান নায়কদের অভিযানকে উদ্দেশ্যমুখী ও বিনিময় প্রত্যাশী হিসেবেই দেখতে পাব। বিশেষ কোনো লক্ষ্য পূরণের জন্যই তাদের অভিযান। সেই উদ্দেশ্য কীভাবে ইউরোপীয় অভিযানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তা

আমরা পরে আলোচনা করব। ইন্দ্রনাথের অভিযান কিন্তু বিনিময় প্রত্যাশী নয়, অভিযান সে লক্ষ্যপূরণের জন্য করে না। ডোয়েন ফার্মার কথিত 'risk for its own shake'[৪৪] বা বিপদের জন্যই বিপদগ্রহণ করার ধরনটি তার কাজকর্মের মধ্যে ফুটে ওঠে। তাই তাকে সাপের উপদ্রবের জন্য কুখ্যাত গোঁসাইবাগানের ঘন জঙ্গল দিয়ে মধ্যরাতে বাঁশী বাজাতে বাজাতে যেতে দেখা যায়। ভয়ঙ্কর নদীবক্ষে মাছ চুরির জন্য প্রাণ হাতে করে সে অভিযান করে। এই অভিযানের পিছনে অর্থ উপার্জন ও অন্নদাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য থাকলেও, সে উদ্দেশ্য অভিযানের উপলক্ষ্যই কেবল। নয়তো অন্নদাকে সাহায্য করার অন্য যে কোনো পন্থা ইন্দ্রনাথ বার করতে পারত, সবচেয়ে বিপজ্জনক রাস্তাটিই বেছে নিত না। বিপদগ্রহণ করতে ভালোবাসে বলেই ইন্দ্রনাথ অভিযান করে।

ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যহীন অভিযানের নেশা, তার সমাজের বিধিনিষেধ সম্পর্কে বেপরোয়া মনোভাব, উনিশ শতকের ইউরোপীয় অভিযান কাঠামোর ধরন থেকে তাকে আলাদা করে রাখে। এই বেপরোয়া অভিযান নায়ককে পরিণতি দান করার মতো প্রেক্ষাপট কি ইন্দ্রনাথের সময়ে মজুত ছিল বাংলায়? ১৩২২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে যখন 'শ্রীকান্ত'র পত্রিকা প্রকাশ ঘটছে, সেইসময় শরৎচন্দ্রের বয়স ঊনচল্লিশ বছর। অমিতাভ দাস তার *শ্রীকান্ত: জীবন ও শিল্প* (১৯৯৬) গ্রন্থে, প্রমাণ করেছেন শরৎচন্দ্র ও শ্রীকান্ত সমবয়সী। তিনি জানিয়েছেন, শ্রীকান্ত যখন রেঙ্গুনে যায় তখন তার বয়স সাতাশ বছর। রেঙ্গুনে জাহাজে ওঠার আগে ভারতীয় যাত্রীদের প্লেগের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে ভারতের নানা জায়গায় প্লেগ দেখা যায়। সেই সময়েই ১৯০৩ সালে শরৎচন্দ্রও গিয়েছিলেন রেঙ্গুনে। তখন শরৎচন্দ্রের বয়সও সাতাশ বছর। শ্রীকান্তের রেঙ্গুন যাত্রাও প্রায় একই

সময়কালের মধ্যে। এই যুক্তি অনুসারে, "শ্রীকান্তই শরৎচন্দ্র কিনা— সে আলোচনার ভিতর না ঢুকেও, তাই এইটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের সমবয়সী।"[৪৫] তাহলে যে সময় শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথরা নৈশ্য অভিযানে বেরোয় সেটি কোন সময়? শ্রীকান্তের বয়ান থেকে আমরা জানতে পারি তখন তার বয়স চোদ্দ পেরিয়েছে— "তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনরয় পড়িয়াছি— আমাকে কাপুরুষ?"[৪৬] অর্থাৎ সেই সময়কালটি ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের আশেপাশে। উনিশ শতকের শেষদিকে সাধারণ বাঙালির দিন যাপনের চৌহদ্দিতে বৃহত্তর অভিযানে বেরিয়ে পড়া বিনিময় প্রত্যাশাহীন, বেপরোয়া, ইউরোপীয় ধাঁচার শিক্ষায় অসংস্কৃত অ্যাডভেঞ্চারিস্টের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই আকস্মিককভাবেই ইন্দ্রনাথ চরিত্র হারিয়ে যায় উপন্যাস থেকে। শ্রীকান্তও আর কখনো তার খোঁজ পায়নি। আসলে ইন্দ্রনাথের মতো উদারমনা, ইউরোপীয় যুক্তিশৃঙ্খলার সঙ্গে অপরিচিত কিশোর অ্যাডভেঞ্চারিস্ট চরিত্রকে ধারণ করার মতো প্রেক্ষাপট উনিশ শতকের শেষের বাংলায় গড়ে ওঠেনি। অভিযান কাহিনি ও অভিযান নায়কদের নিয়ে বাংলা সাহিত্যে নানান পরীক্ষা-নীরিক্ষাও শুরু হবে 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব রচনার প্রায় এক দশক পরে।

ইন্দ্রনাথ চরিত্রটির ইংরাজি শিক্ষা কিংবা ইউরোপীয় ধ্যানধারণাকে গ্রহণ করার মতো পরিসর না থাকলেও, এই চরিত্রটির পরিকল্পনা একেবারেই বিদেশী ছাপমুক্ত বলে মনে হয় না। শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথের যৌথ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অনেকক্ষেত্রে মার্ক টোয়েনের (১৮৩৫–১৯১০) 'অ্যাডভেঞ্চার অফ টম সয়ার'(১৮৭৬) উপন্যাসের প্রভাব চোখে পড়ে। অভিযানের ক্ষেত্রে শ্রীকান্ত যেন টম সয়ার, ও ইন্দ্রনাথ যেন তার ডানপিটে বন্ধু হাকেলবেরি ফিন। টম সয়ার ও হাকেলবেরি ফিনের চরিত্রদুটির প্রভাব কিশোর শ্রীকান্ত ও কিশোর ইন্দ্রনাথের চরিত্রে ভালোভাবেই পড়েছে। কৈশোর পেরোনোর পর শ্রীকান্ত নারী-প্রেম-সমাজের যে জটিল

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, সে প্রসঙ্গ অবশ্য আলাদা। কেবল শ্রীকান্ত-ইন্দ্রনাথের কৈশোর অ্যাডভেঞ্চার টম সয়ার–হাকেলবেরি ফিনের অ্যাডভেঞ্চারকে স্মরণ করায়।

অভিযানের প্রবণতা মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্যের আখ্যান কাঠামো এবং উনিশ শতক থেকে আধুনিক ভ্রমণ সাহিত্য ও উপন্যাসের মাধ্যমে তথাকথিত বড়োদের সাহিত্যে দেখা গেলেও অভিযান সাহিত্য একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যবর্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে শিশু-কিশোরদের জন্য লিখিত সাহিত্যেই। *মুকুল* পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০২ দ্বিতীয় সংখ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭–১৯১৯) বলেছিলেন, চার-পাঁচ বছরের শিশু বলতে যা বোঝায়, তাদের জন্য কোন সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়। তাই শিশুর সীমা তিনি আট-নয় বছর থেকে পনেরো-ষোলো বছর অবধি প্রসারিত করেন।[৪৭] এখানে সাহিত্য বলতে অবশ্য লিখিত সাহিত্যই বোঝানো হয়েছে। মৌখিক ছড়া বা গল্প নয়। লীলা মজুমদার(১৯০৮-২০০৭) বলেছেন,

> যদিও শিশুদের জন্য আর কিশোরদের জন্য দু'রকম বই লেখা হয়, সুবিধার জন্য আমরা শিশুসাহিত্য বলতে ৫-১৬ পর্যন্ত সব পাঠকের কথাই মনে করি। তবে বইগুলিকে দুটি ভাগ করলে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ বইয়ের রস উপভোগ করতে হলে অন্তত ১০-১২ বছর বয়স হওয়া চাই। খুব ছোটদের জন্য বেশি বই আজকাল বেরোয় না।[৪৮]

আট-নয় বছর থেকে পনেরো-ষোলো বছরের বয়সকালকে আমরা একযোগে শৈশব-কৈশোর বলতে পারি। এই বয়সের জন্য রচিত সাহিত্যকে আমরা তাই শিশু-কিশোর সাহিত্য বলব।

শিশুদের জন্য মৌখিক ছড়া, গান, রূপকথার প্রচলন আগে থেকেই বাংলায় থাকলেও কিংবা খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে জাতকের গল্প, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পঞ্চতন্ত্রের গল্প শিশুদের জন্য কাহিনির জোগান দিলেও উনিশ শতক থেকেই শিশুদের জন্য

সাহিত্যের চর্চা শুরু হয় ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। প্রকাশিত হতে থাকা নানা পত্রিকাও। জন মার্শম্যানের (১৭৯৪–১৮৬১) সম্পাদনায় ১৮১৮ সালে *দিগদর্শন* পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে এই চর্চার সূত্রপাত বলা যায়। ছোটদের জন্য ভূগোল, কৃষিকথা, প্রাণীবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং ইতিহাসের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। কেশব চন্দ্র সেনের (১৮৩৮–১৮৮৪) *বালকবন্ধু* প্রকাশিত হতে থাকে ১৮৭৮ সাল থেকে। নীতিশিক্ষা দানের উদ্যোগ সেখানে ছিল স্পষ্ট। এরপর *বালক হিতৈষী* (নভেম্বর, ১৮৮১), *আর্যকাহিনী* (নভেম্বর, ১৮৮১), *বালিকা* (আগস্ট, ১৮৮৩) একের পর এক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৮৫ সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর (১৮৫০–১৯৪১) সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে *বালক* পত্রিকা। রচনার অসাধারণ বৈচিত্র্য সহ *সখা* (১৮৮৩) প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে প্রমদাচরণ সেনের (১৮৬৯–১৮৯০) সম্পাদনায়। *সাথী* পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে ১৮৯৩ সালের ১ মে থেকে। পরে সখা ও সাথী' (১৮৯৪) নামে পত্রিকা দুটি একত্রিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী *মুকুল* পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন ১৮৯৫ সাল থেকে।

উনিশ শতকের শিশু সাহিত্যকে *বাংলা শিশু-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ* (১৯৫৯) গ্রন্থে আশা গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২৫–১৯৮৭) তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তার মতে, *দিগদর্শন* থেকে পরবর্তী চল্লিশ বছর শিশুদের জন্য যা লেখা হয়েছে তা মূলত বিদ্যালয়ের দিকে নজর রেখে, শিক্ষা দান করার জন্য। ১৮৫১ সালে বঙ্গীয় অনুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার শিশু সাহিত্য যুক্ত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে। আর ১৮৭৮ সাল থেকে *বালকবন্ধু* প্রকাশের পর থেকে স্বাধীন ও উৎকৃষ্ট শিশু সাহিত্য রচিত হতে থেকেছে।[৪৯] এরপর বিশ শতকে এসে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য হয়ে উঠবে সত্যিই বিচিত্রপথগামী। ১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (১৮৬৩–

১৯১৫) সম্পাদনায় প্রকাশিত হবে *সন্দেশ* পত্রিকা। বিজ্ঞানের নব্য আবিষ্কৃত নানান তথ্য, দেশ-বিদেশের নানা খবর পরিবেশনের মাধ্যমে সমসাময়িকতাকে স্থান দিয়ে *সন্দেশ* পত্রিকা আগের সমস্ত পত্রিকার থেকে আলাদা হয়ে ওঠে। *সন্দেশ* পরবর্তী পত্রিকাগুলিও তারপর থেকে সমসাময়িক সময়ের চিহ্নকে ধারণ করতে থাকে নানা রচনায়। *মৌচাক* (১৯২০), *শিশু সাথী* (১৯২২), *রামধনু* (১৯২৭), *মাস পয়লা* (১৯২৯) প্রকাশিত হতে থাকে। নবেন্দু সেন জানাচ্ছেন, *সন্দেশ* পূর্ববর্তী পত্রিকাগুলিতে সমকালীন যুগের পটভূমি ধর্মীয় বোধ ছাড়া তেমন স্পষ্ট নয়। তার মতে, *সন্দেশ* পত্রিকাই প্রথম ধর্মবোধের ওপরে উঠে গিয়ে শৈশবের মুক্ত সুখ আর মজা সৃষ্টি করেছিল।[৫০] তবে *সন্দেশ* পত্রিকাও বিশুদ্ধ জ্ঞান ও আনন্দের সীমা অতিক্রম করে সমকালীন সমাজজীবনের বাস্তবতার সঙ্গে শিশুদের যোগ তৈরি করেনি। তা করেছে *মৌচাক, রামধনু, মাস পয়লা*-এর মতো *সন্দেশ* পরবর্তী পত্রিকাগুলো। তার কারণটিও নবেন্দু সেন ব্যাখ্যা করেছেন—

> বিশ্বযুদ্ধের বিষক্রিয়ায় ভারত জুড়ে মানুষের কষ্ট আরো তীব্রতর হল পঁচিশ বছরের মধ্যে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অবিমৃষ্যকারিতা, ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টির জন্ম (১৯২৫) পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাগরণ, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ভেঙে পড়া অর্থনীতি শিশু সাহিত্যের লেখক-লেখিকাদের আর কেবল উদ্ভট কল্পনার মায়াময় জগতে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে রাখতে পারল না। সে অবস্থার চূড়ান্ত রূপ এল মন্বন্তরের ভয়াবহতায়। সঙ্গে আবার বিশ্বযুদ্ধ।[৫১]

বিশ্বযুদ্ধ ও উপনিবেশ-ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই গড়ে তুলল শিশু সাহিত্যের নতুন আঙ্গিক। শিশু সাহিত্যে অভিযান ভাবনার সূত্রপাতও হল সেখান

থেকে। এর আগে কিছু কিছু শিশু সাহিত্যে দেখা গিয়েছে অভিযান প্রবণতা, কিন্তু সেগুলি সবই অনুবাদমূলক। আনুমানিক ১৮৫২-৫৩ সালে 'ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটির উদ্যোগে ড্যানিয়েল ডিফো (১৬৬০-১৭৩১) রচিত 'রবিনসন ক্রুশো' (১৭১৯) উপন্যাসটির অনুবাদ করা হয় 'রবিনসন ক্রুসোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' নামে। তবে এই অনুবাদ কিছুটা মূল থেকে সরে আসে। সাংস্কৃতিক দূরত্বের ফলে যাতে পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য রবিনসন ক্রুশোকে করে তোলা হয় কলকাতাবাসী আর্মেনীয় বণিক। চতুর্থ সংস্করণে পৌঁছে তবে রবিনসন ক্রুশোকে প্রকৃত নাম-পরিচয়ে হাজির করা হয়। কুলদা রঞ্জন রায় (১৮৭৮-১৯৫০) ১৯১৪ সালে হাওয়ার্ড পাইলের (১৮৫৩-১৯১১) 'দ্য মেরি অ্যাডভেঞ্চার অফ রবিন হুড অফ গ্রেট রিনাউন নটিংহামশায়ার' (১৮৮৩) উপন্যাসটি অনুবাদ করেন 'রবিন হুড' নাম দিয়ে। এছাড়া জুল ভের্নের (১৮২৮-১৯০৫) অভিযান-আশ্রিত কল্পবিজ্ঞান কাহিনির কিছু কিছু অনুবাদ করেন তিনি।

মৌচাক পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) রচিত 'বুড়ো আংলা' প্রকাশিত হতে আরম্ভ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই অর্থাৎ ১৯২০ সালে। হাঁসের দলের সঙ্গে বুড়ো আঙুলের মতো ছোট হয়ে যাওয়া হৃদয়ের অভিযান, বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করায়। নবেন্দু সেন দেখিয়েছেন, 'বুড়ো আংলা' আসলে সেলমা লাগেরলফের (১৮৫৮-১৯৪০) *দ্য ওয়াণ্ডারফুল অ্যাডভেঞ্চার অফ নীল* (১৯০৬) গ্রন্থের দ্বারা প্রেরণাপ্রাপ্ত হয়ে রচিত।[৫২] ফলে মৌলিক অভিযান উপন্যাস হিসাবে এটিকে দাবি করা যায় না। অবনীন্দ্রনাথের 'খাতাঞ্চির খাতা'(১৯২১) কাহিনিটিও যেমন ম্যাথিউ ব্যারির (১৮৬০-১৯০৭) 'পিটার প্যান' (১৯০৪) রচনার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে মিলে যায়। এই সাদৃশ্যগুলিকে প্রকট করে দেখিয়েছেন নবেন্দু

সেন।[৫৩] এছাড়া *সখা ও সাথী*-র সম্পাদক ভুবন মোহন রায় 'সুন্দরবনে সাত বৎসর' নামের একটি উপন্যাস উনিশ শতকের শেষ দিকে লিখতে শুরু করলেও সমাপ্ত করেননি। পরে বিশ শতকের তিনের দশকে যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬–১৯৩৭) এই উপন্যাসটি শেষ করার চেষ্টা করেন এবং অবশেষে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪–১৯৫০) উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৯৬–১৯৭৮) জানাচ্ছেন, "তবে কাহিনিটি পুরোপুরি অ্যাডভেঞ্চার নয় এবং ঘটনাটি অনেক পরের।"[৫৪]

অভিযানকেই কেন্দ্রীয় বিষয় করে নিয়ে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয় *মৌচাক* পত্রিকাতেই। হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮১–১৯৬৩) ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে 'যকের ধন' প্রকাশিত হতে শুরু করে *মৌচাক* পত্রিকায়। আশা গঙ্গোপাধ্যায় বলবেন, "১৩৩০ সাল হইতে তাঁহার মৌলিক রোমাঞ্চকর উপন্যাস 'যকের ধন' ধারাবাহিক ভাবে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া শিশু-সাহিত্যের একটি নবীন প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিল।"[৫৫] এই নবীন প্রবাহই সাহিত্যের নতুন বর্গ— অ্যাডভেঞ্চার তথা অভিযান সাহিত্য। খগেন্দ্রনাথ মিত্রও প্রথম অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির রচয়িতা হিসেবে হেমেন্দ্রকুমার রায়কেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৫৬] এরপর নানা লেখকের রচনায় অজস্র অভিযান কাহিনি রচনা হতে থাকবে। স্থানিক সরণ, অভিজ্ঞতা অর্জন, বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা, আবিষ্কার ও অভিযান নায়ক— আবশ্যিক এই উপাদানগুলির সার্বিক উপস্থিতি নিয়ে সৃষ্ট হতে থাকা একের পর এক অভিযান কাহিনি, সাহিত্যের এক নতুন বর্গ হয়ে উঠবে বাংলায়।

নির্দেশিকা ও টীকা –

১. Adventure fiction has been around since the first primitive man or woman began spinning wild tales about the exciting things that happened to then during the day, probably to explain why the hunter returned empty handed or the gatherer harvested less than the usual volume of berries and roots., — D'Ammassa, Don, 'Introduction', *Encyclopedia of Adventure Fiction*, Facts On File, New York, 2009, page no. vii

২. Arnould, Jaques, 'MAN TRANCENDS MAN', Arnoulad, Jaques, and Venayre, Sylvain, *THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF ADVENTURE*, **https://www.publicbooks.org/the-history-and-philosophy-of-adventure/**, 3rd January 2015, last seen 29 June, 2022

৩. Farmer, Doyen, *The evolution of adventure in literature and life*, https://www.santafe.edu/~jdf/papers/adventure4.pdf, page no. 3, last seen 29 June, 2022

৪. ঐ

৫. ঐ

৬. Arnould, Jaques, 'MAN TRANCENDS MAN', Arnoulad, Jaques, and Venayre, Sylvain, *THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF ADVENTURE*, **https://www.publicbooks.org/the-history-and-philosophy-of-adventure/**, 3rd January 2015, last seen 29 June, 2022

৭. Venayre Sylvain, 'THE FASCINATION WITH THE IMPOSSIBLE', Arnoulad, Jaques, and Venayre, Sylvain, *THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF ADVENTURE*, **https://www.publicbooks.org/the-history-and-philosophy-of-adventure/**, 3rd January 2015, last seen 29 June, 2022

৮. ঐ

৯. ঐ

১০. "The singularity of the 19th century was to transpose such narratives onto the reality of the world." -- Venayre Sylvain, 'THE FASCINATION WITH THE IMPOSSIBLE', Arnoulad, Jaques, and Venayre, Sylvain, *THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF ADVENTURE*, **https://www.publicbooks.org/the-history-and-philosophy-of-adventure/**, 3rd January 2015, last seen 29 June, 2022

১১. Venayre Sylvain, 'THE FASCINATION WITH THE IMPOSSIBLE', Arnoulad, Jaques, and Venayre, Sylvain, *THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF ADVENTURE*, **https://www.publicbooks.org/the-history-and-philosophy-of-adventure/**, 3rd January 2015, last seen 29 June, 2022

১২. Albert Edward, *History of English Literature*, OXFORD UNIVERSITY PRESS, Fifth Edition, New York, 2003, page no. 367

১৩. ঐ

১৪. Venayre Sylvain, 'THE FASCINATION WITH THE IMPOSSIBLE', Arnoulad, Jaques, and Venayre, Sylvain, *THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF ADVENTURE*, **https://www.publicbooks.org/the-history-and-philosophy-of-adventure/**, 3rd January 2015, last seen 29 June, 2022

১৫. Farmer, Doyen, *The evolution of adventure in literature and life*, https://www.santafe.edu/~jdf/papers/adventure4.pdf, page: 3, last seen 29 June, 2022

১৬. ঐ

১৭. Cawelti, John G., *Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1976, page no. 39

১৮. ভট্টাচার্য, সুভাষ (সম্পা.), *সংসদ বাংলা অভিধান*, পঞ্চম সংস্করণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-৫০

১৯. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সম্পা.), *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দি ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৩৭, পৃ-১১৫

২০. Cawelti, John G., *Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1976, page no. 40

২১. "though there are also all kinds of subsidiary triumphs available depending on the particular cultural materials employed: the triumph over injustice and the threat of lawlessness in the western; the saving of the nation in the spy story; the overcoming of fear and the defeat of the enemy in the combat story."—Cawelti, John G., *Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1976, page no. 40

২২. "Some of the most popular writers of this type have managed to combine the superhero with a certain degree of sophistication as in the James Bond adventures of Ian Fleming."—Cawelti, John G., *Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1976, page no. 40

২৩. D'Ammassa, Don, 'Introduction', *Encyclopedia of Adventure Fiction*, Facts On File, New York, 2009, page: vii

২৪. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, 'কলাবতী রাজকন্যা', *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, দ্রষ্টব্য পৃ-২৯-৫২

২৫. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, 'ডালিম কুমার', *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, দ্রষ্টব্য পৃ-৩৭-৪৭

২৬. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, 'পাতাল-কন্যা মণিমালা', *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, দ্রষ্টব্য পৃ-১৪৮-১৫৮

২৭. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, 'নীলকমল আর লালকমল', *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, দ্রষ্টব্য পৃ-১১৯-১৩৮

২৮. Cawelti, John G., *Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1976, page no. 39

২৯. মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, 'ভূমিকা', *ঠাকুরমা'র ঝুলি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, দ্রষ্টব্য পৃ-১০

৩০. চৌধুরী, দুলাল এবং সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পাদকমন্ডলী), *লোক সংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় সংযোজন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ- ৬৩

৩১. মৌলিক ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পা.), *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা,* প্রথম খণ্ড, ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৩৯, দ্রষ্টব্য পৃ-৯-৮৭

৩২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* দ্বাদশ সংস্করণ, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০, দ্রষ্টব্য পৃ- ২২৩-২২৬

৩৩. ঐ, দ্রষ্টব্য পৃ- ৩৬৯-৩৭৩

৩৪. ঐ, দ্রষ্টব্য পৃ- ৫৩৭-৫৫২

৩৫. ঐ, দ্রষ্টব্য পৃ- ৬৯২-৬৯৩

৩৬. ঐ, দ্রষ্টব্য পৃ- ৭৫০-৭৫২

৩৭. ঐ, দ্রষ্টব্য পৃ- ৭৫২

৩৮. ঐ, দ্রষ্টব্য পৃ- ৭৮০

৩৯. ঐ, দ্রষ্টব্য পৃ- ৭৮০-৭৮১

৪০. ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকমল, '*রচনা-সংগ্রহ*', সুবর্ণরেখা, ১৯৯৬, কলকাতা, পৃ-৬

৪১. "The crucial defining characteristic of romance is not that it stars a female but that its organizing action is the development of a love relationship, usually between a man and a woman. Because this is the central line of development, the romance differs from the adventure story and the mystery. Adventure stories, more often than not, contain a love interest, but one distinctly subsidiary to the hero's triumph over dangers and obstacles. One might put it that in the adventure story the relation between hero and villain is really more important than the hero's involvement with a woman. Romances often contain elements of adventure, but the dangers function as a means of challenging and then cementing the love relationship."—Cawelti, John G., *Adventure, Mystery and Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1976, page no. 41

৪২. "এর চার পর্বের চারটি উপকাহিনির থিসিস, অ্যান্টিথিসিসের আন্দোলন থেকে যে সিন্থেসিস জেগে উঠবে দ্বীপভূমির মতো— তাই রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর কাহিনি। তাদের জটিল ও অস্থির দ্বিধা ও তাকে অতিক্রমণের যে ছবি আমরা দেখব, তার পিছনে আছে অন্নদা-অভয়া-সুনন্দা-কমললতার জীবন-অভিজ্ঞতা, কোনো না কোনো ভাবে।"—দাস, অমিতাভ, *শ্রীকান্ত: শিল্প ও জীবন*, রূপা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ-৯০

৪৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎ, *শরৎ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, শরৎ সমিতি, কলকাতা, কার্তিক ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ-১৬

88. Farmer, Doyen, *The evolution of adventure in literature and life*, https://www.santafe.edu/~jdf/papers/adventure4.pdf, page no. 4, last seen 29 June, 2022

৪৫. দাস, অমিতাভ, *শ্রীকান্ত: শিল্প ও জীবন*, রূপা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ-২৩

৪৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎ, *শরৎ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, শরৎ সমিতি, কলকাতা, কার্তিক ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ-৮

৪৭. সেন, নবেন্দু, *বাংলা শিশু সাহিত্য তথ্য, তত্ত্ব, রূপ ও বিশ্লেষণ*, পুথিপত্র, কলকাতা, ২০০০, পৃ- ১৮

৪৮. মজুমদার, লীলা, 'ছোটদের জন্য বই', বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (সম্পা.), *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, প্রথম সংস্করণ, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ-২৪২

৪৯. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা, *বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)*, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ-২৭২-২৭৩

৫০. সেন, নবেন্দু, *বাংলা শিশু সাহিত্য তথ্য, তত্ত্ব, রূপ ও বিশ্লেষণ*, পুথিপত্র, কলকাতা, ২০০০, পৃ-৩১

৫১. ঐ

৫২. ঐ, পৃ-৮৭

৫৩. ঐ, পৃ-৮০

৫৪. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, *শতাব্দীর শিশু সাহিত্য (১৮১৮-১৯৬০)*, আকাদেমি সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ-১৬৪

৫৫. গঙ্গোপাধ্যায়, আশা, *বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)*, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ-২৮১

৫৬. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, *শতাব্দীর শিশু সাহিত্য (১৮১৮-১৯৬০)*, আকাদেমি সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ-১৬৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনিবেশের অভিজ্ঞতা, দুই বিশ্বযুদ্ধ এবং অভিযান উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

১৯২৪ সালে *মৌচাক* পত্রিকায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যকের ধন' উপন্যাস প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে সংরূপগতভাবে অভিযান কাহিনি নির্মাণের সূচনা হয়। সেই অর্থে আমরা হেমেন্দ্রকুমার রায়কে অভিযান কাহিনির পথিকৃৎ বলতে পারি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতে, যে সময় হেমেন্দ্রকুমার রায় ছোটদের জন্য কলম ধরছেন সেইসময়কে বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা চলে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারদের (১৮৭৭-১৯৫৬) হাত ধরে, সর্বোপরি *সন্দেশ* পত্রিকা তথা সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) লেখার মাধ্যমে ছোটদের সাহিত্যে যুগান্তর এসে গিয়েছে; তবু প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিমত, "এর মধ্যে অভাব ছিল শুধু এক জাতের লেখার। সে লেখা হল অজানার টানে আর দুঃসাধ্য সাধনের উৎসাহে ছোটদের মনে বিপদ বাধার সঙ্গে যোঝার একটা দুঃসাহসিকতার নেশা ধরিয়ে দেবার।"[১] তাঁর মতে এই অভাবের কথা মনে রেখেই রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) বাংলা সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার গল্পের প্রয়োজন আছে বলেছিলেন। "সেই অভাব পূরণ করার প্রথম সার্থক চেষ্টা হেমেন্দ্রকুমারের কলমেই হল।"[২] এই অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় সাহিত্যের প্রয়োজন বাংলায় কেন অনুভূত হচ্ছিল তা আমাদের বুঝে রাখা দরকার। বুঝে নেওয়া দরকার তার সাথে উপনিবেশের চেতনা ও বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে কীভাবে।

ইউরোপে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা আর বিকাশের সূত্র ধরে অনুভূত হয়েছিল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ আর উপনিবেশ স্থাপনের চাহিদা। আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া জুড়ে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রথ ছুটেছিল নতুন উপনিবেশের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদকে লুঠ করতে। আর সেই রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যেতে থেকেছিল শাসিত অজস্র জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি-রীতি-রেওয়াজ। এই

সর্বগ্রাসী হিংস্রতা পুঁজির স্বার্থে চালিত হলেও তাতে মোড়ক লাগানো হয়েছিল। গ্রস্ত উপনিবেশের বাসিন্দাদের আদতে ভালো করার জন্যই তাদের শিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে 'সভ্যতা'র সারবস্তু— এই তকমাটুকু এঁটে দেওয়া ছিল সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের গায়ে। বণিকের মানদন্ড নিয়ে যারা ইউরোপ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল পৃথিবীর নানা প্রান্তে, মানদন্ডের আড়ালে অস্ত্রকে লুকিয়ে রাখতে তারা ভোলেনি। সেই অস্ত্রের প্রয়োগ যে আসলে উপনিবেশের 'অশিক্ষিত' 'বর্বর' মানুষদেরই উন্নতিকল্পে এই প্রচ্ছদ ইউরোপীয় সমাজে তাদের সাম্রাজ্যলোলুপ হিংস্রতাকে স্বীকৃতি দিতে কার্যকরী হয়েছিল।

এই স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা করতে এবং ইউরোপীয় কিশোর-যুবাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে, নতুন দেশের খোঁজে বিপদবরণ করে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ যোগাতে রচিত হয়েছে অজস্র বীরত্বব্যঞ্জক সাহিত্য। ড্যানিয়াল ডিফোর (১৬৬০—১৭৩১) *রবিনসন ক্রুশো* (১৭১৯) কিংবা জনাথন সুইফটের (১৬৬৭-১৭৪৫) *গালিভারস ট্রাভেলস* (১৭২৬) আঠারো শতকের গোড়ার দিকে রচিত হয়। উপনিবেশ খোঁজা কিংবা বাণিজ্যের স্বার্থে নতুন দেশে অভিযান সেই সময় থেকেই অন্যতম বিষয় হয়ে উঠতে থাকে ইউরোপীয় সাহিত্যে। এরপর উনিশ শতকে এসে ইউরোপে বিশেষত ইংল্যান্ডে এই ধরনের অভিযান কাহিনির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উইলিয়াম হেনরি কিংসটনের (১৮১৪—১৮৮০) *ব্লু জ্যাকেটস: অর চিপস অভ দি ওল্ড ব্লক* (১৮৫৪), জর্জ অ্যালফ্রেড হেনটির (১৮৩২—১৯০২) *বাই কনডাক্ট অ্যান্ড কারেজ: এ স্টোরি অভ দি ডেজ অভ নেলসন* (১৯০৪), *উইথ ক্লাইভ ইন ইন্ডিয়া* (১৮৮৪), *অ্যাট দি পয়েন্ট অভ দি বেয়নেট: এ টেল অফ দি মারাঠা ওয়ার* (১৯০১)-এর মতো উপন্যাসগুলিতে উপনিবেশ সম্প্রসারণ, অন্যতর ভূখণ্ডে নিজেদের সংস্কৃতির আধিপত্য স্থাপন যে কতোটা প্রয়োজনীয়,

কেবল ইংরেজদের স্বার্থেই নয়, উপনিবেশের প্রজাদের স্বার্থেও, তা দমক-চমক লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদ তথা উপনিবেশ সম্প্রসারণের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের এই যে যোগ, তা তো ঔপনিবেশিক ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরাধীন বাংলায় তবে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির প্রয়োজনীয়তা ঘনীভূত হয়ে উঠল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শিক্ষানীতির স্বরূপ ও বিশ শতকের বাংলার আর্থ-রাজনৈতিক চালচিত্রের দিকে ফিরে তাকাতে হবে।

ঔপনিবেশিক শিক্ষা:

ভারতীয় উপনিবেশের প্রজাদের কোন পথে শিক্ষিত করে তোলা যায় তাই নিয়ে প্রাচ্যবাদী (orientalist) ও পাশ্চাত্যবাদী(anglicist)-দের মধ্যে যে বিরোধ চলেছিল তাতে প্রাথমিকভাবে প্রাচ্যবাদী হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬—১৮৬০), জনাথন ডানকান (১৭৫৬—১৮১১) প্রমুখ প্রাচ্য শিক্ষায় ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তুলতে আগ্রহী হলেও, এমনকি সেই উদ্দেশ্যে কলকাতা মাদ্রাসা কিংবা বেনারস সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলেও, শেষ অবধি প্রাচ্য শিক্ষানীতি পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল। তারা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন সংস্কৃত কলেজ স্থাপন তথা প্রাচ্য শিক্ষায় বিনিয়োগের মাধ্যমে হিন্দুদের কাছে ব্রিটিশদের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হবে, বিদেশী সরকারের প্রতি তাদের আস্থা ও আনুগত্য বাড়বে, সম্ভব হবে হিন্দু আইনে পারদর্শী অথচ ব্রিটিশ সরকারের সহযোগী কর্মচারী নির্মাণ। সেই মর্মে ভারতবর্ষে মিশনারিদের কার্যকলাপও স্থগিত থাকা প্রয়োজন বলে জানিয়েছিলেন তারা, যাতে ধর্মনাশের আশঙ্কায় ভারতীয়রা ব্রিটিশদের প্রতি বিমুখ না হয়ে যায়। বেশিদিন তবু সেই প্রচেষ্টা কায়েম থাকতে পারেনি।

১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে সময়ে, ইংল্যান্ডের সংসদে তখনই উইলিয়াম উইলবারফোর্স (১৭৫৯—১৮৩৩) প্রস্তাব এনেছিলেন, ভারতে মিশনারি ক্রিয়াকলাপের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের এবং ইংল্যান্ড থেকে ভারতে স্কুল শিক্ষক পাঠানোর। এ প্রস্তাব সেইসময় খারিজ হয়ে গেলেও ১৮১৩ সালে উইলবারফোর্স, চার্লস গ্রান্ট (১৭৪৬—১৮২৩) প্রমুখের মাধ্যমে এই পাশ্চাত্যমুখী ধারণাই জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। ইতিমধ্যে আঠারো শতকের শেষ দশকে ইউরোপে ইভ্যাঞ্জেলিক খ্রিস্টানদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ইভ্যাঞ্জেলিকদের ধারণা অনুযায়ী, মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত আসা কিংবা আনা সম্ভব যার দ্বারা তার পূর্বপরিচয় আগাগোড়া লোপাট হয়ে যেতে পারে। অবস্থান্তর (conversion)-এর মাধ্যমে তার এমন উত্তরণ সম্ভব যা পুনর্জন্মের (resurrection) সামিল। ইভ্যাঞ্জলিক বিশ্বাসে আস্থাশীল চার্লস গ্রান্ট এই ধারণাকে উপনিবেশের শিক্ষার তথা আলোকপ্রাপ্তির ধারণার সঙ্গে জুড়ে দেন। পাপ-অন্ধকার-ভ্রান্তির মধ্যে ডুবে থাকা, শ্রেয়োনীতিহীন হিন্দু ভারতীয়দের ব্রিটিশ-শিক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ইউরোপীয় শিল্প, দর্শন, সাহিত্য ও খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে, তাদের সামনে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়ে তাদের শুদ্ধিকরণ করানো সম্ভব, যুক্তির ধারা বেয়ে খ্রিস্টীয় ধ্যানধারণা ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের স্বার্থবাহী নীতিবোধ তাদের মধ্যে পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব— এই ছিল গ্রান্ট তথা ইভাঞ্জলিকদের বক্তব্য। ইউরোপীয় সংস্কৃতি-নীতিবোধ-শিক্ষা-সাহিত্য-যুক্তি ভারতবাসীদের লাগাতার সরবরাহ করার এই আগ্রহের পিছনে আসল উদ্দেশ্যটি ছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভিতটি আরও পাকা করা। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন, "ইভ্যাঞ্জেলিকদের মূল যুক্তি ছিল: ভারতের ওপর কম্পানির একচেটিয়া অধিকার বহাল রাখতে কেবল কাঁচামাল ও শ্রমের নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করলে চলবে না,

ঔপনিবেশিক অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষমতার সম্প্রসারণের প্রধান লক্ষ্য ও অবলম্বন হওয়া উচিত মানুষের চৈতন্য।"[৩]

চৈতন্যের ওপর শিকল পরানোর জন্য এরপর ঢালাও যুক্তির আয়োজন করতে থাকেন জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮—১৮৭৩), জেমস মিল (১৭৭৩—১৮৩৬), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬—১৮৭৩) প্রমুখ। তারা বোঝালেন সভ্যতার আদিম স্তরে আটকে থাকা ভারতীয়দের শিক্ষিত ও উন্নত করে তুলতে হলে ইউরোপীয় শিক্ষার ধাঁচাই হতে পারে একমাত্র অবলম্বন। কেবলমাত্র বিজ্ঞানচর্চার আধুনিক ইউরোপীয় কৌশলের ক্ষেত্রেই যে ভারতীয়রা পিছিয়ে আছে তা নয়, এমনকি তাদের সাহিত্যও ঘৃণ্য সব মূল্যবোধ, সংস্কার ও নীচতার জয়গান গেয়েছে— স্টুয়ার্ট মিলের এ বক্তব্যের সূত্র ধরে, যুক্তির পরম্পরা মেনেই টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) ভারতীয় শিক্ষায় পাশ্চাত্যবাদী ধারণাকে আরও ভরাট করে তোলেন। প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণের ভাষাটিও যে ইংরাজি হওয়া ছাড়া গতি নেই সে ব্যাপারেও সন্দেহহীন মত প্রকাশ করেন তিনি। এক্ষেত্রে ভারতীয়দের কিংবা প্রাচ্যপন্থীদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তিনি। দেহে ভারতীয় হলেও অন্তরে ইউরোপীয় রুচিবোধ সম্পন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি গড়ে তোলা যায়, তাহলে একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসন হবে প্রতিস্পর্ধীহীন অনুগতদের দ্বারা আপ্যায়িত, তেমনি ভারতবর্ষ জুড়ে দীর্ঘ বিস্তৃতি পাবে ব্রিটিশদের বাজার। ফলে শিক্ষক-ইংরেজদের ইউরোপীয় শিক্ষা প্রণালী যদি ছাত্র-ভারতীয়রা নির্দ্বিধায় মেনে চলতে থাকে তাহলে উভয়তই মঙ্গল। ফলে ইংরাজি বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্যে দীক্ষিত ভারতীয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বদ্ধ পরিকর থাকেন মেকলে। মেকলের প্রস্তাবে পূর্ণ সম্মতি জানিয়ে লর্ড বেন্টিঙ্ক(১৭৭৪-১৮৩৯) ১৮৩৫

সালের ৭ মার্চ হুকুমনামা জারি করেন সরকারি অর্থে এরপর প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কিত বইপত্র আর ছাপা হবে না। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থ ব্যয় হবে কেবল ইংরাজি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচারে।[৪]

শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই পাশ্চাত্য ধাঁচে ঢেলে সাজানো কেবলমাত্র যে ইংরেজদের কাছেই সমাদৃত হয়েছিল, তা নয়। শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮১৩–১৮৮৫), রসিককৃষ্ণ মল্লিক(১৮১০–১৮৫৮), রামগোপাল ঘোষ(১৮১৫–১৮৬৮), তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী(১৮০৬–১৮৫৭), শিবচন্দ্র দেব(১৮১১–১৮৯০), প্যারীচাঁদ মিত্র(১৮১৪–১৮৮৩), রামতনু লাহিড়ীর(১৮১৩–১৮৯৮) মতো হিন্দু কলেজ থেকে পাস করা যুবকরা মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সর্বত্র ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করতে লাগলেন। "তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, শেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ, বেদান্ত, গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।"[৫] ইংরাজি সাহিত্যকে গ্রহণ, অনুসরণ ও অনুকরণের প্রক্রিয়া চালু থাকল।

খেয়াল রাখা প্রয়োজন, ইংরাজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠা উনিশ শতকের প্রথমভাগে ঘটেছে। বাঙালির কাছে অবারিত হয়েছে ইউরোপীয় সাহিত্য। শুধু তাই নয়, সেই ইংরাজি সাহিত্যকে অনুসরণ করার প্রবণতাও গড়ে উঠেছে উনিশ শতকেই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ জুড়ে বাংলা কথাসাহিত্য ও কবিতায় বারে বারে ঘটেছে ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে কিন্তু অভিযান তথা অ্যাডভেঞ্চার বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে জায়গা করে ওঠেনি। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষা বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যকে ইংরাজি সাহিত্যের অনুগামী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও, বাংলা অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব যে পট নির্মাণ করেছিল, তার ওপরেই গড়ে উঠেছে বাংলা অভিযান সাহিত্যের কারুকাজ।

অভিযান তার যাবতীয় চরিত্রলক্ষণ নিয়ে বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে বিশ শতকে এসে। তার আগে কখনো রূপকথার গল্পে, কখনো মঙ্গলকাব্যের আখ্যান কাঠামোয়, কখনো বা ভ্রমণসাহিত্যে অভিযানের কিছু কিছু উপাদানগত মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও অভিযানের পোক্ত কাঠামো গড়ে ওঠেনি সেখানে। ঝুঁকিপূর্ণ অজানাকে জেনে নিতে দুর্গমের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার মনোভঙ্গি আয়ত্ত করার কোন তাগিদই সেভাবে অনুভব করেনি বাঙালি, যতদিন না প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা তার এতদিনের অভ্যস্ত যাপনকে ঘিরে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধজাত বিশ্ববোধই বাঙালির সামনে খুলে দিয়েছিল অভিযান সাহিত্যের দরজা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত:

ব্রিটিশ শাসিত বাঙালির কাছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী পৃথিবীর চৌহদ্দি ছিল সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ। একসময় জাভা, সুমাত্রা, সিংহলের মতো স্থানে বাঙালির বাণিজ্যতরী গিয়ে পৌঁছালেও, ক্রমে বাঙালির বিস্তৃতি হ্রাস পেতে থেকেছে। ব্রিটিশাধীন কালে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার যেটুকু পরিচয় ঘটেছে তা মূলত ইউরোপ কেন্দ্রিক। নিজেদের শাসিত এবং শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের মহিমান্বিত শাসক হিসেবে জানা ছাড়া উপায়ান্তর থাকেনি তাদের। স্থানিক ও মানসিক ঘেরাটোপে আটকা পড়া বাঙালির এক নতুন ধরনের মানসিক চলন শুরু হয় ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন ও প্রসারের

মাধ্যমে; কিন্তু ঔপনিবেশিক সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় তথা বাঙালিরা ছিল ব্রিটিশের কেরানি তৈরির কারখানার কাঁচামাল। স্বাভাবিকভাবেই বহির্বিশ্ব সম্পর্কে তাদের জানাবোঝাও ছিল ইউরোপকেন্দ্রিক। দাসত্বের শিকল শুধু মানচিত্রে নয়, মগজেও পরানো ছিল। তবু ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোলের সিলেবাসভিত্তিক চর্চা তাদের মধ্যে যুক্তিবাদের বিকাশ ঘটাতে থাকে। ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যতো ভারতবর্ষের বুকে ডালপালা বিস্তার করতে থাকে ততোই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক ভাবনাচিন্তাগুলো দোলাচলের মুখোমুখি হয়। অথচ সামাজিক বন্দোবস্তে সামন্ততান্ত্রিক যাপনপদ্ধতি থেকে বেরিয়ে পড়ার রাস্তা তখন খোলা ছিল না। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের নাছোড় বজ্রআঁটুনি তার গলায় চেপে বসে ছিল।

ধর্মীয় অনুশাসন ও যুক্তিবোধের অবধারিত দ্বন্দ্ব খোঁচা দিচ্ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রেই। চিরায়ত পাকাপোক্ত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সংশয়ের বীজ মাথাচাড়া দিচ্ছিল ক্রমশ। আগলগুলো ধীরে ধীরে নড়বড়ে হচ্ছিল। সেই নড়বড়ে আগলগুলোয় সপাটে ধাক্কা দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। কিছুটা আচমকাই বাঙালি জড়িয়ে পড়ে যুদ্ধে। বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের সৈন্যসংগ্রহের জন্য শাসকের নজর গিয়ে পড়ে উপনিবেশের শাসিত জনসংখ্যার ওপর। চন্দননগরের ফরাসি শাসকরা বাঙালিদের সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে বাঙালির প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ শুরু হয়।

১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তারিখিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯১৫ সালের ৭ মে বিমান-ডুবোজাহাজ-অস্ত্রসম্ভারে দাপুটে হয়ে ওঠা জার্মানরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিমান ও ডুবোজাহাজের যৌথ আক্রমণ চালায় ও মার্কিন জাহাজ লুসিটানিয়া ডুবিয়ে দেয়। যুদ্ধ সর্বগ্রাসী রূপ নিতে থাকে। ঐ বছরই ৩০ ডিসেম্বর ফরাসি

প্রেসিডেন্ট ম্যসিয় রেমন্ড পঁয়াকারে (১৮৬০–১৯৩৪) ঘোষণা করেন, ফরাসি-ভারতের হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান প্রজারা স্বেচ্ছাসৈন্যের পদ গ্রহণ করতে পারবে। ১৯১৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ফরাসি ভারতের গভর্ণর অ্যালফ্রেড অ্যালবার্ট মার্তিনো (১৮৫৯–১৯৪৫) প্রজাদের আহ্বান জানিয়ে আজ্ঞাপত্র প্রচার করেন। ক্রমশ কিছু কিছু বাঙালি সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে। মতিলাল রায় (১৮৮৩–১৯৫৯) *প্রবাসী* পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ সংখ্যায় লিখছেন, “তখন ভাবি নাই এই অপূর্ব ব্যাপারে কোনো বাঙালি যোগদান করিবে, এই ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঙালি বহুদিনের জড়তা মুক্ত হইয়া জগতে বীর নামে সুপরিচিত হইবে।”[৬] ক্রমে পঁচাত্তর জন শিক্ষিত যুবক সেনাদলে যোগ দিতে চেয়ে আবেদন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে বাঙালির পা পড়ে।

শুরুটা ফরাসি সরকারের মাধ্যমে হলেও স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে বাঙালির যুদ্ধে অন্তর্ভুক্তির বেশির ভাগটাই ঘটে ইংরেজদের মাধ্যমে। যুদ্ধে যোগ দিতে উৎসাহিত করার জন্য চলে ঢালাও আয়োজন। সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে লাগাতার বিজ্ঞাপন বেরোতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে, যুদ্ধে যোগদানকারী প্রত্যেক বাঙালি পঞ্চাশ টাকা করে পাবে। ভর্তির সময় ১০ টাকা, এবং করাচিতে গিয়ে বাকি ৪০ টাকা। পেনসন-পুরস্কার-খোরাক-পোশাকের প্রলোভনও দেখানো হয়। জানানো হয় সৈন্যদলের বিভিন্ন পদাধিকারীদের মাইনে ১১ টাকা থেকে ১৩৭ টাকা পর্যন্ত হবে। সরকারী কর্মচারীদেরও উৎসাহিত করা হয়। বিজ্ঞাপিত অর্থের মূল্য ভারতীয়দের কাছে ছিল লোভনীয়, আর ব্রিটিশদের কাছে সস্তায় সেনা জোটানোর মোক্ষম দাওয়াই।

ভারতীয় ছাত্রদেরও যুদ্ধে যোগদানে উৎসাহিত করতে ব্যবস্থা নেয় ব্রিটিশ সরকার। হিন্দু পত্রিকার একটি মন্তব্যে জানা যায়,

> ভারতরক্ষীসৈন্য-দলভুক্ত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা সরকারি কলেজে অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা যতদিন সামরিক শিক্ষানবীশ থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা হইবে না, আর তন্মধ্যে যাঁহারা ছাত্রনিবাসে বাস করেন, তাঁহারা এযাবৎ যে ঘরভাড়ার টাকা দিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগকে প্রত্যার্পণ করা হইবে! ভালো কথা।[৭]

কেবলমাত্র লোভ দেখিয়ে সেনাদলে ভর্তি করাই যে চলেছিল এমনটা নয়। বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে দলকে দল মানুষকে জবরদস্তি যুদ্ধে পাঠানোর প্রক্রিয়াও সমানে চলেছিল। আসলে বাঙালি এমন এক যুদ্ধে জড়াচ্ছিল যার প্রত্যক্ষ অংশীদার সে নয়। ফলে যুদ্ধ সম্পর্কে বাঙালির মনোভাবও ছিল দ্বিধাবিভক্ত। একাংশের বাঙালি যুদ্ধকে নতুনের বার্তাবাহক বলে মনে করতে শুরু করে। তারা মনে করে যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাঙালি একটা শক্তিশালী জাতি হিসেবে জগতে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে পারবে। নিজের স্থবিরতা ভেঙে আগুয়ান হতে এই যুদ্ধ তার সহায়ক হবে। *প্রবাসী* পত্রিকার ফাল্গুন ১৩২৫ সংখ্যায় 'উড়োচিঠি' নামাঙ্কিত একটা লেখা প্রকাশিত হয়, জনৈক অশান্তর কোন এক অমরকে উদ্দেশ্য করে লেখা। তাতে এক জায়গায় বলা হয়,

> আসলে কিন্তু যুদ্ধটাকে তুমি যত খারাপ বলে মনে করো আমি তত করি নে। তুমি বলছ-- যুদ্ধটা বিশ্বমানবের একটা ব্যাধি। আমি বলছি-- ওটা ব্যাধি নয়, ওটা হচ্ছে ওষুধ। মানুষের গায়ে ফোড়া উঠলে তাতে সে প্রথমে প্রলেপ লাগায়, তাতে যদি ফোড়া না ফাটে তবে তখন অস্ত্র

> করতে হয়। সেইরকম বিশ্বমানবের মনে বা কোনো জাতি বা সমাজবিশেষের মনের গায়ে মাঝে মাঝে ওইরকম ফোড়া ওঠে। সে ফোড়া যদি মসীর প্রলেপে না ফাটে তবে সেখানে বাধ্য হয়ে অসি বসাতে হয়-- আর সেটা নিষ্ঠুরতা নয়-- সেটাই হচ্ছে পরিণাম-মঙ্গল সহানুভূতি।[৮]

বোঝা যাচ্ছে, যুদ্ধ নিয়ে একরকম বাগ্‌বিতণ্ডা, বিতর্ক সেই সময়ে দানা বাঁধছিল। যুদ্ধের সমর্থনেও বোনা হচ্ছিল যুক্তিজাল। বিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরি লিখছেন,

> যুদ্ধের পূর্বে কোনো বাঙালিকে সমর বিভাগে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। যেদিন সমস্ত য়ুরোপের বক্ষের উপর দিয়া প্রলয়নাদে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, সেদিন সমস্ত জগদবাসীর মুখে বিষাদের কালিমা ফুটিয়া উঠিল। সকলের মন ভবিষ্যত অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পরে কয়েক বৎসর অতীত হইলে যখন দেখা গেল যে, য়ুরোপের এই মহাযুদ্ধে অনেক বীর তাহাদের হৃদয়শোণিত দিয়া মাতৃভূমির তর্পণ করিয়াছে, তখন ইংরেজ আবার সৈন্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। বাঙালিকে বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মান-ইজ্জত বজায় রাখিতে অনুরোধ করিলেন। বাঙালির অনেকদিনের সুপ্ত হৃদয় আভিজাত্যের গৌরব বজায় রাখিতে হুঙ্কার দিয়া জাগিয়া উঠিল। বাঙালি রাজার মান, রাজার সম্ভ্রম বজায় রাখিতে সমরক্ষেত্রে ছুটিয়া চলিল।[৯]

ভারতবর্ষ পত্রিকার আশ্বিন ১৩২৬ সংখ্যায় যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে করতে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬–১৯৬২) লিখছেন,

> শয্যায় শয়ন করিয়া জীবন-নাটকের এই অপ্রত্যাশিত অঙ্কের কথা ভাবিতে লাগিলাম-- এরাস, কেম্রাই, জোনিবিক, ইপর, সম, এলবার্ট, লিল, এমিয়েঁ-- এসব নাম গত চারি বৎসরকাল সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি, মানচিত্রে দেখিয়াছি-- এবার সেইসব স্থান দেখিব, মসিজীবী বাঙালি আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব! জীবনে কখনো যে অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা কল্পনাই করিতে পারি নাই, তাহাই লাভ করিতে পারিব।[১০]

এই নতুন অভিজ্ঞতা লাভ একদিকে যেমন বাঙালিকে তার দৈনন্দিন জীবনের বাইরে বিচিত্র পৃথিবীর সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল তেমনি দেখতে শিখিয়েছিল বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি নির্ভর শক্তির মদমত্ততা; যেখানে তার স্থাণুত্ব, তার আধ্যাত্মিকতা কোন কিছুরই বিশেষ দাম নেই।

একদিকে বিশ্বযুদ্ধকে ঘিরে তৈরি হচ্ছিল বাঙালির এক অংশের উৎসাহ ও কৌতূহল, অন্যদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ঘনিয়ে উঠছিল অসন্তোষ। সুমিত সরকার (১৯৩৯–) বলছেন,

> যুদ্ধের বছরগুলিতে 'সম্পদ নির্গমে'র অর্থ দাঁড়ায় ভারতীয় মানব ও বস্তু সম্পদের বিশাল লুঠ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে ১২ লক্ষে দাঁড় করানো হয়, আর হাজার হাজার ভারতীয়কে সামরিক অভিযানে মরতে পাঠানো হয় পুরোপুরি বিজাতীয় এক উদ্দেশ্যে। এই অভিযানগুলি প্রায়ই পরিচালিত হয়েছিল অযোগ্যভাবে।[১১]

সুমিত সরকারের মতে, তাত্ত্বিকভাবে যুদ্ধে স্বেচ্ছা-যোগদানের কথা বলা হলেও আসলে প্রায়শই তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাধ্য হওয়ারই সামিল।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সামরিক খাতে খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যুদ্ধবাবদ ঋণ এবং কর প্রচুর বেড়ে যায়। আরও বেশি হারে বহিঃশুল্ক, আয়কর, অবিভক্ত হিন্দু ব্যবসায়ী পরিবার এবং কোম্পানির

ওপর উপরি কর, অতিরিক্ত লাভের কর চাপানো হতে থাকে, যার ভার বইতে হয় সাধারণ মানুষকে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এর মধ্যে ১৯১৮-১৯ এবং ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে পরপর শস্য উৎপাদন সাংঘাতিক রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাবারের যখন এমনিতেই টানাটানি, সেই পরিস্থিতিতেও যুদ্ধরত সেনাদের জন্য ফ্রন্টে খাদ্য রপ্তানি জারি থাকে। ফলে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। ১৯২১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ১৯১৮-১৯ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ১২ থেকে ১৩ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন,

> এরকম কঠিন সময় চলা কালেও ১৯১৪ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সেনাবাহিনীর জন্য বলপূর্বক নিয়োগ অব্যাহত থাকে। ফলে গ্রামেগঞ্জে মানুষের মনে অসন্তোষ জমতে থাকে। এটি ঘটে কারণ গ্রামসমাজের সকল স্তরের মানুষই যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়।[১২]

একদিকে যেমন কৃষিভিত্তিক জীবন যাপন হয়ে চলেছিল যন্ত্রণাবিদ্ধ, তেমনি অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ক্রমশ তার ভিত মজবুত করতে শুরু করেছিল এই সময়েই। ভারতীয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজির বাড়বাড়ন্ত তখন নজর কাড়ার মতো হয়ে দাঁড়ায়। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,

> যুদ্ধকালীন অন্য প্রধান অর্থনৈতিক ঘটনা হল শিল্পের অগ্রগতি। নগদ টাকার প্রয়োজনে আর্থিক ও জাতীয় চাপের ফলে শিল্পায়ন সংক্রান্ত সরকারি নীতিতে পরিবর্তন ঘটে। পাট ও বস্ত্রশিল্পে চোখে পড়ার মতো অগ্রগতি ঘটে। প্রধানত ব্রিটিশ মূলধনেই পাটশিল্পের অগ্রগতি ঘটে।[১৩]

তবে ভারতীয় ছোট ও মধ্যমানের ব্যবসায়ীরা যুদ্ধকালীন কর নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। ভারতীয় টাকা এবং ব্রিটিশ স্টার্লিং-এর বিনিময় মূল্যের কমা-বাড়া নিয়েও ছিল অভিযোগ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিরোধের একটা চোরাস্রোত বইতে থাকে এই সময়

থেকেই। আবার পাশাপাশি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ওপরমহল ঋণসুযোগ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রিটিশ ফিনান্স পুঁজির সঙ্গে সমঝোতাও রেখেছিল। সব মিলিয়ে পুঁজির রথ ভারতবর্ষের বুকে তার চাকার আওয়াজ তুলতে থাকে। কৃষিজীবীদের এক বড় অংশ শ্রমিক হবার পথে পা বাড়ায়। **১৯১১** থেকে **১৯২১** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংগঠিত শিল্পে শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল পাঁচশো পঁচাত্তর হাজার।

বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার বাড়বৃদ্ধির সাথে সাথেই ঘটে বুর্জোয়া জীবনবোধের বিকাশ। দীর্ঘকালের সামন্ততান্ত্রিক নীতিবোধগুলোর ক্ষুদ্র পরিসরে সেই উদীয়মান জীবনবোধের দমবন্ধ লাগাই স্বাভাবিক। ফলে সেই পুরাতন বন্দোবস্তের ফাঁকফোকর দিয়ে মুক্তি খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তারপরেও শোষক জমিদার অংশের একরকম আঁতাত, বলা চলে মেলবন্ধন অটুট ছিল সেই সময়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন, সামাজিক নীতিবোধের ক্ষেত্রেও তাই।

এইসময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জমাটবাঁধা রাগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বিপুল পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহ, করের বোঝা, যুদ্ধঋণ, আর ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ জনজীবনকে অস্থির করে তোলে। সুমিত সরকারের মতে, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিণাম ছিল অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্বার্থের মধ্যে অসংখ্য দ্বন্দ্ব চোখের সামনে আসে ও তীব্র হয়ে ওঠে।"[১৪] **১৯১৯** সালের রাওলাট আইনের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারের ওপর যুদ্ধকালীন বাধানিষেধকে স্থায়ী করার প্রচেষ্টা হয়, যেখানে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিশেষ আদালত ও বিনা বিচারে দু বছর অবধি আটকের বন্দোবস্তও ছিল। এমনকি রাজদ্রোহমূলক বলে ঘোষিত কোনো পুস্তিকা বাড়িতে

রাখলেও তার ক্ষেত্রে এই আইন লাগু হতে পারত। ব্রিটিশ শাসনের নখ দাঁতের ধার বাঙালির কাছে মোহহীন ধরা পড়তে থাকে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন,

> প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত শ্রেণির মানুষের জীবনে আর্থ সামাজিক বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। সমাজে গণঅভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত হয়। যুদ্ধের ফলে শিক্ষিত তরুণদের মোহভঙ্গ ঘটে। যারা এতদিন পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে মোহাবিষ্ট হয়েছিল, হঠাৎই তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কুৎসিত রূপটা আবিষ্কার করে।[১৫]

এই পরিস্থিতিতেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে ওঠেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯–১৯৪৮)। পাশ্চাত্য ধারণাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আদর্শের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মধ্য থেকে গড়ে ওঠা ভাবাদর্শের মিশ্রণ গড়ে তোলেন তিনি। ভারতীয় জনমানসে গেঁথে থাকা ধর্মীয় বোধকে স্পর্শ করে জনসাধারণকে তিনি আন্দোলনে সামিল করেন; কিন্তু পূর্বতন হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদীদের থেকেও তার পথ আলাদা ছিল। ধর্মীয় নৈতিকতার কথা বললেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে তিনি স্বরাজের কথা বলেছিলেন। ফলে তাঁর নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়। নরমপন্থী ও চরমপন্থীদেরও তিনি এক মঞ্চে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এই এক মঞ্চে সকলকে আনার জন্যই স্বরাজ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "তিনি জানতেন স্বরাজ্যের যেকোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাই কোন-না-কোন দলকে অসন্তুষ্ট করবে এবং তার ফলে সেই দল দূরে সরে যাবে।"[১৬] স্বরাজের ধারণাকে প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে নিতে পারত। পাশাপাশি অহিংসার ধারণাতে জোর দেওয়ায় নরমপন্থী ও অন্যান্য সম্পদশালী গোষ্ঠীর সমর্থন পাওয়ায় সুবিধা হয়। খিলাফত আন্দোলনকেও (১৯১৯–

১৯২৪) তিনি ব্রিটিশ বিরোধী হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দিকে নিয়ে যান ব্রিটিশ বিরোধী প্রবণতাগুলিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে এবং ইসলামিক প্রবণতাগুলিকে কম গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে। পাশাপাশি ভারতের উচ্চ অংশের নেতাদের ছাপিয়ে তিনি ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে সরাসরি আবেদন রাখতে সক্ষম হন, যারা যুদ্ধের বিশৃঙ্খলায় ইতিমধ্যেই জর্জরিত হয়েছিল।

গান্ধীর চম্পারণ, খেড়া আহমেদাবাদের সত্যাগ্রহ যেমন একদিকে কৃষক সমাজের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, অন্যদিকে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে আহমেদাবাদের বস্ত্র-বয়ন শিল্পশ্রমিকদের ধর্মঘটেও জড়ান তিনি। তবে ১৯১৯ এর রাওলাট সত্যাগ্রহে গান্ধী অঞ্চলের সীমা ছাড়িয়ে গোটা জাতিকে আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন। হিংসা দমনে সরকারকে অধিক দমনমূলক ক্ষমতা দেওয়ার যে বিল এস.এ.টি. রাওলাট (১৮৬২-১৯৪৫) প্রস্তুত করেছিলেন তার বিরুদ্ধে তিনি ১৯১৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সমস্ত ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি দেন আইন অমান্য করে সত্যাগ্রহে সামিল হওয়ার জন্য। ৬ এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়। এত ব্যাপক গণআন্দোলন এর আগে ভারতে ব্রিটিশ সরকার দেখেনি। ৯ এপ্রিল গান্ধী গ্রেপ্তার হলেও আন্দোলন থামেনি। আন্দোলন দমন করতে ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড ঘটায় ব্রিটিশরা। যার প্রতিবাদ দেশজুড়ে ঘনিয়ে ওঠে। বাংলার সাহিত্য মহলেও প্রভাব পড়ে তার।

১৯২১ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণ সেখানে ছিল চোখে পড়ার মতো। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে। আইনজীবীরা তাদের পেশা ত্যাগ করে। একই সঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন ও উন্নয়নের চেষ্টা শুরু হয়। বিদেশী পণ্য বয়কট ও

বিদেশী বস্ত্রের প্রকাশ্যে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটতে থাকে। হাতে চালানো তাঁত-কাপড়ের উৎপাদন বেড়ে যায়। সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে অসন্তোষ ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে।

এই ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে মোহভঙ্গ হওয়ার পিছনে যেমন অর্থনৈতিক উপাদানগুলি কাজ করেছিল, তেমনই ছিল বিশ্বজুড়ে ঘটতে থাকা রাজনৈতিক ভাবনা ও দর্শনের তরঙ্গাভিঘাত— উন্নত দেশগুলোয় যা ছিল পুঁজিবাদ বিরোধী এবং উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। দূর দেশ থেকে ফিরে আসা সৈন্যরাও সেই রাজনৈতিক বোধের আভাস নিয়ে ফিরে আসছিল অনেকক্ষেত্রে। এই সামরিক কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সমাজবাদ-প্রবণ কবি হয়ে উঠেছিলেন বলে সুমিত সরকার মনে করেছেন।[১৭] রাশিয়ার ১৯১৭ সালের নভেম্বরের বলশেভিক বিপ্লবও গুরুত্বপূর্ণ অভিঘাত তৈরি করেছিল। এই নিয়ে ব্রিটিশদের আশঙ্কা এতটাই বেশি ছিল যে ১৯১৯-২০ সালের পর থেকে সরকারি প্রতিবেদনে সর্বত্রই বলশেভিক ভাবনাচিন্তা ও সোভিয়েতের মন্ত্রণার ভূত দেখা হতে থাকে। রাশিয়া সম্পর্কে ব্রিটিশদের ঘৃণার মনোভাবই আবার জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত ভারতীয় তথা বাঙালিদের রাশিয়া সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ও আগ্রহী করে তোলে। প্রথম দিকের মস্কোযাত্রীদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায়(১৮৮৭-১৯৫৪), অবনী মুখোপাধ্যায়(১৮৯১-১৯৩৭), বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়(১৮৮০-১৯৩৭), ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮০—১৯৬১) মতো বাঙালি বিপ্লবীদের নামই বেশি পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হয়।

সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে এই বিশ্বযুদ্ধ আবার একদিক দিয়ে কিছু আকস্মিক সুযোগের হাতছানি নিয়ে আসে। বিশ্বযুদ্ধের দরুন তারা ইংরেজদের পরাক্রমশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে

জার্মান ও তুর্কিদের উপস্থিতি টের পায়। তাদের থেকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের সম্ভাবনাও দেখতে পায়। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বাঙলার সংগ্রামীরা অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালায়। রাসবিহারী বসু(১৮৮৬–১৯৪৫), শচীন্দ্রনাথ সান্যালরাও(১৮৮৩–১৯৪২) ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের পরিকল্পনা করতে থাকেন। পরিকল্পনাগুলো ব্যর্থ হলেও একধরনের উদ্দীপনার সঞ্চার হতে থাকে। পলাতক সংগ্রামীদের সাথে বার্লিনের যোগাযোগ ঘটে। অন্যদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন কলকাতাকেও নাড়া দিয়ে যায়। আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, আটক-মুক্তির দোলাচলে দুলতে থাকে বাঙলার পট।

অস্থির সেই সময়ে, আগে-না-ঘটা মুখর পরিস্থিতিতে বাঙালি নিজেকে আবিষ্কার করে এক অভিনব সংস্থানের মধ্যে। ব্যাপ্ত হয় তার ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি, তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার। অজস্র জাতি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই যুদ্ধ-জড়িত বাঙালি নতুন বিশ্ববোধ আবিষ্কার করে নিজের ভেতর, আচমকা, অপ্রস্তুতভাবে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে এশিয়া জুড়ে কি ফল ফলেছে তা বোঝাতে গিয়ে যা বলবেন, বাঙালির সেইসময়ের মানসপরিস্থিতির ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য:

> ইতিমধ্যে দেখা যায় এশিয়ার নাড়ি হয়েছে চঞ্চল। তার কারণ, য়ুরোপের চাপটা তার বাইরে থাকলেও তার মনের উপর থেকে সেটা সরে গেছে। একদিন মার খেতে খেতেও য়ুরোপকে সে সর্বতোভাবে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নিয়েছিল। আজ এশিয়ার এক প্রান্ত হতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও তার মনে আর শ্রদ্ধা নেই।[১৮]

বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে এশিয়ার সুপ্তিভঙ্গ ও নির্মোহ বোধোদয় ঘটছে বললেও, পাশাপাশি মহাযুদ্ধের বীভৎসতা সম্পর্কে সতর্ক করে রবীন্দ্রনাথ বলবেন,

> এত বড়ো বিরাট দুর্যোগ মানুষের ইতিহাসে আর কখনোই দেখা দেয়নি। একেই বলি জড়তত্ত্ব; এর চাপে মনুষ্যত্ব অভিভূত, বিনাশ সামনে দেখেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না।[১৯]

কর্মচঞ্চল, প্রযুক্তিজাত অস্ত্রশক্তির দাপটে ক্ষমতাশালী, আঘাত-প্রত্যাঘাতে অভ্যস্ত এক বিরাট দুনিয়াকে আবিষ্কার করে সেই অজ্ঞাতপূর্ব পৃথিবীর আয়নায় নিজের ছবি দেখার চেষ্টা করেছে বাঙালি। বন্ধ দরজায় এতদিনের যে আত্মানুসন্ধান ও আত্মসংযম, তার প্রতি জন্মেছে অনাস্থা। নতুন জ্ঞান, নতুন বিদ্যা রপ্ত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে। নতুন জ্ঞানের জন্য তখন প্রয়োজন হয়েছে নতুন অভিজ্ঞতার এবং তারই সূত্র ধরে স্থানিক সরণের। বিশ শতকের পৃথিবী তার মানচিত্রের মতোই তত্ত্ব, দর্শন, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তখন চালাচ্ছে অবিশ্রাম ভাঙাগড়া। অনড় অবস্থানে আর চলতাবিহীন হয়ে থাকা সম্ভব হয়নি বাঙালির। নব্য আবিষ্কৃত বড় দুনিয়াকে জেনে নিতে তৈরি হয়েছে নতুন আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা। অথচ উপনিবেশের শিক্ষা, ধর্মজাত স্থাণুত্ব ও সামাজিক বিধিনিষেধের শিকলে বাঁধা বাঙালির কাছে নতুন দুনিয়াকে জানার পথ তখনও রুদ্ধ। কালাপানি পার হলে যে জাতির মানুষকে তখনও জাত যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগতে হতো, বাস্তব পৃথিবীতে সমস্ত আগল ভেঙে বেরিয়ে পড়া তার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। একদিকে নতুন আবিষ্কৃত পৃথিবীকে জেনে নিতে অভিযানের আকাঙ্ক্ষা ও অন্যদিকে তার সাধ্যহীনতার উপলব্ধি, যে উপলব্ধি বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালির নতুন প্রাপ্তি-- এই দুইয়ের অনিবার্য ঘর্ষণ থেকে, দ্বন্দ্ব থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে গড়ে ওঠে অভিযানের প্রকল্প, যা একই সঙ্গে দ্রোহ ও স্বস্তির আবহ নির্মাণ করে।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মাধ্যমে বাংলা অভিযান সাহিত্য সূচিত হওয়ার পর সময় যতো এগোতে থেকেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সতীকান্ত গুহ (১৯১০-১৯৯১), নীহার রঞ্জন গুপ্ত (১৯১১-১৯৮৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৬), দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৯০-১৯৯৯), নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৬৩), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩), প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১০৯৫-১৯৭২), শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) প্রমুখ লেখকের শিশু-কিশোর সাহিত্যে ভর করে অভিযান কাহিনি বিচিত্রপথে বয়ে গিয়েছে। উপনিবেশের দর্শন ও তার গ্রস্ততা, উপনিবেশের যন্ত্রণা ও তার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বদর্শন অভিযান সাহিত্যের গতিপথে রেখে গেছে সময়ের চিহ্ন। প্রভাবিত করেছে অভিযান কাহিনির ধারাকে। অভিযান কাহিনির পথ চলাও যেমন থামেনি, তেমনি বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতিও বদলাতে থেকেছে ক্রমাগত। অজস্র নানামাত্রিক মতাদর্শের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে উদ্বেল থেকেছে বিশ শতকের সামগ্রিক প্রথমার্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই জ্বলে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন। উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তো বটেই, উপনিবেশ কিংবা আধা উপনিবেশ, সাম্রাজ্যবাদ কবলিত দেশগুলিও সেই আগুনের আঁচ থেকে বাদ যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে ভারতবর্ষের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে। পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে অভিযান-কাহিনির মতাদর্শেও ঘটেছে বাঁকবদল। তাই পরিস্থিতিটিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

নেপথ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতবর্ষের আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থা:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই বিশ্বের প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো তাদের আগ্রাসী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে আরম্ভ করেছিল। ত্রিশের দশকে পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী টানাপোড়েনের কেন্দ্রভূমি ছিল দুটি মহাদেশ। প্রথমত ইউরোপ, যেখানে ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের মতো দেশগুলি একদিকে অন্যদিকে ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইতালি। দ্বিতীয়ত এশিয়া, যুদ্ধবাদী জাপান যেখানে সাম্রাজ্যলিপ্সায় জড়িয়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে **১৯১৯** সালের **২৮** জুন জার্মানি ও ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের ভেতর যে ভার্সাই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই শান্তিচুক্তি অন্যায্যভাবে জার্মানির ওপর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে এই দাবি তুলে, পৃথিবী পুনর্বন্টনের চাহিদা জানান দিতে থাকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ। **১৯৩৩** সালে নাৎসি পার্টি তথা অ্যাডল্ফ হিটলার (**১৮৮৯—১৯৪৫**) জার্মানির ক্ষমতায় এলে বর্ণবৈষম্যবাদকে সামনে রেখে ইহুদি ও কমিউনিস্টদের ওপর চরম আক্রমণ নামিয়ে আনে। জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্বজুড়ে আধিপত্যের স্লোগান তুলতে থাকে নাৎসি পার্টি। **১৯৩৫** সালের **১৬** মার্চ ফ্যাসিস্টরা জার্মান সশস্ত্রবাহিনী— ভের্মাখট গঠনের জন্য ও বাধ্যতামূলক সর্বজনীন সৈনিক বৃত্তি চালু করার জন্য একটি আইন পাস করে এবং দেশকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। **১৯৩৫** সালকে জার্মান নাৎসিরা স্বাধীনতার বর্ষ বলে ঘোষণা করে। দীর্ঘকালের প্রত্যাশা পূরণ করে তারা জার্মানিকে সামরিক সার্বভৌমত্ব দিয়েছে বলে দাবি করে। যুদ্ধের জন্য জার্মানির জনগণকে ভাবাদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রস্তুত করতে ঢালাও প্রচারমূলক কাজকর্ম চালানো হয়। **১৯৩৬** সালে নাৎসিরা সমস্ত চুক্তি ভেঙে রাইন অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করে এবং ফ্রান্সের সীমান্তে এগিয়ে যায়।

এভাবে জার্মানি আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রধান আক্রমণকারী শক্তিতে পরিণত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জার্মানির এই সার্বিক সমরায়োজন ও বিশ্বে আধিপত্য করার চেষ্টা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে থাকে। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নকে দখল করার সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে জার্মানি থাকায় ব্রিটেন, ফ্রান্স আমেরিকার পুঁজিপতিরা সহায়তাও করতে থাকে। ১৯৩৬ সালে ফরাসি পুঁজিপতিদের থেকে জার্মানি পেয়েছিল তিনশো কোটি মার্কেরও বেশি মূল্যের লৌহ আকরিক। জার্মানিতে ওইসময় বক্সাইট আমদানির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল ছয় গুণ। ফলে জার্মানি বিমান নির্মাণের প্রয়োজনীয় অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ফেলে। তিনের দশকের শেষদিকে ফ্যাসিস্ট জার্মানির সামরিক শিল্পের মান ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শিল্পের মিলিত মানের চেয়েও ওপরে ছিল। জার্মান অর্থনৈতিক গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুসারে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ সালের শেষ অবধি দেশে অস্ত্রের পরিমাণ ১০ গুণ ও বিমান নির্মাণ ২৩ গুণ বেড়ে গিয়েছিল।[২০] অস্ত্রের উন্নতির জন্য চর্চা হতে থাকে বিজ্ঞানের নানা অলিগলি। মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সাহায্যে জার্মান শিল্পপতিরা ১৯৩৮ সালে কৃত্রিম জ্বালানি উৎপাদনের পরিমাণ ১৬ লক্ষ টনে নিয়ে যায়। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে জার্মানির সামরিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বাইশ গুণ। সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা বাড়ে পঁয়ত্রিশ গুণ। নাৎসিরা রাষ্টযন্ত্রের প্রধান পদগুলি নিজেদের অধীন করে নেয় ও সংগঠনের ওপর ভিত্তি করে জনসমাজকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে থাকে। জনগণকে ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিজেদের পক্ষে রাখার যাবতীয় বন্দোবস্ত করা হয়। গেস্টাপো, এস-এস, এস-ডি ইত্যাদি সংস্থার দ্বারা নজরদারি ও সন্ত্রাস কায়েম রাখার জটিল জাল বোনা হয়।

বেনিটো মুসৌলিনি (১৮৮৩—১৯৪৫) নেতৃত্বে রিপাবলিকান ফ্যাসিস্ট পার্টি ইতালির ক্ষমতায় এলে ইতালিও ক্রমে ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যুদ্ধের উপকরণে প্রস্তুত হতে থাকে ইতালী। ১৯৩৬ সালে জার্মানি ও ইতালি কমিন্টার্নবিরোধী চুক্তি সম্পাদন করে, জাপানও তাতে যোগ দেয়। বার্লিন, রোম ও টোকিওর মধ্যে আগ্রাসী সামরিক জোট গড়ে ওঠে। ১৯২৭ সালের তানাকা স্মারকলিপিতে চীন, ভারত ও অন্যান্য এশীয় দেশ দখলের জাপানী পরিকল্পনাগুলি উল্লিখিত হয়। তাতে বলা হয়, পৃথিবী দখল করতে হলে জাপানকে প্রথমে চীন অধিকার করতে হবে। চীন দখলে সক্ষম হলে এশিয়া মাইনরের বাকি দেশগুলি, ভারত ও দক্ষিণ সমুদ্রের দেশগুলি জাপানকে ভয় পাবে ও আত্মসমর্পণ করবে। পৃথিবী তাহলে জাপানের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে সাহস পাবে না। এভাবে জাপান ক্রমপর্যায়ে চীন, এশিয়া মাইনর, মধ্য এশিয়া এবং সবশেষে ইউরোপ অধিকারের কাজে হাত দেবে। জাপান তার সেনাবাহিনীর পুনর্সংগঠন ও অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে থাকে। ১৯৩১ সালে উত্তর পূর্ব চীন ও অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ার একাংশ দখল করে। জাপান ও মাঞ্চুরিয়ার সামরিক কারখানায় যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ বেড়ে গেল। সোভিয়েত, মঙ্গোলিয়া ও চীন সীমান্তে দখলদার জাপানি বাহিনী দ্রুত বিমান ঘাঁটি, রেল পথ, মোটর সড়ক, সৈন্য শিবির আর সামরিক গুদাম নির্মাণ করে। ১৯৩৩ সালের ২৭ মার্চ জাপান জাতিপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে যায়। ১৯৩৪ সালে সামুদ্রিক অস্ত্র সীমিতকরণের ওয়াশিংটন সম্মেলনের (১৯২১-১৯২২) চুক্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩৭ সালে জাপান চীন আক্রমণ করে। চীন-জাপানের যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদি চরিত্র ধারণ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিজয়ীর ভূমিকায় থাকা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ফ্যাসিস্ট শক্তি, বিশেষত জার্মানির ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত থাকলেও প্রাথমিকভাবে সোভিয়েত বিরোধী অবস্থান

থেকে জার্মানিকে কিছুটা সুবিধাও জোগায়। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে হিটলার অস্ট্রিয়া অধিকার করার পর ২৯ মার্চ ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির প্রতিনিধিরা মিউনিখে চুক্তি স্বাক্ষর করলে ইউরোপের পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন (১৮৬৯—১৯৪০) ও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এদুয়ার্দ দালাদিয়ে (১৮৮৪—১৯৭০) হিটলার ও মুসৌলিনির সঙ্গে চুক্তি করে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে চেকোস্লোভাকিয়াকে খন্ডিত করে ফ্যাসিস্ট জার্মানির হাতে তুলে দেয়। ৩০ সেপ্টেম্বর এই মিউনিখ চুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয় ইঙ্গো-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। ৬ ডিসেম্বর জার্মানি ও ফ্রান্সের ভেতর অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পৃথিবী জুড়ে সেইসময় মিউনিখ চুক্তির নিন্দা ধ্বনিত হতে থাকে। ১৯৩৮ সালের ৯ অক্টোবর ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র *ইউমানিতে* জানায়, "মিউনিখের বিশ্বাসঘাতকতা শান্তি রক্ষা করেনি, তা বরং শান্তি ভঙ্গ করেছে, কেননা এই চুক্তি সমস্ত দেশের শান্তিকামী শক্তিসমূহের জোটের উপর আঘাত হেনেছে এবং ফ্যাসিস্টদের তাদের দাবিগুলো এত বেশি কঠোর করতে অনুপ্রাণিত করেছে যে তারা এখন বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মহলসমূহের কাছ থেকে সমর্থন লাভ করছে।"[২১] ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নেতৃবৃন্দের আচরণ সম্পর্কে মার্কিন ইতিহাসবিদ ফ্রেডারিক শুমান (১৯০৪—১৯৮১) লেখেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রাককালীন পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জাতিসমূহের প্রতিনিধিরা যে নির্বুদ্ধিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে মানুষের দুর্বলতা, নির্বুদ্ধিতা আর মানুষকৃত অপরাধসমূহের সমগ্র লিখিত ইতিহাসে বর্ণিত কোনকিছুরই তুলনা হয় না।[২২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বিশ্বের প্রথম ও একক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বাকি পুঁজিবাদী তখন দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। এক দিকে থাকে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রদের জোট

আর অন্যদিকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জোট। আন্তর্জাতিক বাজার, কাঁচামালের উপনিবেশ নিয়ে এই দুই শিবিরের বিরোধ গভীর হতে থাকে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরেই। পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ বাধলে তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে একদিকে প্রধান শক্তি হয়ে ছিল ফ্যাসিবাদী জার্মানি ও ইতালি অন্যদিকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ব্রিটেন ও ফ্রান্স। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের পুঁজিপতিদের সহায়তায় শক্তিশালী হয়ে উঠলেও জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তে ইঙ্গো-ফরাসি জোটের ওপরেই আক্রমণ করে বসে। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর ভোর ৪টে ৪৫ মিনিটে জার্মান বিমান বাহিনী পোল্যান্ডে বোমাবর্ষণ শুরু করলে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়ে যায়।

ফ্যাসিবাদী জোট বনাম বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক জোটের এই যুদ্ধে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ হিসেবে আবারও জড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষ। ১৯৩৩ সাল থেকেই উইন্সটোন চার্চিল (১৮৭৪—১৯৬৫) শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকা জার্মানির বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। আসন্ন যুদ্ধের যে ছায়া তিনি দেখেছিলেন, তার জন্যই তিনি প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন বিশাল আকারের সমৃদ্ধ উপনিবেশের। জানিয়েছিলেন, ভারতবর্ষে কেবল আধিপত্যই নয়, বাণিজ্যিক অধিকারকেও আরও শক্তিশালী করতে হবে।[২৩] ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সালে আইন অমান্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে জাতীয় কংগ্রেসের ভেতর মতবিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল। বামপন্থী ও সমাজবাদীরা যথা জয়প্রকাশ নারায়ণ (১৯০২-১৯৭৯), অচ্যুত পটবর্ধন (১৯০৫-১৯৯২), অশোক মেহেতা (১৯১১-১৯৮৪), ইউসুফ মেহেরালি (১৯০৩-১৯৫০), নরেন্দ্র দেব (১৮৮৯-১৯৫৬) প্রমুখ ১৯৩৪ সালের মে মাসে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি গঠন করেন। জহরলাল নেহেরু (১৮৮৯—

১৯৬৪) মিশ্র প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল সেই সময়। অন্যদিকে মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের ধারণা ক্রমশ বিকশিত হচ্ছিল। ১৯৩৫ সাল নাগাদ এন.জি. রঙ্গা (১৯০০—১৯৫৫) ও ই.এম.এস. নাম্বুদিরিপাদ (১৯০৯—১৯৯৮) মাদ্রাজ প্রেসিডিন্সির কিছু অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল সেই সময়েই। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে সর্বভারতীয় কিষান সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা জোটবদ্ধতার নীতি নিয়ে এই কিষাণ সভায় যোগদান করে। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে কংগ্রেসের নীতির তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এনে দেশীয় রাজ্যগুলোতে গণ আন্দোলন সমর্থন করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের ত্রিপুরি অধিবেশনে যৌথ আন্দোলনের পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। এই পরিস্থিতির ফলে ১৯৩৮–৩৯ সালে অনেকগুলি রাজ্যে নজিরবিহীন গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়। আন্দোলনের ফল স্বরূপ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণার তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়। প্রবীণ কংগ্রেসি নেতা ও তাঁদের বামপন্থী সমালোচকদের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে।

কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষ চন্দ্র বোস (১৮৯৭-১৯৪৫?) ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণার তীব্র বিরোধী। ১৯৩৯ এর অধিবেশন সুভাষচন্দ্র বোস গান্ধীর পছন্দের প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে (১৮৮০-১৯৫৯) পরাজিত করে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এই নির্বাচন দক্ষিণ-বাম, যুক্তরাষ্ট্রীয়করণ সমর্থন-বিরোধিতা, মন্ত্রিসভা সমর্থন-বিরোধিতার প্রশ্নগুলি আরও প্রকাশ্যে নিয়ে আসে ও জোরদার করে তোলে। কংগ্রেসের অসহযোগিতার ফলে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। নিজের দল ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন

করেন। এই সময় অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতিগুলির আগাম অনুমোদন ছাড়া আইন অমান্যতে কংগ্রেস-কর্মীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেয়। সুভাষ চন্দ্র প্রতিবাদ জানালে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। তাকে কংগ্রেসের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে তিন বছরের জন্য কোন রকম কার্যভার গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। জনগণের মধ্যে যে আশা, উদ্দীপনা ও উগ্রতা সঞ্চারিত হচ্ছিল তাতে রাশ টানে কংগ্রেস। ফলে একদিকে জনগণের মনে কংগ্রেসের প্রতি হতাশা অন্যদিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকা উগ্রতা ও অস্থিরতা দুয়ে মিলে আগামীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের জমি প্রস্তুত হতে থাকে।

এই অবস্থায় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো (১৮৮৭-১৯৫২) ভারতকেও সেই যুদ্ধে জড়িয়ে নেন, একতরফাভাবেই। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি দুটি মূল শর্তে যুদ্ধে সহায়তা করবে বলে প্রস্তাব দেয়— এক, যুদ্ধের পর স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো স্থির করার জন্য একটি সংবিধান-রচনা-পরিষদের প্রতিশ্রুতি, দুই, কেন্দ্রে অবিলম্বে দায়িত্বশীল জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। লিনলিথগো দুটি প্রস্তাবই নাকচ করে দেন। ১৯৩৯ সালে, যখন জাপানিদের আক্রমণ শুরু হয়নি সেই সময় কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল যে যুদ্ধ ভারত থেকে অনেক দূরের বিষয়, তাতে ভারতবাসীকে উৎসাহিত করতে হলে তাদের স্বার্থসিদ্ধির মতো কিছু শর্তপূরণ করতেই হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে সেখানে যদি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা না করা হয় তাহলে মিত্রশক্তি যে স্বৈরাচার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি নিয়ে লড়াই করছে— এ প্রচার মিথ্যে বলে চিহ্নিত হবে। লিনলিথগোর পক্ষ থেকে যুদ্ধ শেষ হলে কয়েকটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই বলা হয় না, বরং যুদ্ধঘোষণার দিনই ভারত

রক্ষা অর্ডিনান্স বলবৎ করে নাগরিক অধিকার খর্ব করা হয়। উপনিবেশের প্রাক-যুদ্ধের বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ প্রতিরক্ষা খাতে ধার্য করা হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে তা বেড়ে দুই পঞ্চমাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাথমিক কাজ হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্তান দিয়ে সোভিয়েতের দক্ষিণমুখী অভিযানকে আটকানো ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। পাশাপাশি তাদের মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতেও বহাল রাখা হয়। যুদ্ধের শুরুতে এই বাহিনীতে ৪৩৫০০ ব্রিটিশ ও ১৩১০০০ ভারতীয় সেনা ছিল। যুদ্ধমন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে চার্চিল সুপারিশ করেছিলেন ৬০০০০ ব্রিটিশ সৈন্য ভারতে পাঠানোর জন্য, যাদের কাজ হবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা এবং তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০০০০ সেনা ইংল্যান্ডে ফিরে যাবে। প্রশিক্ষণকালে এই সেনাবাহিনী ভারতীয়দের স্বাধীনতাকামী যে-কোনো অভ্যুত্থানকে দমন করবে।

১৯৪০ সালের ১০ মে উইনস্টন চার্চিল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হলেন। এরমধ্যে জার্মান ব্লিৎসক্রিগ[২৪] ইংল্যান্ডের পশ্চিম সীমান্ত তছনছ করে দিয়েছে। তার অল্প সময়ের মধ্যেই দখল করেছে ফ্রান্সকে। এইসময় উপনিবেশ-ভারতবর্ষের সেনা ও সম্পদ উভয়ই যুদ্ধের প্রয়োজনে কাজে লাগান চার্চিল। ভারত থেকে প্রতিমাসে ৪০০০০ টন খাদ্যশস্য জাহাজে করে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। রেল ইঞ্জিন ও কামরার এক-দশমাংশ এই পরিবহণে নিযুক্ত হয়। উপনিবেশের বাণিজ্যিক উৎপাদন অর্থাৎ কাঠের গুঁড়ি, পশমের পোশাক, চামড়ার জিনিস, লোহা, সিমেন্টের মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধে প্রয়োজন হয়েছিল। কলকাতার কাছাকাছি কারখানাগুলোকে তাড়াতাড়ি গোলা-বারুদ, গ্রেনেড, বোমা, বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রের কারখানায় রূপান্তরিত করা হয়। বোম্বাইয়ের মিলগুলোতে সামরিক পোশাক ও প্যারাস্যুট

উৎপাদন হতে থাকে। দেশ জুড়ে কারখানাগুলোতে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উৎপাদন বহুগুণে বাড়িয়ে তোলা হয়। উপনিবেশ হিসেবে এই যুদ্ধে ভারতের আর্থিক অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি— জিনিসপত্র সহ ভারতের পরিষেবার মূল্য ছিল দুই বিলিয়ন পাউন্ড।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ভারতীয়রা কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিল। তখনও যুদ্ধ ভারতের মাটি থেকে অনেক দূরবর্তী বিষয়। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো এবারেও যুদ্ধকালীন চাহিদা, আমদানি এবং দেশজ পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ায় ভারতীয় শিল্পে বিকাশ ও মুনাফার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২-এর মধ্যে কারখানায় নিয়োগের সংখ্যা ৩১% বেড়ে যায়। যতক্ষণ বোমারু বিমান হানা বা উদবাসনের ফলে সম্পত্তি নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই, ততক্ষণ ভারতীয় পুঁজিপতিরা যুদ্ধকে দ্রুত মুনাফা লাভের সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখেছে। সুমিত সরকার জানাচ্ছেন, খালিকুজ্জামান চৌধুরি (১৮৮৯–১৯৭৩) এক কৌতূহল জাগানো কথা বলেছেন, ব্রিটিশের সঙ্গে আরও বেশি সহযোগিতার পথে মুসলিম লীগকে ঠেলে দিয়েছিল ধনী ব্যবসায়ী, মুসলিম তালুকদার ও জমিদাররা, যারা কাঠ, কাঠকয়লা বা অন্যান্য ছোটখাটো জিনিসের খুচরো ঠিকাদারি পেতে আগ্রহী ছিলেন। জীবনে একবার পাওয়া সুযোগ তারা ছেড়ে দেবে এমন আশা করাই অসম্ভব।[২৫]

১৯৪০ সালে লিনলিথগো প্রস্তাব দেন ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে, কিছু সংখ্যক ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভাইসরয়ের কার্যকরী পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করা হবে ও যুদ্ধোত্তর সময়ে সাংবিধানিক পরামর্শের জন্য একটি সমিতি গঠন করা হবে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে যুদ্ধে জাপান অংশগ্রহণ করলে ও দ্রুত জয়লাভ করতে থাকলে বিশ্বযুদ্ধ আর ভারতের আকাশ থেকে দূরবর্তী হয়ে থাকতে পারে না।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই হংকং, বোর্নিও, ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর, জাভা, রেঙ্গুন, সুমাত্রা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জাপানের দখলে চলে যায়। ১৯৪২ সালের ৫ এপ্রিল কলম্বোয় বোমা পড়ে। এরপর ভারতের বিশাখাপত্তনম ও কোকোনাদে বোমা পড়ে। ব্রিটেনের কাছে ভারতীয়দের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এই সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট (১৮৮২–১৯৪৫) এবং রিপাবলিক অফ চায়নার প্রেসিডেন্ট চিয়াং-কাই-সেক (১৮৮৭–১৯৭৫) চার্চিলকে আগে থেকেই বলে আসছিলেন। সেই অনুযায়ী ১৯৪২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ক্রিপস মিশন ভারতে আসে।

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস (১৮৮৮–১৯৫২) ব্রিটেনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভাকে একটি ঘোষণাপত্র মেনে নিতে রাজি করান। যেখানে ভারতকে যুদ্ধের পর বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সমেত ডোমিনিয়ান মর্যাদার প্রতিশ্রুতি ছিল। ঘোষণাপত্র অনুসারে প্রাদেশিক বিধায়করা 'সংবিধান প্রণয়ন সংস্থা' নির্বাচন করবে, যাতে যোগ দেওয়া থাকবে রাজ্যগুলির ইচ্ছাধীন। ভারতীয় জনগণের প্রধান প্রধান অংশের নেতৃবৃন্দকে দেশের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য অবিলম্বে যোগদানের ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু স্পষ্টতই বলা থাকে, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার ব্রিটিশের হাতেই থাকবে। এই ঘোষণাপত্র তখনই প্রকাশিত না হলেও এরই ওপর ভিত্তি করে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে ২৩ মার্চ ক্রিপস ভারতে রওনা দেন। লিনলিথগোর প্রবল আপত্তি থাকলেও ক্রিপস যে খসড়া ঘোষণাপত্রের চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধা সে ব্যাপারে চার্চিল লিনলিথগোকে আশ্বস্ত করেছিলেন। লিনলিথগো পদত্যাগ করতে চাইলে চার্চিল তাকে বুঝিয়েছিলেন, নানা দুর্ভাগ্যজনক গুজব, প্রচার আর মার্কিনদের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ব্রিটেনের উদ্দেশ্যের সততাকে প্রমাণ করার দায় থেকেই ক্রিপস মিশনের আয়োজন অপরিহার্য। ভারতের

রাজনৈতিক দলগুলি একে প্রত্যাখ্যান করলে ব্রিটেনের ঐকান্তিকতা দুনিয়ার সামনে প্রমাণ হয়ে যাবে।[২৬] জহরলাল নেহেরু (১৮৮৯–১৯৬৪) ও মৌলানা আজাদের (১৮৮৮–১৯৫৮) সঙ্গে ক্রিপসের আলোচনাকালে কিন্তু খসড়ার চৌহদ্দি পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং ভারতীয় তথা কংগ্রেসের স্বার্থ আরও সুরক্ষিত হওয়ার জায়গা প্রস্তুত হয়। এরপর ৯ এপ্রিল প্রতিরক্ষা নিয়ে আলোচনাতেও যখন স্থির হয় প্রতিরক্ষা বিভাগের ভার থাকবে একজন ভারতীয়ের হাতে, রণক্ষেত্রের কাজ ব্রিটিশ সর্বাধিনায়কের হাতে থাকলেও তিনি এমন এক যুদ্ধ বিভাগের প্রধান থাকবেন যার কাজকর্ম হবে সুনির্দিষ্ট ও নিয়মাবদ্ধ তখন লিনলিথগো শঙ্কিত হন, প্রকৃত ক্ষমতা অনেকটাই কংগ্রেসের হাতে চলে যাচ্ছে দেখে। চার্চিলের সঙ্গে একযোগে তিনি মীমাংসার রাস্তা আটকান। জাতীয় সরকার ইত্যাদি বাদ দিয়ে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার মধ্যে সমগ্র আলোচনাকে ফেরত আনানো হয়। সমঝোতার বন্দোবস্ত সমস্তটাই ভেস্তে যায়। ক্রিপস আলোচনা ভেঙে যাওয়ার দায় কংগ্রেসের ওপর চাপান। সুমিত সরকারের মতে, "ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ার পুরো দায়িত্ব অবশ্যই ব্রিটিশের। তাহলেও, একথাও সত্যি যে, কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের একটা বড় অংশই সম্ভবত গোড়া থেকেই ছিলেন অনুৎসাহী।"[২৭] এরপর ইংরেজ ও কংগ্রেসের মতান্তরের তীব্রতা ঘটনাক্রমকে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পথে নিয়ে যায়।

১৯৪২ সালের ৩ মে *হরিজন* পত্রিকাতে মহাত্মা গান্ধী জানান, ব্রিটিশরা চলে গেলে জাপানিরা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা ফের বিবেচনা করবে এবং ফলাফল যাই হোক, সে-সমস্যা সমাধান ভারতীয়রা নিজের মতো করেই করবে।[২৮] ৮ আগস্ট আই সি সি-এর বোম্বাই অধিবেশনে যে বিখ্যাত 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব নেওয়া হয়। ওইদিনই 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ভাষণে গান্ধী বলেন,

প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ও সংগ্রামরত ভারতীয়কে ভাবতে হবে তিনি মুক্ত মানুষ।[২৯] আসলে ১৯৪২ এর মাঝামাঝি স্তালিনগ্রাদে জার্মানের পরাজয়ের আগে মিত্রশক্তির পরাজয় নিশ্চিত বলে মনে হচ্ছিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শ্বেতাঙ্গরা উৎখাত হয়। মালয়, সিঙ্গাপুর ও বর্মার ইউরোপীয়রা যুদ্ধের নামে যানবাহন দখল করে পালিয়ে যায়, আবাসী ভারতীয়রা প্রচণ্ড দুরবস্থার মধ্যে পাহাড়-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে ফেরে। বাস্তুচ্যুতদের সাহায্য করতেও ব্যর্থ হয় ব্রিটিশরা। আর বর্মার রণক্ষেত্র থেকে ট্রেন বোঝাই হয়ে ফিরে আসে আহত সৈনিকরা। ভারতীয়দের কাছে অপরিচিত, প্রয়োজনহীন এই যুদ্ধ সম্পর্কে তারা আরও ক্ষোভ ছড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি যে আসন্ন সেই আশাও সঞ্চারিত হতে থাকে। সুমিত সরকারের মতে,

> পুরোদস্তুর জাপ-আক্রমণ হলে বাঙলা ও আসামকে রক্ষা করা যাবে কিনা, সে সম্বন্ধে ১৯৪২-এর মাঝামাঝি ব্রিটিশদের নিজেদের সামর্থ্য বিষয়ে নিজেদেরই আশা ছিল অল্প। তাঁরা পেছিয়ে গিয়ে ছোটোনাগপুরের মালভূমি থেকে লড়াই চালানোর কথা ভাবছিল।[৩০]

কিন্তু পোড়া মাটির নীতি সোভিয়েতের মাটিতে দেশপ্রেমিক জনযুদ্ধ হিসেবে যেভাবে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে উপনিবেশ-ভারতে সেই নীতি লাগু করতে চাওয়া ছিল ভুল হিসেব; বরং এই নীতি লাগু করতে গিয়ে বাংলার মানুষের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকা নৌকা তাদের থেকে কেড়ে নেওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছিল।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে মূলত তিনটি বড়ো পর্বে চিহ্নিত করা হয়। প্রথমদিকে আন্দোলন ছিল মূলত শহর কেন্দ্রিক। এই পর্বের আন্দোলনের মূল কার্যপদ্ধতি ছিল হরতাল, ধর্মঘট এবং পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ। কলকাতায় হরতাল হয় ১০ থেকে ১৭ আগস্ট। মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও ছাত্রদের এই আন্দোলন পর্বে উপস্থিতিতে ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। আগস্ট মাসের

মাঝামাঝি থেকে আন্দোলনের চালকবল গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। জঙ্গী ছাত্ররা দলে দলে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলার মেদিনীপুর অঞ্চল এই পর্বের মূল কেন্দ্র ছিল। শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। তমলুকের মতো কিছু জায়গায় 'জাতীয় সরকার' গঠন করা হয়। সেপ্টেম্বরে এই আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদি এক পর্বে প্রবেশ করে— শিক্ষিত যুবকদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, পুলিশ ও সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ, যা কখনো কখনো গেরিলা যুদ্ধের স্তরেও পৌঁছে যায়।

ভারতীয় শিল্পপতি ও বণিকরা যুদ্ধের ঠিকাদারি থেকে বিপুল মুনাফা আহরণের কারণে যুদ্ধের দ্বারা শুরুতে লাভবানই হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৪২-এর মধ্যবর্তী সময়ে ছবি কিছুটা বদলাতে শুরু করে। মধ্যপ্রদেশের লাট ২৫ মে ১৯৪২-এ লিনলিথগোকে লেখেন, দু বছর আগে ভারতীয় ব্যাবসাদাররা উল্লসিতভাবে যুদ্ধের পক্ষে থাকলেও মালয় ও বর্মায় যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাতে বানিয়া আর মারোয়াড়িদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে। অতিরিক্ত মুনাফার তুলনায় সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের ক্ষয়ক্ষতির অভিজ্ঞতা তাদের পছন্দসই হয়নি এবং কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটিতে যেসব পুঁজিপতিরা আছে, সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের ক্ষতি থেকে নিজের সম্পত্তি বাঁচাবার জন্য তারা যতদূর যাওয়ার ততদূরই যাবে।[৩১] সুমিত সরকারের মতে, "এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, ভারতীয় ব্যাবসাদাররা অল্প কিছুদিনের জন্যে হয়তো সেই আন্দোলনকে গোপনে মদত জুগিয়েছিলেন যে-আন্দোলন (সহিংস হলেও) ব্রিটিশদের দ্রুত বার করে দিতে পারে। আর তারপরেই আসবে অন্য এক শান্তির সময়। এর বিকল্প ছিল পোড়া জমির নীতি, বোমাবর্ষণ আর প্রকৃত যুদ্ধের ফলে বাস্তুচ্যুতি তথা সম্পত্তিনাশ।"[৩২] তবে আন্দোলন যখন ব্রিটিশরা নির্মমভাবে দমন করল আর জাপানিদের অগ্রগতিও আসামের সীমান্তে এসে আটকে গেল,

তখন এই ব্যবসায়ীরা আবার ব্রিটিশের যুদ্ধপ্রয়াসকে সমর্থন জানিয়ে ফাটকা ও মুনাফার খেলায় মেতে উঠল।

এই সময়েই দাম বাড়তে থাকে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের। বাড়তে থাকে মুদ্রাস্ফীতি। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ অভাব-অনাহার-দুর্ভিক্ষ-আকালে ছেয়ে যায়। ১৯৩৯ সালে বাজারে ছাড়া ছিল ২৩০ কোটি টাকার নোট। ১৯৪৫-এ সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ১২১০ কোটি টাকার নোটে। স্টার্লিং ঋণের বাড়বাড়ন্ত ঘটেছিল এই সময়ে। ভবিষ্যতে মূল্য দিয়ে দেওয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি ছাড়াই ভোগ্যপণ্য ভারত থেকে ক্রমাগত আমদানি করছিল ব্রিটেন। রাশি রাশি কাগুজে মুদ্রা ছাপিয়ে ভারত থেকে দেশের ভেতর ও বাইরের যুদ্ধোদ্যোগে সরবরাহ অব্যাহত রাখা হচ্ছিল এর মাধ্যমে। ফলে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছিল। মুদ্রাস্ফীতি ও নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব উপনিবেশের গরীব মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছিল। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জুড়ে ভারতে যা বেড়েছিল তা উৎপাদন নয়, মুনাফা। সে মুনাফা এসেছিল মূলত ফাটকাবাজি, শেয়ার কেনা-বেচা ও কালোবাজারির মাধ্যমে। ১৯৪৩ সালে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে মুনাফাবাজি থেকে বাংলায় দেখা দেয় ভয়াবহ আকাল। খাদ্য শস্যের ঘাটতি ও দামের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে মিত্রপক্ষের বিপুল সৈন্য ভারতে এসে ঢোকে। দেশের মজুত খাদ্যের এক বড় অংশ সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় হতে থাকে। ব্রিটিশরা নিজেদের দেশে কঠোরভাবে সমতামূলক রেশন-ব্যবস্থা লাগু করে দক্ষভাবে যুদ্ধকালীন অর্থনীতি পরিচালনা করলেও উপনিবেশগুলিকে ছেড়ে দিয়েছিল কালোবাজারির হাতে। ভারতবর্ষ থেকে খাদ্যশস্যের জন্য অনুরোধ করা হলে তা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নস্যাৎ হয়ে যায়। ১৯৪৩-এর ১০ মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন,

> যুদ্ধ পরিবহণমন্ত্রীর কাছ থেকে আমি জেনে খুশি হলাম যে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্যের জন্য অনুরোধগুলিকে কড়াভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে। একটা দেশকে সুবিধা দিলে তৎক্ষণাৎ তা অন্যান্যদের দাবি জানাতে উৎসাহিত করে। তারা নিজেদের দেখাশোনা করতে শিখুক, আমরা যেমন করেছি।[৩৩]

যুদ্ধের সময়কালে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যত ধ্বসে পড়েছিল। বাংলার মানুষ বুঝতে পারছিল দুর্ভিক্ষ আসন্ন এবং সরকারী কোনো সাহায্যই সেক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না। ফলে জমির মালিকরা বেঁচে থাকার জন্য শস্য মজুত করতে লেগেছিল। অন্যদিকে অর্থপিশাচ দালালরা ফাটকাবাজির জন্য খাদ্যশস্য মজুত করছিল। আবার সরকার নিজেও মজুত করছিল যুদ্ধের প্রয়োজনে। এমনকি ক্ষেত থেকে ফসল লুঠ করার ঘটনাও দেখা গিয়েছিল বাংলায়। ফলে ব্রহ্মদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ হওয়া, অজন্মা, সেনাবাহিনী ও শ্রীলঙ্কায় রপ্তানির জন্য খাদ্যশস্যের মজুতদারি, এবং মুনাফার জন্য মজুতদারিতে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে ছিল বাংলায় সাইক্লোন, পঙ্গপালের আক্রমণ এবং মাদ্রাজে মৌসুমি বর্ষার অভাব। খাদ্য পরিস্থিতির এই সংকটকালেও দেখা গিয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি জারি রেখেছে ব্রিটিশ সরকার। যুদ্ধের আগে যেখানে ভারতে অন্তত দশ লক্ষ টন চাল ও গম আমদানি হত, সেখানে ১৯৪২-এর ১ এপ্রিল থেকে ১৯৪৩-এর মার্চ পর্যন্ত ভারত রপ্তানি করেছিল ২৬০০০০ টন চাল। সিংহল, আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা যেখানে যেখানে চাল ফুরিয়েছিল সেইসব জায়গায় ব্রিটিশদের প্রয়োজনে ভারত থেকে চাল রপ্তানি করা হতে থাকে। ফলে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার কোনো উপায় থাকে না। মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়ের মতে,

> যদি বাংলার ত্রাণ শিবিরগুলিতে প্রতিদিন প্রত্যেককে গড়ে আধ কিলো করে বন্টন করা হত, তাহলে ৩৯০০০০ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে ৭১০০০ টন মজুত রাখার প্রয়োজন ছিল। ৩৬০০০০ টন চাল এবং গম যদি একইভাবে ব্যবহার করা হত তাহলে প্রায় ২০ লক্ষকে বাঁচানো যেত।[৩৪]

সে বন্দোবস্ত করা হয়নি। বাংলার মানুষ দেখেছে জাহাজভর্তি অস্ট্রেলিয়ার গম ক্ষুধায় কাতর ভারতের পাশ দিয়ে চলে গেছে ভবিষ্যতে দক্ষিণ ইউরোপকে খোরাক জোগানোর প্রয়োজনে মজুত রাখতে।

দুর্ভিক্ষের ছবি ছিল নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম ও শরতে গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ পায়ে হেঁটে কলকাতায় চলে আসে, ভাত নয়, সামান্য ফ্যানের আশায়। কলকাতার রাস্তায় অনাহারে মরে পড়ে থাকে। মানুষের রাজনৈতিক স্বার্থে তৈরি হওয়া এই দুর্ভিক্ষে বাংলার পনেরো থেকে ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ যায়। অপুষ্টির ফলে ম্যালেরিয়া, কলেরা, গুটিবসন্তের মতো মহামারী দেখা দিতে থাকে। ১৯৪৩ এর কয়েক বছর পর অবধিও বাংলায় মৃত্যুসংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার তমলুক, কাঁথি, ডায়মন্ড হারবার অঞ্চল এবং ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি দুর্ভিক্ষে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। ধাক্কা খায় বাংলার ক্ষুদ্র কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। ১৯৪৩-এ প্রায় ৬ লক্ষ রায়ত তাদের জোত-জমি হারায়। এক বছরেই গবাদি পশুর সম্পদ ২০ শতাংশ কমে যায়। অবনী লাহিড়ী (১৯১৭-২০০৬) এই দুর্ভিক্ষের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন,

> নীলফামারিতে শত শত মানুষ মরেছে শহরের রাস্তায়। মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার লোক ছিল না। নীলফামারি মহকুমার যেখানে পরে তেভাগা

আন্দোলন হয়েছে— ডোমার, ডিমলা— এইসব অঞ্চলে এমন অবস্থা হয়েছিল যে মৃতদেহ রাস্তা থেকে সরিয়ে মাঠে ফেলার লোক ছিল না। আর দিনাজপুর যুক্তবাংলার ধানচালের একটা প্রধান ভাণ্ডার। কিন্তু সেখানেও আটোয়ারি অঞ্চলের তীব্র খাদ্যাভাব কৃষকদের ঘর ছাড়া করেছিল। সেদিন কি হল— সব খাদ্য উধাও হয়ে গেল।[৩৫]

ক্ষুধাপীড়িত গ্রাম বাংলায় সন্তান হত্যার মতো নিষ্ঠুর ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় বারবার। ১৯৪৩-এর ২৮ নভেম্বর *হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড* পত্রিকায় খবর বেরোয়, এক ব্যক্তি যাকেই দেখতে পায় তাকে নিজের শিশু কন্যাটি কিনে নিতে অনুরোধ করে।[৩৬] কেউ রাজি না হলে সে শিশুটিকে কুয়োয় ফেলে দেয়। ১৫ সেপ্টেম্বর *বিপ্লবী* পত্রিকায় লেখা হয়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাণ্ডা নামে ছোঙরা গ্রামের এক ব্যক্তি খিদেয় পাগল হয়ে পরিবারের সকলকে কেটে ফেলে।[৩৭] আত্মহনন এত সাধারণ ঘটনা হয়ে গিয়েছিল যে সংবাদপত্রে আর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হত না। কেবল নাম-ঠিকানা-তারিখ লিখে তালিকা প্রকাশ করা হত।

দুর্ভিক্ষ নিয়ে আসে মানসিক অবসাদগ্রস্ততা, বিষাদ, হতাশা এবং নৈতিক শিথিলতা। মায়েরা খুনিতে, গ্রামের সুন্দরী মহিলারা গণিকায়, বাবা মেয়ের চালানকারীতে পরিণত হয়েছিল অনেকক্ষেত্রে; কিন্তু ক্ষুধাপীড়িত মানুষদের সেভাবে দোকান থেকে খাবার লুটপাট করতে দেখা যায়নি, বেশিরভাগ দোকান অরক্ষিত অবস্থায় থাকলেও। এর কারণ অনেকে প্রাচ্যের ব্যাখ্যাতীত আচরণগত বৈশিষ্ট্য অদৃষ্টে বিশ্বাস বলে ভাবলেও, ত্রাণ আধিকারিক বিনয় রঞ্জন সেন (১৮৯৮-১৯৯৩) খাদ্য-দাঙ্গা না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেছেন,

> যখন একটা মন্বন্তর ব্যাপক রূপ নেয়, মানুষ এত শক্তিহীন হয়ে পড়ে যে, সেসময় যেখানে খাদ্য সরবরাহ করা হয় সেখানে গিয়ে হিংস্র হয়ে ওঠার মতো শারীরিক ক্ষমতা তাদের আর থাকে না।[৩৮]

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের একবছর পরেই গোটা বাংলা জুড়ে নেমে এসেছিল দুর্ভিক্ষের করাল থাবা। প্রবল নিগ্রহে ব্রিটিশরা আন্দোলন দমন করেছিল ঠিকই, তবু সে আগুন নেভার আগেই দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামে গ্রামে। অথচ আন্দোলনে তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি কোনো নতুন মাত্রা। অবনী লাহিড়ীর মতে, ভারত ছাড়ো আন্দোলন বা করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গের সংগ্রাম শুধু এক বছর পুরোদমে চলেছিল তা নয়, মহারাষ্ট্রের সাতারায় স্বাধীন পত্রী সরকার দুবছর টিকেছিল। সরযূ পান্ডের (১৯১৯-১৯৮৯) নেতৃত্বে আজমগড়ে সরকার গড়া হয়েছিল। এমনকি বাংলাতেও স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অথচ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, ৩০ লক্ষ গরীব ভূমিহীন কৃষক ও গ্রামীণ কারিগরের মৃত্যুর কোনো ছাপ সে আন্দোলনে পড়েনি। আন্দোলন নতুন কোনো বাঁকও নিতে পারেনি। কেবলমাত্র কমিউনিস্টরা সেই দুর্দিনে কৃষকদের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিল।[৩৯]

বোঝা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষ বাংলার বুকে নিয়ে এসেছিল এক গভীর হতাশা ও অবসাদ। এই হতাশার মধ্যেও দুটি ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছিল ইতিবাচক সাড়া। ফ্যাসিবাদের উত্থান ও বিশ্বজুড়ে তার তাণ্ডবের বিরুদ্ধে বাংলায় ক্রমশ একজোট হচ্ছিলেন লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকরা। প্রাথমিকভাবে তাদের যূথবদ্ধতা ধরা পড়তে থাকে 'ইয়ুথস্ কালচারাল ইনস্টিটিউট' বা Y.C.I-এর কাজকর্মের মাধ্যমে। ১৯৪১ সালের শুরুর দিকে তাদের কার্যালয় মিশন রো থেকে ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে প্রতিস্থাপিত হয়। চিন্মোহন সেহানবীশ (১৯১৩-১৯৮৭) বলছেন,

নামেই প্রকাশ Y.C.I ছিল তরুণদের সংস্কৃতি সংঘ। কিন্তু ওটি নিছক নাচগানের আড্ডা মাত্র ছিল না যদিও নাচগান যথেষ্টই ছিল, আর আড্ডাতো ছিলই প্রচুর মাত্রায়। তার কারণ সময়টা ছিল মহাযুদ্ধের তান্ডবে যখন পৃথিবী তোলপাড় আর উদ্যোক্তারা তরুণ হলেও যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিভীষিকা এবং ঐ দুই-এর নাড়ির যোগ সম্পর্কে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল ছিলেন অথচ ঐ সব ভয়াবহতা সত্ত্বেও তাঁরা মানবপ্রগতির সম্ভাবনায় আস্থা হারাননি।"[৪০]

Y.C.I-এ তার কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ওই বিপর্যয়ের কালপর্বেও মানবিক দৃষ্টি ও অনুভূতিগুলোকে সতেজ রাখার চেষ্টা করত। ছাত্রসমাজ ও তরুণদের মধ্যেই বিশেষ করে তারা তাদের ভাবনা ছড়িয়ে দিত। নানা বিষয়ে বক্তৃতা, বিতর্ক সভা, সাহিত্য সভার আয়োজন করত তারা।

১৯৪১ সালেরই ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলার বাহিনী ঝটিকা আক্রমণ চালায়। তার ছয়মাস পরেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাপানীদের অতর্কিত আক্রমণে কেঁপে ওঠে। একদিকে ফ্যাসিজমের বিশ্বজয়ের সম্ভাবনা অন্যদিকে সোভিয়েত-পতনের আশঙ্কা উভয় দিকের বিপদই আঁচ করেন এই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু দেশী জনমনের বিচারধারা তখন অন্যখাতে বইছিল। চিন্মোহন সেহানবিশের মতে,

তবু দেশের বুকে ব্রিটিশ আধিপত্যের নিদারুণ জগদ্দল পাষাণ চেপে থাকায় আমাদের দেশবাসীর আশ্চর্য সুস্থ অনাবিল জাতীয় চেতনাও যে সেদিন পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালায় দিগভ্রান্ত হয়েছিল অনেকখানি, এমন কি ফ্যাসিজমের বিপদকে ছোট করে দেখার ঝোঁকও যে দেখা গিয়েছিল কিছুটা— একথা অস্বীকার করার জো নেই।[৪১]

এই ধোঁয়াশার আবরণ সরিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে ইতিবাচক তথ্য তুলে ধরে জনমত গঠন করতে ১৯৪১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। সোভিয়েতের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বাংলার মানুষের পরিচয় হবার সুযোগ ছিল সামান্যই। সী কাস্টমস আইনের সতর্কতা ভেদ করে সোভিয়েতের আসল খবর কমই এসে পৌঁছাতে পারত। সেই সময় দাঁড়িয়ে এই সমিতি সোভিয়েতের খবর বাঙালির কাছে গ্রহণযোগ্য রূপে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিল। অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০—১৯৬১) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১–১৯৫৪) প্রমুখ।

এরপর 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক সংঘ' জন্ম নেয় ১৯৪২ সালে। যদিও আগে থেকেই 'ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা বাংলায় ছিল। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতাতেই 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন' হয়েছিল। কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে ১৯৩৯ সাল নাগাদ তা নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। এরপর ৮ মার্চ, ১৯৪২ সালে ঢাকার তরুণ লেখক সোমেন চন্দের (১৯২০–১৯৪২) হত্যা হয়, গুপ্ত আততায়ীদের হাতে। ঐ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ২৮ মার্চ ১৯৪২-এ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জন্ম নেয় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ'। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৮–১৯৭১), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়(১৯১৮–১৯৭০), বুদ্ধদেব বসু(১৯০৮–১৯৭৪), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী(১৯২৪–২০১৮), বিজন ভট্টাচার্য(১৯১৭–১৯৭৮), জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র(১৯১১–১৯৭৭), প্রেমেন্দ্র মিত্র সহ বাংলার অজস্র নামজাদা সাহিত্যিক। এরপর দীর্ঘকাল 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' নাম নিয়ে চলার পর ১৯৪৫ সালে সর্বভারতীয় সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরই নতুন নামকরণ হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। এরপর গণনাট্য সংঘও বিকশিত হয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে মার্কসীয় শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি, ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা, উপনিবেশের ধারণাকে নতুন করে দেখার মধ্য দিয়ে এই সংঘ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব তৈরি করেছিল লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে।

অপরদিকে গুরুত্বপূর্ণ সাড়া জাগিয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও ভারতবর্ষ ব্রিটিশের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সুভাষচন্দ্র বসু দেখেছিলেন ভারতীয়দের ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির এক বিরল সুযোগ হিসেবে। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার এইসময় দুর্বলতম অবস্থায় আছে তাই তার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলে ব্রিটিশদের উচ্ছেদ করার সেরা সময় এই মহাযুদ্ধের কালই— সুভাষচন্দ্রের এই মনোভাব কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকলে সুভাষচন্দ্র একাই ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘুরে মানুষের উদ্দীপনা জাগানোর চেষ্টা করেন। ফল আশাপ্রদ হয় না। এরপর বাংলায় ফিরে মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে হলওয়েল মনুমেন্ট ধ্বংসের জন্য গণআন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেন; কিন্তু তার আগেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রতিরক্ষা আইন অনুসারে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাকে মুক্তি দিলেও নজরবন্দী রাখা হয়। জার্মানের স্বৈরতন্ত্র ও জাতিবিদ্বেষের কর্মসূচী অপছন্দ করলেও সুভাষচন্দ্র মনে করতেন বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাব্য বিজয়ী তারাই। ফলে অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গতি দেওয়া সম্ভব। ১৯৪১ সালের ১৬-১৭ জানুয়ারি মধ্যরাতে সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে কলকাতা ত্যাগ করেন। কাবুল হয়ে রাশিয়ার মধ্য দিয়ে মার্চের শেষে বার্লিন পৌঁছান। হিটলারের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র 'আজাদ হিন্দ' বেতার কেন্দ্র চালু করার অনুমতি ছাড়া আর তেমন সাহায্য পাননি। উত্তর আফ্রিকার ধৃত ভারতীয়

যুদ্ধবন্দীদের সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল কেবল স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী তৈরি করতে। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে কোনো ঘোষণা জার্মানি থেকে মেলেনি।

অন্যদিকে জাপানের মাধ্যমে এশিয়ায় ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধে জাপানিরা এশিয়দের সহায়তার প্রস্তাব দেয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কেও উৎসাহ প্রকাশ করে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানের মেজর ইওয়াইচি ফুজিওয়ারা (১৯০৮–১৯৮৬) ও পাঞ্জাব রেজিমেন্টের জাপানিদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ক্যাপ্টেন মোহন সিং (১৯০৯–১৯৮৯) যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করে জাপানিদের সমান্তরালে ভারত অভিযানের পরিকল্পনায় ঐক্যমত হন। ১৯৪২ সালের জুন মাসে ভারতীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট লীগ গঠিত হয়, যে সংস্থা সেনাবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ করবে। এই সংস্থার কর্ণধার হন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু (১৮৮৬–১৯৪৫)। সেপ্টেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা I.N.A. কিন্তু জাপানিদের দ্বিচারিতা ও অসহযোগিতায় তা প্রাথমিকভাবে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি।

১৯৪৩ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছান ও জাপানের সাহায্যের নিশ্চয়তা পেয়ে অক্টোবর মাসে মুক্ত ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। জার্মানি, ইতালি সহ আটটি দেশ এই অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। সুভাষ চন্দ্র I.N.A. তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের শীর্ষ নেতৃত্ব হয়ে ওঠেন। ১৯৪৫ সালের মধ্যে এর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪০০০০। এই বাহিনী জাপানের সঙ্গে একযোগে বর্মার ভেতর দিয়ে ইম্ফলে এবং পরে আসামে প্রবেশ করার পরিকল্পনা করে। I.N.A.--এর দুই রেজিমেন্ট সহ জাপানের দক্ষিণবাহিনী ১৯৪৪ সালের ৮ মার্চ ইম্ফল অভিযান করে। কিন্তু বিমান শক্তির অভাব, নির্দেশ দানের ব্যাঘাত রসদ সরবরাহের

বিপর্যয়, মিত্রশক্তির আক্রমণ ও I.N.A.কে জাপানিদের সহযোগিতার অভাবে এই অভিযান ব্যর্থ হয়। এরপর আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়। সুভাষচন্দ্র তারপরেও সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায় সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়নি।

অভিযান ব্যর্থ হলেও, আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রচেষ্টা ও তার পরবর্তী ঘটনাক্রম ভারতের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। আত্মসমর্পণের পর ২০০০০ আজাদ হিন্দ সেনাকে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাদের কিছু অংশকে ছেড়ে দেওয়া কিংবা সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসন দেওয়া হলেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দেশপ্রেমিক আজাদ হিন্দের যোদ্ধাদের সামরিক আদালতে বিচার করা হয়। দিল্লীর লাল কেল্লায় তাদের প্রকাশ্যে বিচার করার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মনে আজাদ হিন্দ বাহিনী সম্পর্কে ভীতির মনোভাব তৈরি করা, কিন্তু এই বিচারের খবর যত প্রকাশিত হতে থাকে দেশের মানুষের কাছে ততই তারা দেশপ্রেমিক নায়ক বলে পরিগণিত হতে থাকে এবং তাদের বিচার বন্ধের দাবি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কংগ্রেসও এই দাবিতে মিলিত হয়। বন্দীমুক্তির দাবি ক্রমশ গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিতে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণি, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সমস্ত স্তরের মানুষ বিচার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। **১৯৪৫**-এর **৫** থেকে **১১** নভেম্বর আই.এন.এ. সপ্তাহ হিসেবে উদযাপিত হয়।

৭ নভেম্বর মাদুরাতে বিচার বিরোধী প্রতিবাদ সভায় পুলিশ গুলি চালালে আন্দোলন ক্রমশ জঙ্গি রূপ নিতে থাকে। ২১ থেকে ২৪ নভেম্বর কলকাতায় আমেরিকান ও ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলির ওপর আক্রমণ ঘটে। ছাত্র, ট্যাক্সিচালক, ট্রামশ্রমিকরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

বিক্ষোভকারীরা একসঙ্গে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা উড়িয়ে দেয়।

তিন দিন পর অবস্থা সরকারের আয়ত্তে আসে। তীব্র আন্দোলনের বেগে ১৯৪৬ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনীর যোদ্ধারা মুক্তি পায়; কিন্তু আবার ৪ ফেব্রুয়ারি ক্যাপটেন আবদুর রসিদকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলে ১১ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি মুসলীম লীগের ছাত্র শাখা, কমিউনিস্ট পরিচালিত ছাত্র সংগঠন ও শিল্প শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করে। আবার কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা একসঙ্গে ওড়ে। পরিবহন ধর্মঘট, শ্রমিক ধর্মঘট ও ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে রাস্তায় প্রায় গেরিলা কায়দায় সংঘর্ষে শহর কলকাতা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ব্রিটিশ বাহিনী ৮৪ জনকে হত্যা ও ৩০০ জনকে আহত করে। এই ঘটনার রেশ সমগ্র ভারতে সাড়া জাগায়। নৌবিদ্রোহকে প্রেরণা জোগায়। সেখানেও নাবিক ও শহরের সাধারণ মানুষদের পারস্পরিক সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ লড়াই বিপ্লবী সম্ভাবনা তৈরি করে।

একদিকে দুর্ভিক্ষ জনিত হতাশা, মৃত্যু মিছিল বাংলাকে দেখিয়েছিল বেঁচে থাকার নির্মমতা। মানুষের দৈনন্দিন বেঁচে থাকার ভিত দিয়েছিল নড়বড়ে করে। কঠোরতম বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিল বাঙালি। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসোন্মত্ততা, যা শেষ পর্যন্ত হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর পারমাণবিক বোমাবর্ষণে গিয়ে ঠেকে, তা বিজ্ঞানের উন্নতি কতটা কল্পনাতীত হতে পারে যেমন বুঝিয়ে দিয়েছিল, পাশাপাশি সে উন্নতির বীভৎসতা সম্পর্কেও আশঙ্কিত করেছিল বাঙালিকে। আবার ফ্যাসিবাদের ভয়াল উত্থান বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবৈষম্য ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালির মনে গণতন্ত্র ও সাম্যের ধারণাকে বহুলাংশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের লড়াই মার্কসীয় ধারণা তথা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আর্দ্র করেছিল বিপুলাংশের শিল্পী সাহিত্যিকদের মন। শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ বেড়েছিল সাহিত্যে। সাম্রাজ্যবাদ-

উপনিবেশ-শাসক-শাসিত সম্পর্কগুলিকে জরিপ করার দৃষ্টি হয়েছিল গভীরতর। এই পরিসরে রচিত হতে থাকা অভিযান সাহিত্যও তাই নতুন ধারণা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ সঙ্গে নিয়ে বাঁক বদল করেছিল অনেকক্ষেত্রেই। বিশ্বরাজনীতির অঙ্গন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দামতাকেও অভিযান সাহিত্য টেনে নিয়েছিল নিজের চৌহদ্দির মধ্যে।

নির্দেশিকা ও টীকা

১. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'ভূমিকা', *রচনাসমগ্র*-৩, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ-৪

২. ঐ, পৃ-৫

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজী, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস*, কারিগর, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-১০৭

৪. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৯, পৃ-১০১

৫. ঐ, পৃ-১০৪

৬. ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.), *সাময়িক পত্রের আলোকে প্রথম মহাযুদ্ধ*, পারুল, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-৭৮

৭. ঐ, পৃ-৯১

৮. ঐ, পৃ-২৮

৯. ঐ, পৃ-৮৬

১০. ঐ, পৃ-৬৩

১১. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-১৭০

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশী থেকে পার্টিশন ও তারপর*, রায়, কৃষ্ণেন্দু (অনু.), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৩৪২

১৩. ঐ, পৃ-৩৪৩

১৪. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-১৬৯

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশী থেকে পার্টিশন ও তারপর*, রায়, কৃষ্ণেন্দু (অনু.), দ্বিতীয় সংস্করণ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৩৪৩

১৬. ঐ, পৃ-৩৪৮

১৭. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-১৭৮

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জাপানে-পারস্যে', *রবীন্দ্ররচনাবলী,* দ্বাদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৯ পৃ-৪৪৮

উক্ত রচনায় রবীন্দ্রনাথ আরও বলবেন, "য়ুরোপের হিংস্রশক্তি যদিও আজ বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে, তৎসত্ত্বেও এশিয়ার মন থেকে আজ সেই ভয় ঘুচে গেছে যার সঙ্গে সম্ভ্রম মিশ্রিত ছিল। য়ুরোপের কাছে অগৌরব স্বীকার করা তার পক্ষে আজ অসম্ভব, কেননা, য়ুরোপের গৌরব তার মনে আজ অতি ক্ষীণ। সর্বত্রই সে ঈষৎ হেসেই জিজ্ঞাসা করছে, 'But the next best?'

আমরা আজ মানুষের ইতিহাসে যুগান্তরের সময়ে জন্মেছি। য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে হয়তো-বা পঞ্চম অঙ্কের দিকে পটপরিবর্তন হচ্ছে। এশিয়ার নবজাগরণের লক্ষণ এক দিগন্ত হতে আর-এক দিগন্তে ক্রমশই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানবলোকের উদয়গিরি শিখরে এই নবপ্রভাতের দৃশ্য দেখবার জিনিস বটে–এই মুক্তির দৃশ্য। মুক্তি কেবল বাইরের বন্ধন থেকে নয়, সুপ্তির বন্ধন থেকে, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের বন্ধন থেকে।"

১৯. ঐ

২০. মাৎসুলেনকো, ভিক্তর, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* পাল, বিজয় (অনু.), প্রগতি প্রকাশন, সোভিয়েত ইউনিয়িন, ১৯৮৭, পৃ-১৫

২১. ঐ, পৃ-১৭

২২. ঐ, পৃ-১৮

২৩. মুখোপাধ্যায়, মধুশ্রী, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র,* সুর, নিখিল এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ (অনু.), সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ-২৩

২৪. জার্মানির রণনীতি এই 'ব্লিৎসক্রিগ' বা ঝটিকা আক্রমণের কৌশলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই ধারণা অনুযায়ী, শত্রুর সশস্ত্র বাহিনী এবং সামরিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে পূর্বপ্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই যথা সম্ভব দ্রুত আক্রমণের মাধ্যমে জয় হাসিল করতে হবে।

২৫. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৩৯১

২৬. ঐ, পৃ-৩৯৩

২৭. ঐ, পৃ-৩৯৫

২৮. ঐ

২৯. ঐ

৩০. ঐ, পৃ-৪০০

৩১. ঐ

৩২. ঐ

৩৩. মুখোপাধ্যায়, মধুশ্রী, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র,* সুর, নিখিল এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ (অনু.), সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ-১২০

৩৪. ঐ, পৃ-১৪৬

৩৫. লাহিড়ী, অবনী, *তিরিশ চল্লিশের বাংলা,* সেরিবান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-৮০

৩৬. মুখোপাধ্যায়, মধুশ্রী, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র,* সুর, নিখিল এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ (অনু.), সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ-১৬৬

৩৭. ঐ

৩৮. ঐ, পৃ-১৭৬

৩৯. লাহিড়ী, অবনী, *তিরিশ চল্লিশের বাংলা,* সেরিবান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-৮০

৪০. সেহানবীশ, চিন্মোহন, *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে,* রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ-২

৪১. ঐ, পৃ-৪

তৃতীয় অধ্যায়

পথিকৃৎ হেমেন্দ্র কুমার রায় ও ঔপনিবেশিক গ্রস্ততা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাজাত অভিযান প্রকল্প সঙ্গে নিয়েই বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে হাত দেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র কথিত অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের অভাববোধ বাংলা সাহিত্যে পরিলক্ষিত হওয়া ও রাজশেখর বসু কর্তৃক অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা যে আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তার অভিঘাতে ঘটে চলা জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত তা অনুমান করতে পারা যায়। সেই প্রয়োজনের তাগিদ হেমেন্দ্রকুমারের কলমে প্রথম দিশা খুঁজে পায়। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অভিযান কাহিনিগুলির মধ্যে বিমল-কুমারের সিরিজ যেমন একদিকে চলতে থেকেছে, পাশাপাশি এসেছে জয়ন্ত-মানিকের গোয়েন্দা সিরিজ। মূলত গোয়েন্দা কাহিনি হলেও সেগুলি অ্যাডভেঞ্চারের পটভূমিতেই রচিত। এছাড়া 'আলেয়া' সিরিজও বাঙালির অ্যাডভেঞ্চারে আগ্রহের নমুনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবার 'দেড়শো খোকার কান্ড'-এর মতো স্বতন্ত্র উপন্যাসও বাংলা অভিযান সাহিত্যকে বিচিত্র পথগামী করে তুলেছে। বিশ শতকের অবিরাম ভাঙচুর ঘটতে থাকা বিশ্বমানচিত্র, প্রথম মহাযুদ্ধের অস্থিরতা, জীবনদর্শনের অবিরত পরিবর্তনশীলতা, বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার, স্বাধীনতা-উন্মুখ ভারতবর্ষের চালচিত্র হেমেন্দ্রকুমারের অভিযান সাহিত্যগুলিতে নির্মাণ করেছে সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ। একদিকে বাইরের পৃথিবীতে পা রাখতে অনভ্যস্ত বাঙালির অস্বস্তি অন্যদিকে সেই অনভ্যাসকে খণ্ডন করার আকাঙ্ক্ষা এ দুয়ের দ্বন্দ্ব হেমেন্দ্রকুমারের সাহিত্যকে যেন বিশ শতকের সমাজ-আয়নায় পরিণত করেছে। সিরিজগুলিকে খতিয়ে দেখব আমরা।

বিমল-কুমার সিরিজ:

বিমলা-কুমার সিরিজের সূত্রপাত হয় 'যকের ধন' উপন্যাসের মাধ্যমে। অভিযান কাহিনির গোড়াপত্তন করছেন যখন হেমেন্দ্রকুমার, তখন সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যে অভিযান কাহিনির কাঠামো নির্মাণ ও তাকে জনপ্রিয় করে তোলার তাগিদটি যেহেতু সময়ের চাহিদা হিসেবে উঠে আসছে, তাই বিচ্ছিন্ন অভিযান কাহিনি নয়, অভিযান-সিরিজ নির্মাণের চেষ্টাই করতে দেখা যায় তাকে। সিরিজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিষয়গত ও চরিত্রগত এক অন্তর্লীন যোগসূত্র যেহেতু অনিবার্য, তাই একক কাহিনিতে নয়, সমগ্র সিরিজ জুড়ে এক অভিযান নায়কের কাঠামো গড়ে তুলতে হয়েছে লেখককে। অভিযান কাহিনি যেহেতু বাধা-বিপত্তি, ভাগ্য, প্রতিকূলতা, বিপদের বিরুদ্ধে মানুষের জয়যাত্রার বীরত্বব্যঞ্জক গল্প, তাই অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসে নায়কের উপস্থিতি অনিবার্য। নায়কের মাধ্যমেই বিপদ লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা, সাহস ও সংকল্প জারিত হয় পাঠকের মধ্যে। জন ল্যাম্ব ল্যাস (১৯৪৫—) তাঁর *The Hero : Manhood and Power* (১৯৯৫) গ্রন্থে নায়ককে সংজ্ঞায়িত করে বলেন,

> The hero possessed a consistent capacity for action that surpasses the norm of man or woman. This contrast between what may be heroic in action and what identifies a hero in the purest sense of the term is essential. Both morally and physically, the hero is nevertheless of the human species, not superior to it, not beyond it.[১]

সাধারণ মানুষ হয়েও নায়ক তার সাহস, বুদ্ধি, জ্ঞান, কায়িক শক্তি ও ইন্দ্রিয়সতর্কতার মাধ্যমে হয়ে ওঠে অজেয়, কোনো অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন না হয়েই। অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন

নায়করা অতিনায়ক বা সুপারহিরো হিসেবে চিহ্নিত হয়। বাংলা অভিযান উপন্যাসে কিন্তু অতিনায়ক নয়, 'ordinery hero' বা সাধারণ নায়কের উপস্থিতিই দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা অভিযান কাহিনির প্রথম নায়ক বিমল। শুরু থেকেই লেখক তার মধ্যে এঁকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নায়কের যাবতীয় লক্ষণ। 'যকের ধন' উপন্যাসের কথক কুমারের মাধ্যমে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে বিমলের সঙ্গে। মরার মাথার খুলিতে যখের ধনের সংকেত ও খাসিয়া পাহাড়ে তার অস্তিত্বের কথা জানতে পারার পর দিশেহারা কুমারের মনে পড়ে তার বন্ধু বিমলের কথা—

> হঠাৎ মনে হল বিমলের কথা। বিমল আমার প্রাণের বন্ধু, আমাদের পাড়ার ছেলে। আমার চেয়ে সে বয়সে বছর তিনেকের বড়, এ বৎসর বি-এ দেবে। বিমলের মতো চালাক ছেলে আমি আর দুটি দেখিনি। তার গায়েও অসুরের মতো জোর, রোজ সে কুস্তি লড়ে— দুশ ডন, তিনশ বৈঠক দেয়। তার উপরে এই বয়সেই সে অনেক দেশ বেড়িয়ে এসেছে।[২]

প্রাথমিক এই পরিচয়েই তিনটি গুণ পাঠকের গোচরে চলে আসে— বুদ্ধি, দৈহিক শক্তি ও অভিজ্ঞতা, যা বিমলকে নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এরপর উপন্যাস জুড়ে বারবার বিমলের এই বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় পেতে দেখা যায়। তা কুমারের মাধ্যমে প্রশংসিত হয়ে পাঠকের কাছেও পৌঁছায় অনুকরণীয় রূপে। শত্রুর হাত থেকে বিমলের গুপ্তধনের সংকেত বাঁচিয়ে রাখার কৌশলে মুগ্ধ হয়ে কুমার বলে, "বিমল ধন্যি তোমার বুদ্ধি! তুমি যে এত ভেবে কাজ কর, আমি তা জানতুম না।"[৩] আবার গুপ্তধনের কাছে এসে বিমল পাহাড়ের খাদ পেরিয়ে যাওয়ার কৌশল বুঝিয়ে দিলে কুমার বলে, "বিমল, তুমি হচ্ছ বুদ্ধির বৃহস্পতি। তোমার কাছে

আমরা এক একটি গরু বিশেষ।"[৪] বিমলের ইন্দ্রিয় সতর্কতারও তারিফ পাওয়া যায় কুমারের বর্ণনায়—

> কিন্তু কি সতর্ক আমার বন্ধু বিমল! সে যেন যে-কোন মুহূর্তেই এইরকম বিপদের জন্যেই প্রস্তুত ছিল, কারণ মুখখানাকে আমরা ভালো করে দেখবার আগেই গর্জন করে উঠল তার হাতের বন্দুক— একবার নয়, দু'বার![৫]

বিমলের অদম্য জেদের পরিচয়ও প্রথম উপন্যাসেই ধরা থাকে যখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও বিমল বলে, "এত সহজেই যদি হাল ছেড়ে দেব, তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন?"[৬] গোটা উপন্যাস জুড়ে বিমলের বিপদের সঙ্গে যোঝবার সাহস ও শক্তি তারিফ জাগায় কুমারের মনে। আর বাঙালি শিশু-কিশোর পাঠকদের কাছে বিমল হয়ে উঠতে থাকে আদর্শ চরিত্র।

শুধু প্রথম উপন্যাসেই নয়, গোটা সিরিজে বারবার বিমলের এই নায়কোচিত বীরত্ব সামনে এসেছে। আর তার সহযাত্রী চরিত্রদের মনে এসেছে বিমল সম্পর্কে মুগ্ধতা। পরবর্তী 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' (১৯৩৩) উপন্যাসে বিমল-কুমারের সঙ্গে আলাপ হয় বিনয়বাবুর। প্রথম পরিচয়েই বিমলের শারীরিক সক্ষমতা বিনয় বাবুর নজরে আসে—

> বাংলোর বারান্দায় উঠে বিনয়বাবু দেখলেন, সেখানে দুটি যুবক দু-খানা চেয়ারের উপর বসে আছে। তার মধ্যে একটি যুবকের দেহ যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। দেখলেই বুঝতে দেরি লাগে না যে, তার দেহে অসুরের মতন ক্ষমতা।[৭]

কিছুক্ষণে জানতে পারেন ছেলেদুটির নাম বিমলচন্দ্র রায় ও কুমারনাথ সেন। বিমল-কুমারের সম্পূর্ণ নামও জানা হয়ে যায় পাঠকের। আবার 'ময়নামতীর মায়াকানন' (১৯৪০) উপন্যাসে

অরণ্যের অজানা বিভীষিকায় সকলে যখন আতঙ্কগ্রস্ত বিমল তখনও সাহস করে বলে, "চুপিচুপি ওখানে গিয়ে আমি একবার দেখে আসব কি?"[৮] বিমলের এই সাহসিকতার পরিচয়ে বারবার মুগ্ধ হন বিনয়বাবু। এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বিনয়বাবুকে ফেলে পালাতে কিছুতেই রাজী হয় না বিমল— "মরতে হয় তো দুজনেই একসঙ্গে মরব, কিন্তু আপনাকে ফেলে কিছুতেই আমি পালাতে পারব না।"[৯] বিমলের সাহস ও বীরত্বকে এতটাই প্রত্যক্ষভাবে দাগিয়ে দিতে চান লেখক, যে 'ময়নামতীর মায়াকানন'-এ একটি অধ্যায়ের শিরোনামই হয়ে দাঁড়ায় 'বিমলের বীরত্ব'[১০]। ময়নামতীর মায়াকাননে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের আবিষ্কার করার পর সেই আবিষ্কারের খবর নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে কিনা তাই নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে বিনয়বাবু নিশ্চিন্তে জানান, "তোমার মতো বীর যখন আমাদের মধ্যে আছে, তখন আমরা এদেশ থেকে বিজয়ীর মতো ফিরতে পারব না কেন বিমল?"[১১] আবার বিমলের কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয়ও পাওয়া যায় বিনয়বাবুর বয়ানে,

> কিন্তু ধন্য বটে বিমল ছেলেটি, সেও যে ভিতরে-ভিতরে আমাদেরই মতো কষ্ট পাচ্ছে তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মুখে-চোখে বা ভাবভঙ্গিতে সে কষ্টের কোনও লক্ষণই ফুটে ওঠেনি, ধীর প্রশান্তভাবে হাসিমুখে সে আমাদের আগে-আগে অগ্রসর হচ্ছে।[১২]

গোটা সিরিজ জুড়েই বিমলের এই বীরত্ব, সাহস, শক্তি ও তেজের অজস্র প্রমাণ হাজির করবেন লেখক। বিমলকে সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ করে তুলতে চাইবেন। 'যক্ষপতির রত্নপুরী'তে (১৯৪৩) বিমলের নিজের বয়ানেই শোনা যায়, "অনেকে অভিযোগ করেন, আমার জীবন নাকি অস্বাভাবিক। তাঁদের মতে, স্বাভাবিক মানুষের জীবন এমন ঘটনাবহুল হতে পারে না।"[১৩] কিন্তু এই অস্বাভাবিকতার যুক্তিকে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯–১৮২১) কিংবা বেনভেনুতো

শেলিনির (১৫০০-১৫৭১) জীবনের উদাহরণের মাধ্যমে খণ্ডন করে বিমল বোঝাতে চায়, "এক-একজন মানুষের জীবনই হচ্ছে এমনি বিচিত্র! হয় ঘটনাপ্রবাহ আকর্ষণ করে তাদের জীবনকে, নয় জীবনই আকর্ষণ করে ঘটনাপ্রবাহকে।"[১৪] জীবন অভিজ্ঞতার অসামান্যতাও বিমলকে অতিসাধারণ থেকে অসাধারণে উত্তীর্ণ করার প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সিরিজে। লস্ট আটলান্টিস আবিষ্কার (নীল সায়রের অচীনপুরে), মঙ্গলগ্রহের অভিজ্ঞতা (মেঘ দূতের মর্ত্যে আগমন), প্রাগৈতিহাসিক জীবেদের দ্বীপে পৌঁছানো (ময়নামতীর মায়াকানন), আফ্রিকায় অভিযান (আবার যখের ধন-১৯৩৩), আফগানিস্তানে অভিযান (যক্ষপতির রত্নপুরী) ইনকাদের দেশে অভিযান (সূর্যনগরীর গুপ্তধন-১৯৬০), ডক্টর মোরোর দ্বীপে অভিযান (প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ) বিমলকে ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে দূর দূরান্তে নিয়ে গিয়েছে যেমন, পাঠকের কাছে মেলে ধরেছে বিশ্ব তথা মহাবিশ্বের দরজা; তেমনই 'যখের ধন', 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' (১৯৫৭), 'অসম্ভবের দেশে' (১৯৩৭), 'সুন্দরবনের রক্তপাগল' (১৯৪৭), 'কুমারের বাঘা গোয়েন্দা'-এর মতো উপন্যাসগুলিতে ভারতবর্ষের আনাচে কানাচেই এনে দিয়েছে ভয়ংকরের অভিজ্ঞতা, যে রোমাঞ্চের অভিজ্ঞতা থেকে বাঙালি সরে থেকে ছিল এতদিন। অভিজ্ঞতার এই অসামান্যতার কথা বিমলকেও সঙ্গী কুমারকে উদ্দেশ্য করে বলতে শোনা যায় 'প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ' উপন্যাসে—

> পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা লোকই যে সব ব্যাপারকে অদ্ভুত বলে মনে করে, তার মধ্যে আমি কিছুমাত্র অদ্ভুতত্ব খুঁজে পাই না। কিন্তু তোমার-আমার কথা স্বতন্ত্র। এই জীবনেই আমরা এমন সব অসাধারণ ব্যাপার দেখেছি যে, আমাদের কাছে বোধহয় অদ্ভুত বলে আর কিছুই থাকতে পারে না।[১৫]

অভিজ্ঞতার এই অসামান্যতা কোন সময়ে ঘটছে, অর্থাৎ কাহিনির কথনকালটিও গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালির কাছে প্রথম মহাযুদ্ধই এনেছিল বৃহত্তর পৃথিবীর খোঁজ। দূরান্তের হাতছানি। তার আগে সীমাবদ্ধ ছিল বাঙালির জগতের বেষ্টনী। বিমল-কুমারের প্রথম অভিযান কিন্তু ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হবার অনেক আগেই। 'নীল সায়রের অচীনপুরে' উপন্যাস থেকে আমরা জানতে পারি বিমলরা মঙ্গলগ্রহে গিয়েছিল ১৯১৪ সালে, অর্থাৎ 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাসের কথনকাল ১৯১৪ সাল। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার বছর। আবার 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাসে যখন 'যকের ধন' উপন্যাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিনয়বাবু জিজ্ঞাসা করেন বিমলরা সত্যিই খাসিয়া পাহাড়ের অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছিল কিনা, তখন বিমল জানায় "নিশ্চয়! কিন্তু সে আজ পাঁচ-ছয় বছর আগেকার কথা।"[১৬] অর্থাৎ বিমলদের প্রথম অভিযানের সময়কাল ১৯০৮-১৯০৯ সাল। বাঙালির কাছে যখন অজানার ডাকে বেরিয়ে পড়ার, বৃহত্তর পৃথিবীকে জানার প্রথম বিশ্বযুদ্ধজাত আহ্বান এসে পৌঁছায়নি, লেখক সেইসময়ের চরিত্র হিসেবে বিমলকে নির্মাণ করছেন এক বিপদভয়হীন অভিযাত্রী হিসেবে। সময়ের থেকে তাকেএগিয়ে রাখছেন। যা বিমলকে করে তুলছে বিস্ময়-নায়ক।

এখন প্রশ্ন হল, এই নায়ক চরিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্য কী? নায়ক সেই, যার মধ্যে সময় ও জাতির চাহিদাগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। জন ল্যাম্ব ল্যাস বলবেন,

> In excelling and exceeding himself, the hero becomes a model of higher potential for his clan, his race, his nation, and even for humanity at large.[১৭]

সময়ের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে করতে নায়ক হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে অনুসরণযোগ্য, আদর্শ চরিত্র। নায়কের দৃষ্টিকোণই হয়ে ওঠে কাহিনির নীতিগত অবস্থান। মার্গারে হোরিহান (1935—) তাঁর *Deconstructing the Hero* (1997) গ্রন্থে বলবেন,

> Becouse hero tales are narrated from the hero's point of view, and because he occupies the foreground of the story the reader is invited to share his values and admire his actions.[১৮]

এই অনুসরণযোগ্য হয়ে ওঠা সম্ভব হয় সমসময়ের তুলনায় তার শক্তি ও সম্ভাব্যতা বেশি হওয়ার ফলেই। সাধারণের অপ্রাপনীয় আকাঙ্ক্ষা যা, নায়কের কাছে নয় তা চির-অপ্রাপ্য। ফলে নায়কের কর্ম ও ফলপ্রাপ্তির মধ্যে পাঠক খুঁজে পায় নিজেরই ইচ্ছাপূরণের কাহিনি। খেয়াল রাখা দরকার, নায়ক যা অনায়াসে করতে পারে বা তার পক্ষে করা সম্ভব হয়, তা যেমন পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয় করে উঠতে পারা— ফলে নায়ক থেকে যায় পাঠকের থেকে উচ্চতর অবস্থানে, তেমনই পাঠকের কাছে স্বীকৃত নৈতিক অবস্থানগুলিই দৃঢ়ভাবে ধারণ করে রাখে নায়ক। নয়তো হয়ে উঠবে না সে পাঠকের কাছে প্রিয় ও অনুসরণযোগ্য। ফলে নায়ক যেমন প্রভাবিত করে পাঠককে, তেমনই নায়কও প্রভাবিত থেকে যায় পাঠকের তথা সমসময়ের সামাজিক চাহিদা ও নীতিগত অবস্থানগুলির দ্বারা। বিমল চরিত্রকে নির্মাণের ক্ষেত্রেও সমসময়ের চাহিদা প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচালনা করেছিল লেখকের কলমকে। বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি স্থাণুত্বে মুহ্যমান বাঙালির কাছে গতির রূপকে চিনিয়ে দেয়, চিনিয়ে দেয় বৃহত্তর এক পৃথিবীকে, যেখানে শক্তির রমরমা। বৃহত্তর সেই জগতকে জেনেবুঝে নিতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল বাঙালির মধ্যে। চারিপাশের গতির তীব্রতার মধ্যে নিজের জড়ত্বকে আবিষ্কার করে অস্থির হয়ে ওঠা বাঙালির নিজের অবস্থান সম্পর্কে অসন্তোষই ধ্বনিত হয় বিমলের কথায়— "পৃথিবীটা বেজায়

একঘেয়ে হয়ে উঠেছে!"[১৯] এই একঘেয়ে হয়ে ওঠা পৃথিবী আসলে বাঙালিরই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় জীবনের চিহ্ন, বাঙালিরই মানসবিশ্ব, যাকে নাকচ করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে বিমল। বাঙালির পক্ষে সম্ভব হয় না যা, অথচ বাঙালির যেমনটা হয়ে ওঠার আশা করেন লেখক, তার জন্যই তিনি প্রস্তুত করতে চান বাঙালি কিশোরের চরিত্র। বিমল-কুমার চরিত্রগুলি নির্মাণের উদ্দেশ্যই তা। লেখকের ভাষায়,

> বাঙালী ছেলেদের দেহের সঙ্গে মনও যাতে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, স্বদেশকে ভালোবেসেও তাদের চিত্ত যাতে বিপুল বিশ্বের জলে-স্থলে-শূন্যে বেপরোয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, মৃত্যুবন্ধুর বিপদের পন্থায় তাদের আনন্দের উৎস যাতে অসঙ্কোচে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, নানা বিরোধী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেও সমান অটল থেকে তারা যাতে নিজেদের জীবন গঠন করতে শেখে, আমার এ-শ্রেণির অর্থাৎ যকের ধন, আবার যখের ধন, মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন উপন্যাস রচনার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই।[২০]

বাঙালি কিশোরের এই চরিত্র নির্মাণ করার জন্য তাদের কাছে অনুকরণীয় মডেলরূপে উপস্থাপিত বিমলের মুখ দিয়ে লেখক বলান,

> যে-সব বিপদ-আপদের কথা বললে, আমি বাঙালীর ছেলে, সে-সব বিপদ-আপদকে আমি একটুও গ্রাহ্য করি না। বিপদকে আমি ভালবাসি, ছুটে গিয়ে বিপদের ভেতরে আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই।"[২১]

বিমলের বিপদভয়হীন মনোভাব, সঞ্চারিত হোক, বাঙালি কিশোর পাঠকের মধ্যে এ আকাঙ্ক্ষা গোপন থাকে না লেখকের।

একদিকে যেমন বিপদের রোমাঞ্চকে স্থির প্রত্যয়ে উপভোগের আকাঙ্ক্ষা তেমনই বাইরের পৃথিবীর অনাস্বাদিত বৈচিত্র্যকে জানার আগ্রহ যুগপৎ কাজ করেছে নায়কের চরিত্র নির্মাণে।

নায়কের মধ্য দিয়েই তা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে ক্রমশ। 'যকের ধন' উপন্যাসে প্রাথমিক ভয়ভীতি কাটিয়ে ওঠার পর আসামের জঙ্গলে যাওয়া যখন নিশ্চিত হয়, তখন কুমারের মনোভঙ্গি আমরা জানতে পারি,

> মনে ভয় হচ্ছিল বটে, আনন্দও হচ্ছিল খুব। নতুন নতুন দেশ দেখবার সাধ আমার চিরকাল। কেতাবে নানা দেশের ছবি দেখে আর গল্প পড়ে সেসব দেশে যাবার জন্যে আমার মন যেন উড়ু উড়ু করত।[২২]

বাঙালির চেনামহলের বাইরে পা রাখার আগ্রহই কুমারের মাধ্যমে প্রকাশিত এখানে। এই সাধ পূরণ হওয়া সম্ভব হয় নায়কের উপস্থিতির ফলেই। কুমারকে প্রথম অভিযানে যেতে রাজি করানো এবং প্রেরণা যোগানোর কাজও করেছে বিমলই। শেষ অবধি নায়ক বিমলের ভরসাতেই কুমারের বেরিয়ে পড়া—

> আমি বিমলকে ভালরকম চিনি। সে মিছে জাঁক কাকে বলে জানে না। সে যখন আমাকে অভয় দিচ্ছে, তখন মনে মনে নিশ্চয় কোন একটা নূতন উপায় ঠিক করেছে। কাজেই আমিও নিশ্চিন্ত মনে বললুম, 'আচ্ছা ভাই, তুমি যা বল আমি তাতেই রাজি!'[২৩]

বিমল নিজে অভিযানকারী হয়েই থাকেনি শুধু, হয়ে উঠেছে অভিযানের প্রণোদনা।

কেবল অজানা বিপদে বেরিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষাই মূর্ত হয় না অভিযান নায়কের মাধ্যমে, দিশা পায় সমসময়ের নৈতিক আকাঙ্ক্ষাও। নায়কের নৈতিকতা হোমারের (৯২৮ খৃস্টপূর্বাব্দ-?) সময়ের থেকে প্লেটোর (৪২৮খৃস্টপূর্বাব্দ—৩৪৮খৃস্টপূর্বাব্দ) মাধ্যমে ও তারপরে রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) হাত ধরে কীভবে পরিবর্তিত হয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন ডোমিনিক স্টিফেনসন। তাঁর মতে, "the Homeric heroes are comunity leaders whose

individual brilliance serves primarily themselves."[২৪] তাঁর মতে হোমারিও নায়করা আত্মসংযমহীন এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে কোনো সমস্বার্থে যুক্ত থাকার প্রবণতা— যা ব্যক্তিকে নাগরিক করে তোলে, তা তাদের মধ্যে দেখা যায় না।[২৫] এই সংযমহীন ও সমাজ বা স্বগোষ্ঠীর প্রতি দায়হীন একক-নায়ক ক্রমশ প্লেটোর মাধ্যমে পরিণত হয় নাগরিকতার বোধযুক্ত নায়কে— "Plato politicises the notion of heroism by compelling the heroic philosopher to enter into the service of the state. Plato transforms the heroic man into a citizen."[২৬] প্লেটোর মাধ্যমে নায়ক হয়ে ওঠে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, যা মানবসভ্যতার অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নায়কভাবনার রাজনীতিকরণ ঘটে। যদিও পেল্টোর নায়কত্বের ধারণা থেকে যায় হোমারের মতোই উচ্চবর্গীয়, শাসনক্ষম ও অভিজাত। রুশোর বিচারই প্রথম সেই নায়ককে করে তোলে আধুনিক নৈতিকতা সম্পন্ন। যুক্ত হয় গণতন্ত্রের ধারণা। ডোমিনিক স্টিফেনসন বলবেন,

> By extending the ideal of heroic achievement to all citizens, Rousseau moulds heroes into citizens that fit into a sense of citizenship based on modern principles of equality and democracy, principles that Rousseau did as much as anyone to establish in the lexicon of mainstream political discourse.[২৭]

হেমেন্দ্রকুমার রায় যখন পরিকল্পনা করছেন বিমল-কুমারের মতো চরিত্রদের, তার অনেক আগে থেকেই ইংরাজি শিক্ষার প্রচলনের মাধ্যমে বাঙালির কাছে পৌঁছে গিয়েছে ইউরোপজাত ধারণা, দর্শন ও সাহিত্যের বোধ। ফলে আধুনিক নায়কের এই বিবর্তিত চেহারার হদিশ অনায়াসেই মিলবে হেমেন্দ্রকুমারের নায়কভাবনায়। বাঙালি প্রথম অভিযান নায়ক হিসাবে তিনি নির্মাণ করবেন বিমলকে। বিমলের ক্রিয়াকলাপে ও বচনে মূর্ত হয়ে উঠবে সেইসময়ের

বঙ্গমানসে আকাঙ্ক্ষিত নৈতিক ধারণাগুলি। খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাব, হোমারীয় নায়কের অসংযম যেমন মাথাচাড়া দেবে বিমলের মধ্যে মাঝেমাঝেই, তেমনই রুশোর সমতা ও গণতন্ত্রের ধারণা থেকেও বঞ্চিত থাকবে না বিমল। নিজ কায়িক শক্তির প্রতি আস্থাশীল বিমলকে হিংস্র হয়ে উঠতে দেখা যায় মাঝেমাঝেই। অপর সম্পর্কে একরকম উন্নাসিকতাও বাদ থাকে না তার কথায়। বিমলের বীরত্বে মুগ্ধ হয়েও বিনয়বাবু সেইজন্য থেকে থেকে বিমলের সমালোচনা করতে ছাড়েন না। 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাসে মঙ্গলগ্রহের জীবদের সম্পর্কে ঘৃণাভরে বিমল যখন বলে, "ওই নগণ্য বামন-জানোয়ারগুলো যে এমন সব অসাধ্য সাধন করতে পারে, তা তো আমার বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হচ্ছে না!"[২৮] বিনয়বাবু সতর্ক করেন বিমলকে– "বিমল, পৃথিবীর মানুষের মতো চেহারা না হলেই কোনও জীবকে যে মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণির বলে মানতে হবে, তার কোনও মানে নেই। অথচ তুমি বারবার সেই ভ্রম করছ।"[২৯] আবার 'নীল সায়রের অচীনপুরে' উপন্যাসে হারানো আটলান্টিসের মানুষদের আবিষ্কারের পর বিমল তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে উদ্যত হলে বিনয়বাবু বিমলকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন, "ওরা যে অদ্ভুত এক প্রাচীন জাতির দুর্লভ নমুনা!"[৩০] কিন্তু রণোন্মাদ হয়ে উঠতে থাকা বিমল স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, "রাখুন মশাই আপনার প্রাচীন জাতির দুর্লভ নমুনা! আপনি কি বলতে চান, ওরা নির্বিবাদে এখানে এসে আমাদের এই আধুনিক মানবজাতির নমুনাগুলিকে দুনিয়া থেকে লুপ্ত করে দিক? মাপ করবেন, এতটা উদার হতে পারব না।"[৩১] এরপর ক্রমাগত সেই মানুষদের গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করতে করতে উল্লসিত বিমল ঘোষণা করে, "ব্যাস। বন্দুক কী চিজ এইবারে ওরা বুঝে গেছে।"[৩২] বিমলের এমন শক্তি-উন্মাদ হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত অনায়াসেই বাড়িয়ে তোলা যায় আরও। হোমারীয় নায়কদের সম্পর্কে স্টিফেনসন বলবেন, "the Homeric hero says what he thinks and does what he

says. He is transparent. He is never bogged down in a mire of introspection or self doubt."[৩৩] বিমলের এই দ্বিধাহীনতার নজির যেমন ফুটে ওঠে তার বক্তব্যে ও কর্মকাণ্ডে, তেমনই কোথাও কোথাও তা বিমলকে নিষ্ঠুর বলেও প্রতিপন্ন করে।

এই হোমারীয় নায়কত্বের পাশাপাশি বিমলের মধ্যে রুশোর আধুনিকতার ধারণা সঞ্জাত নায়কের মূর্তিও ফুটে ওঠে বারবার। সেখানে বিমলের মাধ্যমে আভাসিত হতে থাকে বাঙালির রাজনৈতিক সত্তা ও জাতীয়তাবাদের চেহারা। বিমল তখন ব্যক্তি নায়কের কাঠামো থেকে বেরিয়ে হয়ে ওঠে জাতির আদর্শস্থানীয়। 'আবার যখের ধন' উপন্যাসে আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর মানিকবাবুর দেশের জন্য মনকেমন নিয়ে কুমার কটাক্ষ করলে বিমল বলে, "দেশ ছাড়তে যার মনে দুঃখ হয় না, আমি তাকে ঘৃণা করি। যে-দেশের মাটি আমাকে শয়নের শয্যা পেতে দিয়েচে, ক্ষুধায় ফল-ফসল জুগিয়েচে, তেষ্টায় অমৃতের মতন মিষ্টি জল দান করেচে—যে-দেশের বাতাস আমার নিঃশ্বাস হয়েচে, যে দেশের আকাশ সূর্য-চাঁদের আলো জ্বেলে আমার চোখে দৃষ্টি দিয়েচে, সে-দেশকে ছাড়তে প্রাণ যে না কেঁদে পারে না।"[৩৪] বাংলায় বিশ শতকে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদের সুর ধরা থাকে বিমলের কথায়। আবার রামহরি যখন বলে "দেশকে যদি অতই ভালোবাসো, তাহলে দেশ ছেড়ে আবার বিদেশে যাওয়া কেন বাপু?"[৩৫] তখন রামহরিকে মস্করা করার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় দেশকে ভালোবাসা ও বৃহত্তর পৃথিবীর আস্বাদ গ্রহণের মধ্যে বিরোধ নেই কোনো।

রুশো পরবর্তী নায়কের কেবল কর্মকান্ড কিংবা সাহসিকতাই নয়, নৈতিক অবস্থানও হয়ে উঠবে অনুসরণযোগ্য। সে কারণেই বিপদে অটুট প্রত্যয় বজায় রাখা বিমলকে আমরা দেখি সহযাত্রী তথা বন্ধুদের বিপদে মরণপণ লড়াই করতে বিনয়বাবু কিংবা কুমারকে বিপদের মুখ থেকে বাঁচিয়ে আনতে বারবার বিপদের ঝুঁকি নেয় বিমল। এককের সাহসিকতায় নয়, নাগরিকের

দায়িত্বে বীরত্বের ছাপ রাখতে বদ্ধপরিকর থাকে সে। গুপ্তধনের খোঁজে বারবার ছুটে গেলেও আসলে তার পিছনে অর্থলিপ্সা যে নেই সে কথা সোচ্চারে ঘোষণা করে বিমল। 'আবার যখের ধন' উপন্যাসে মানিকবাবুকে উদ্দেশ্য করে জানায় বিমল, "আপনার জন্যে সেখানে গুপ্তধন আছে, আর আমাদের জন্যে আছে বিপদ— কেবল বিপদ। আপনার গুপ্তধনের ওপরে আমাদের কোন লোভ নেই, আমরা চাই খালি বিপদকে! সে বিপদ হবে যত ভয়ানক, আমাদের আনন্দ হবে তত বেশি।"[৩৬] আবার 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন' উপন্যাসে বিনয়বাবুকে উদ্দেশ্য করে বলে বিমল, "গুপ্তধনের দোহাই দিয়ে আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছি বটে, কিন্তু টাকার দুঃস্বপ্ন একবারও দেখিনি! আপনি কি জানেন না, আমাদের রক্তে মেশানো আছে দুর্গম পথের নেশা, অজানা বিপদের টান আর অদেখা নূতনের আনন্দ?"[৩৭] অর্থের প্রতি আগ্রহহীন করে তুলে কিশোর পাঠকের কাছে নায়ক বিমলের বিপদের নেশাকে আরও বেশি দাগিয়ে দিতে চান লেখক, যাতে প্রেরণাপ্রাপ্ত হয় নবীন পাঠক। তবু শুধু কি এটুকুই? এ প্রসঙ্গে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন—

"পরকবলিত চৈতন্যমুক্ত করার তাগিদে, পাশ্চাত্য আদর্শকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে, বানানো হয় আরেক ধরনের মিথ।

সেই মিথ অনুযায়ী, জড়বাদী, ভোগলিপ্সু পশ্চিমের বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে ভোগবিমুখ, সনাতন 'ভারতবর্ষ'। ভারতের এই কল্পরূপটি যেহেতু অনেকখানি গড়ে উঠেছিল প্রতীচ্যের অবদানে, তাই প্রাচ্যগরিমা দিয়ে পাশ্চাত্য মহিমাকে খণ্ডন করার চেষ্টায়, আত্মর ধারণাও অংশত খণ্ডিত হয়। ঔপনিবেশিক যুগের এক পর্বে বলা হয় ভূমার স্বপ্নে মগ্ন না-থেকে ভূমিতে নামতে হবে ভারতীয়দের, আরেক পর্বে বলা হয় ভূমার ধ্যানে বিভোর না-হলে হারানো ভূমি ফেরত পাবার আশা নেই।[৩৮]

তাই ভোগবিমুখতার লক্ষণকে চিহ্নিত করার চেষ্টার জন্যই বাংলা অ্যাডভেঞ্চার নায়করা অর্থলালসাহীন, বলবেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। জড়বাদী পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধস্বর হিসেবে অ্যাডভেঞ্চার নায়কদের প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, আসলে পাশ্চাত্যের ফাঁদেই কিভাবে পা গলানো হয়ে গিয়েছে তা বুঝিয়ে দেবেন তিনি। খেয়াল রাখা প্রয়োজন, আপাতভাবে বিমলদের অ্যাডভেঞ্চারগুলিকে মনে হতে পারে প্রত্যাশাহীন, ঝুঁকির জন্য ঝুঁকি নেওয়ার মতো অভিযান। কিন্তু তাদের অধিকাংশ অভিযানই অজানা ভূখন্ডের সন্ধানে, গুপ্তধনের সন্ধানে, নতুন জনজাতি খোঁজার তাগিদে ঘটেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিযানের উদ্দেশ্যগুলির বাঙালি সংস্করণ গড়ে নিয়ে, তাতে চেষ্টাকৃতভাবে লোভের হাতছানিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কেবল বিপদের জন্যই অ্যাডভেঞ্চারে যেতে চায় বললেও অভিযানের সঙ্গে প্রাপ্তির সম্পর্ককে যে তারা মেনে নিয়েই বেরিয়েছে অ্যাডভেঞ্চারে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এখন লক্ষণীয় হল, হোমারীয় নায়কত্বের ধারণা থেকে রুশোর আধুনিক নায়কে পৌঁছানোয় ইউরোপ যাত্রা করেছিল, কয়েক শতাব্দী ব্যাপি এক সুদীর্ঘ পথ; কিন্তু বাংলার প্রথম অ্যাডভেঞ্চার নায়ক যখন বিশ শতকে এসে পাচ্ছে প্রথম আদল, তখন ইউরোপীয় নায়কের দীর্ঘ বিবর্তন পথ যেন এক বিন্দুতে একসাথে জমাট বেঁধেছে। কিছুটা আকস্মিক এবং কিছুটা অপ্রস্তুতভাবেই। ফলে স্থানে স্থানে বিমলের বক্তব্য ও ক্রিয়াকলাপ পরস্পরবিরোধিতায় ভরা বলে মনে হতে পারে। অপ্রস্তুত বাঙালিকে কেরানি বানানোর স্বার্থে ইউরোপীয় শিক্ষার ছাঁচে ঢালাই করার যে তাড়াহুড়ো, তাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিমল চরিত্রের বুনটে।

প্রথম অভিযান নায়ক হিসেবে বিমলকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে একদিকে তার বীরত্ব ও সাহসিকতা ও শক্তপোক্ত নৈতিক অবস্থানের নজির যেমন সৃষ্টি করেছেন লেখক, তেমনই ফুটিয়ে তুলেছেন সমসময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানগুলিকেও। ভারতবর্ষ তথা বাংলা

তখন ব্রিটিশবিরোধী, স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার নিদর্শন আমরা দেখতে পাব বিমল-কুমার সিরিজের চরিত্রদের কথাবার্তার মধ্যেও। 'নীল সায়রের অচীনপুরে' উপন্যাসে আত্মরক্ষার যুক্তি দেখিয়ে আটলান্টিসবাসীদের যখন হত্যা করতে উদ্যত হয় বিমল, বিনয়বাবুর সতর্কবার্তা শোনা যায় তখনই, "ওরা কি আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে? আমরাই তো পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছি ওদের সোনার দেশ লুণ্ঠন করতে— একটা প্রাচীন জাতিকে ধ্বংস করতে। ছি, ছি, ঘৃণায় অনুতাপে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে! ধিক আমাদের!"[৩৯] বিমলেরও নিজের ভুল বুঝতে দেরি হয়নি— "তাদের বিদেশি শত্রু বলে বাধা দেবার বা বধ করবার অধিকার যে এই পাতালবাসীদের আছে, সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহই নেই।"[৪০] ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবীদের কার্যকলাপ কি সেইসময় কাজ করেনি বিমলের মনে? বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলায় ক্রমশ পুঞ্জিভূত হতে থাকা ব্রিটিশ-বিরোধী ক্রোধ দানাবেঁধে উঠতে থাকে নানা কর্মসূচি ও তার প্রস্তুতির মাধ্যমে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই নরমপন্থীদের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আশানুরূপ সফল না হলে, সেই হতাশার উৎস থেকে চরমপন্থী আন্দোলন মাথাচাড়া দিতে থাকে। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীরা মূলত ছিলেন এই চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত একদিকে তাদের কাছে যেমন হয়ে উঠেছিল বীজমন্ত্র অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) বাণী তাদের কাছে হয়ে উঠেছিল সুমহান প্রেরণা। বিবেকানন্দের এই প্রেরণাকে কার্যকরী ভূমিকায় রূপদান করতে এগিয়ে এসেছিলেন সতীশচন্দ্র বসু (১৮৭৬-১৯৪৮)। জীবনতারা হালদার (১৮৯৩–১৯৮৯) তার *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা* (১৯৮৯) গ্রন্থে বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ জগন্মাতার নিকটে বাঙ্গালী জাতিকে মানুষ করবার যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন— সতীশচন্দ্র সেই কর্মভার গ্রহণ করেন।"[৪১] বাঙালি

জাতির ভীরুতার অপবাদ ঘোচানোর জন্য এই সময় প্রাথমিকভাবে সতীশচন্দ্র বসুদের মূল ঝোঁকটি তৈরি হয় স্থানে স্থানে ব্যায়ামচর্চার কেন্দ্র স্থাপন করার দিকে। প্রাথমিকভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালি এই ব্যায়ামচর্চার আখড়াগুলোকে হেয়জ্ঞান করলেও ক্রমে হার্মস্টোন সার্কাস ও অন্যান্য জায়গায় দুঃসাহসিক খেলাধুলোর কৌশল দেখে আগ্রহী হয়ে বাঙালি যুবক শরীর চর্চায় মনোনিবেশ করতে থাকে। ক্রমে সতীশচন্দ্র বসুদের নেতৃত্বে ১৯০২ সালের ২৪শে মার্চ প্রথম অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনুশীলন তত্ত্বে যে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সমন্বিত সার্থক বা আদর্শায়িত মানব চরিত্রের পরিকল্পনা করেন, তাই ছিল অনুশীলন সমিতির ভিত্তি। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩০) অরবিন্দ ঘোষের (১৮৭২-১৯৫০) সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করে কলকাতায় ফিরলে উপযুক্ত কর্মী তৈরি করার জন্য বাঙালি যুবকদের ব্যায়ামশিক্ষার বন্দোবস্ত করতে সচেষ্ট হন। সশস্ত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে মনে রেখেই তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এরপর অনুশীলন সমিতির আদর্শ ক্রমশ যুব সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। শারীরিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতির জন্য সমিতির সদস্যদের একদিকে যেমন দেশীয় ইতিহাস জানতে হতো, অন্যদিকে ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার দর্শন, রাশিয়ার নিহিলিস্ট ভাবনা, মাৎসিনী (১৮০৫-১৮৭২), গারিবল্ডি (১৮৩৩-১৯০৫), কাভুর (১৮১০-১৮৬১) প্রমুখের জীবনচরিত পড়তে হতো। অবশ্যপাঠ্য ছিল বিবেকানন্দের রচনাসমূহ। ডানপিটে এক বাঙালি যুবসম্প্রদায়ের পরিকল্পনা ক্রমশ বাস্তবায়িত হচ্ছিল এইসময়ে।

এই পরিস্থিতিতে আসে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের (১৮৫৯-১৯২৫) বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা। জমাট বাঁধতে থাকা বাঙালি যৌবনের উদ্দীপনা পেয়ে যায় প্রযুক্ত হবার দিশা। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা আক্রমণাত্মক রূপ ধারণ করতে থাকে। জীবনতারা হালদার বলেন,

> সে আমার কৈশোর কালের কথা। বোধহয় বছর বারো বয়স হবে তখন। আমার উপর ভার ছিল পাড়ার চারদিকে টহল দিয়ে নজর রাখা পুলিশের বা অপর কোন সন্দেহভাজন লোক এ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছে কিনা। পাড়া বলতে তখন অবশ্য ছিল অজস্র গলিখুঁজির গোলকধাঁধা।[৪২]

গোপনে গুলি-বারুদ-রিভলবার পাচারে যুক্ত হয়েছিল বহু যুবক। এরপর বিপ্লবীদের বক্তব্য প্রচারের গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয় *সন্ধ্যা* ও *যুগান্তর* পত্রিকা। ১৯০৭ সালের ১১ এপ্রিল *যুগান্তর* পত্রিকায় 'এসো অরাজকতা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়—

> ইংরেজের অধীন ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র সন্তর্পণে প্রচার করতে পারলে কাজ আমাদের এগিয়ে যাবে। তা'হলে শাসক শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে বিপ্লবীরা বিদ্রোহীদলে শুধু যে এই সৈন্যদের পাবে তা নয়, শাসক-প্রদত্ত তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বিপ্লবের কাজে পাওয়া যাবে।[৪৩]

আবার *যুগান্তর* পত্রিকায় ১৯০৬ সালের ২৬শে আগস্ট 'যোগ্যক্ষ্যাপার *চিঠি*'তে বলা হয়, "অতি সহজেই দেশে বিপ্লবের জন্য অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় ও গোপনীয়তা রক্ষা করে বিস্ফোরক তৈরী করা যায়।"[৪৪] আবার *সন্ধ্যা* পত্রিকায় বলা হয়, "আমরা চাই পূর্ণ মুক্তি। দেশে ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গি আধিপত্যের লেশ মাত্র থাকতে দেশের কোন উন্নতির আশা নেই।"[৪৫] বোঝা যায়, স্বাধীনতার স্পৃহা-সঞ্জাত এক প্রবল বীরত্বের আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে পড়ছিল বাঙালি যুবকদের মননে। সে আকাঙ্ক্ষা ও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থেকেছে বাংলায়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের এই দামাল অগ্রগতির পটভূমি পিছনে থেকে গিয়েছে বিমল-কুমার সিরিজের। তাই মাঝে মাঝেই বিমল-কুমার-রামহরি-বিনয়বাবুদের কথায় কাজে সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। 'সুন্দরবনের রক্তপাগল' উপন্যাসে গোয়েন্দা জয়ন্ত বাঘাকে দেশি কুকুর বলে হেয়জ্ঞান করলে বিমল বলে,

> জয়ন্তবাবু আপনার মতন বুদ্ধিমান লোকও যদি গোলাম মনোবৃত্তির পরিচয় দেন, তাহলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হব। সাদা চামড়ারা এই কালো বাংলাদেশ আর এই কালো বাঙালিকে ঘৃণা করে বলে এ-দেশের কুকুর বাঘাও কি হবে ঘৃণ্য জীব?[৪৬]

আবার 'নীল সায়রের অচীনপুরে' উপন্যাসে বিমল কুমারকে বলে, "যতবারই ভারতকে ছেড়ে যাই ততবারই মনে হয়, আমার সমস্ত জীবনকে যেন ভারতের সোনার মতো সুন্দর ধুলোয় ফেলে রেখে, আত্মার অশ্রু-ভেজা মৃতদেহ নিয়ে কোন অন্ধকারে যাত্রা করছি!"[৪৭] ভারতের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্বিত বিমলকে বলতে শোনা যায়,

> অমন যে আপন সভ্যতায় গর্বিত গ্রিকগণ, তাদেরও অসংখ্য লোক আলেকজান্ডারের দল ছেড়ে স্বদেশ ভুলে উত্তর ভারতেই বংশানুক্রমে বাসা বেঁধে রয়ে গেল! আমাদের এই ভারতকে স্বদেশের মতো ভালো না বেসে কেউ যে থাকতে পারে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।[৪৮]

আবার 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাসে মহাকাশযান থেকে পৃথিবীকে দেখে বিনয়বাবুদের যে মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কষ্ট অনুভূত হয়, সেখানেও পৃথিবীর প্রতীকে যেন আভাসিত হয়ে ওঠে স্বদেশেরই বোধ।[৪৯] স্বদেশ ভাবনার এমন অজস্র চিহ্ন ছড়িয়ে আছে গোটা সিরিজ জুড়েই।

বিশ শতকের বাংলা সশস্ত্র আন্দোলনের পথে হেঁটেছে যতো, ততোই উপলব্ধি করেছে অস্ত্রের মাহাত্ম্য; অথচ ১৮৭৮ সালের লর্ড লিটন প্রণীত অস্ত্র আইন অনুসারে সরকারি অনুমতি ছাড়া ভারতীয়দের অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিকে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তখন অনুভব করছে মুক্তিকামী বঙ্গসমাজ। *যুগান্তর* পত্রিকায় স্পষ্টত ঘোষণা করা হয়—

> শ্বেতাঙ্গ হত্যার জন্য পেশীবহুল সবলদেহ প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য চাই অস্ত্র এবং তা বিদেশ থেকে নানা কৌশলে আমদানী করতে হবে। এ দেশে গোপনে কিছু অস্ত্র নির্মাণ করা প্রয়োজন। বিদেশে গিয়ে বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত প্রণালী শিখে আসতে হবে।[৫০]

— আর প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী বাঙালি তো গোটা পৃথিবীতে অস্ত্রের দাপট কতটা তা দেখেই ফেলেছে। ফলে একদিকে অস্ত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি আরেকদিকে অস্ত্র প্রাপ্তির বাধা, এ দুয়ের সংঘাতে হেমেন্দ্রকুমার রায় কিশোর সাহিত্যে অস্ত্রকে করে তুলেছেন সহজপ্রাপ্য। বন্দুকের জয়জয়কার সেখানে। বাস্তবের অপ্রাপ্তিই যেন সাহিত্যে করেছে স্বপ্নপূরণ। তাই আমরা প্রথম অভিযান উপন্যাস ‘যকের ধন’-এ দেখি বিমলের কাছে অনায়াসে রয়েছে দুটো বন্দুকের পাস, যার একটা আবার কুমারকে দিয়ে দিতে বাধা নেই কোথাও। ‘মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন’ উপন্যাসে বন্দুকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিনয়বাবুর মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত মঙ্গলগ্রহবাসীরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানে না দেখে বিমল অবাক হলে বিনয়বাবু বুঝিয়ে দেন, “দরকার হলেই কোনও জিনিসের আবিষ্কার হয়, এটা হচ্ছে সভ্যতার নিয়ম। এদের বন্দুক কামানের দরকার হয়নি, তাই এরা তার জন্যে মাথা ঘামায়নি।”[৫১] এতদিন অস্ত্রের দিকে নজর না দিলেও বাঙালি তথা ভারতবাসীর এখন যে তা নিয়ে ‘মাথা ঘামানো’ প্রয়োজন, সেকথাও

কি গোপনে বলা হয়ে যায় না এখানে? এই বন্দুকের জোর বারবার প্রকাশিত হতে থাকে বিমল কুমারদের কাজে ও কথায়। 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাসের একটি জায়গায় যেমন—

> বিমল আবার বন্দুক ছুঁড়ল— আবার একজন বামনের পতন হল।
>
> ব্যাপার দেখে আর সব বামন-সেপাই তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেল, — তাদের মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে তারা ভয়ানক স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বন্দুক যে কী সাংঘাতিক জিনিস তারা তো তা জানে না![৫২]

আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহবাসীদের উড়োজাহাজ নিজেদের কব্জায় আনতে পারলে বিমল তো আনন্দে 'জয়, বন্দুকের জয়!' বলে চেঁচিয়েই ওঠে।[৫৩]

আবার 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন'-এর পরের অংশ 'ময়নামতীর মায়াকানন'-এ বামনরা বিমলদের এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপে ফেলে রেখে উড়োজাহাজ নিয়ে পালিয়ে গেলে বিমল বলে, "বোধহয় বন্দুক নিয়ে আমরা চলে আসতেই বামনদের সাহস বেড়েছে, তারা মানুষদের আক্রমণ করেছে!"[৫৪]

বিমল কুমার সিরিজে বিমলদের অভিযানের পরিকাঠামো যতো পাকাপোক্ত হতে থাকে ততোই বাড়তে থাকে বন্দুকের আতিশয্য। 'নীল সায়রের অচীনপুরে' উপন্যাসে বিমলদের সঙ্গে আটলান্টিসে যায় চব্বিশটি বন্দুকসহ সেপাইরা। সেখানেও আটলান্টিসবাসীদের সম্পর্কে বিমল ঘোষণা করে, "ওরা নিশ্চয়ই বন্দুককে চেনে না। ওরা জানে না, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আমরা যদি গোটা-চারেক বন্দুক ছুঁড়তে থাকি, তাহলে ওদের পাঁচ লক্ষ লোককেও অনায়াসে বাধা দিতে পারি।"[৫৫] একদিকে বন্দুকের মাহাত্ম্য যেমন, তেমনই সভ্যজাতির প্রতিনিধি বিমলের তথাকথিত অশিক্ষিত, প্রাচীন জনজাতির প্রতি নিষ্ঠুরতাও প্রকাশিত হয়ে পড়ে এই কথায়।

‘আবার যখের ধন’ এবং ‘সূর্যনগরীর গুপ্তধন’ উপন্যাসেও বন্দুকের এই বিপুল সম্ভার বজায় থাকে। আবার ‘হিমালয়ের ভয়ঙ্কর’ উপন্যাসে বন্দুকপ্রীতি পরিণত হয়ে যায় সভ্যতার গর্বে। বিমল বলে,

> এমনকি ঘোড়া-মোষ-গরু পর্যন্ত গায়ের জোরে মানুষের চেয়ে ঢের বড়। কিন্তু তবু তারা মানুষকে ভয় করে এবং গোলামের মতো মানুষের সেবা করে। গায়ের জোরের অভাব মানুষ তার মস্তিষ্কের দ্বারা পূরণ করেছে। আমাদের হাতে যে বন্ধুক আছে, আর আমাদের ব্যাগে যে বোমাগুলো আছে, এগুলো দান করেছে মানুষের মস্তিষ্কই।[৫৬]

বন্দুক এখানে আত্মরক্ষার উপকরণ হয়ে আর থাকে না, হয়ে ওঠে আধিপত্যেরও নিদর্শন। যে বন্দুকের প্রয়োজনীয়তা শাসকের বিরুদ্ধাচারণের জন্য অনুভূত হয়েছিল, তাই সঙ্গে করে বহন করে আনে শাসকের মানসিকতা। শাসকের বিরুদ্ধে লড়ার জেদ তাতে হ্রাসই পায়। তাই কুমারকে বলতে শোনা যায়,

> দুষ্ট রাজবিদ্রোহীদের মতো আমরা যে মানুষ মারবার জন্যে বোমা ছুড়ব না, পুলিশ তা জানে। পুলিশকে লুকিয়ে আমরা বোমা আনিনি— আমরা পুলিশের অনুমতি নিয়েই এসেছি!"[৫৭]

স্বাধীনতাকামী রাজবিদ্রোহীরা যখন ‘দুষ্ট’ বলে চিহ্নিত হয়ে যায় কিশোর সাহিত্যে, আর কুমারের কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় ডানপিটেমোর ধারণায় মিল থাকলেও অভিযান নায়করা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের থেকে আলাদা, তখন বুঝতে পারা যায় ইউরোপীয় মডেলে গড়ে ওঠা অভিযান সাহিত্যের নৈতিকতা কেন ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করেনি। কেবলমাত্র বিশ শতকের তৃতীয় দশকের সাহিত্যিক বিমল সেনের (১৯০৬-১৯৩৪) লেখা *ফুলঝুরি* (১৯৩৩) ও *মরুযাত্রী* (১৯৩৯) বই দুটি ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে ও বাজেয়াপ্ত হয়। লেখক বিমল সেনকে জেল

খাটতেও হয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য। 'মরুযাত্রী' উপন্যাসটিতে ছিল অগ্নিযুগের তিন বিপ্লবীর গল্প। হেমেন্দ্রকুমারের উপন্যাসের নায়করা এক্ষেত্রে আঁতাত রেখে চলেছে সরকারি বন্দোবস্তের সঙ্গে। শাসকের মনোভঙ্গি যে কুমার-বিমলদেরও গ্রাস করেছিল অচিরেই, তার প্রমাণ আমরা পাই 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন' উপন্যাসে। আসাম আর আফ্রিকার জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চার সাঙ্গ করে ইতিউতি ঘোরার পর বিমল আর কুমার গিয়ে হাজির হল ইনকাদের দেশে। বাঙালির ছেলে, তবু সাহস ও শক্তিতে তারা অপরাজেয়। লেখক চান আগামী প্রজন্ম ওদের থেকেই শিখে নেবে ভারতকে বিশ্ব সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করানোর প্রত্যয়। হরেক কেরামতি দেখাতে দেখাতে বিমল-কুমাররা সাক্ষাৎ পেল ইনকা সভ্যতার গোষ্ঠীভুক্ত ইক্টিনাইকের। বাগ্‌বিতণ্ডা চলাকালীন ইক্টিনাইকের মুখেই আমরা শুনতে পেলাম, "আধুনিক যুগ আমাদের বঞ্চিত করেছে; আমাদের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য কেড়ে নিয়েছে; তাই আমরা মহা পর্বতের অন্তরালে গহন-বনের অন্তঃপুরে গোপনে গড়ে তুলেছি এই অজানা সূর্যনগর।"[৫৮] অত্যাচারিত, শোষিত ইকটিনাইকদের এই যুক্তি কোনো ছাপই ফেলতে পারল না আরেক শোষিত পরাধীন দেশের প্রতিনিধি বিমলদের ওপর। শতযুক্তির শেষেও সেই ইক্টিনাইককেই তাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হয় কুমার-বিমলদের। সভ্যতার পায়ের ছাপে ধূসর হয়ে যায় সূর্যনগরী; আর পুরস্কার হিসেবে সভ্যের দলভুক্ত হয় ইক্টিনাইক। স্বজাতিদের বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে বলেই জাতে উঠে যায় সে। ঠিক অস্ত্রের ঘায়ে প্রাচীন জনজাতিকে নিধন করার গর্বে গরীয়ান বিমল-কুমারদের মতোই। 'প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ' উপন্যাসে আবার আমরা দেখতে পাই, ডঃ মোরে যেসব জন্তু-মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তাদের কিছু নীতিবাক্য মুখস্থ করিয়েছিলেন। সেই জন্তু-মানুষরা প্রভু-ভীতি থেকে সেই নীতিবাক্য মেনে চলত। নিজেদের মানুষ বলে মেনে নিয়ে দুপায়ে হাঁটত ও মাংস খেত না। ক্রমশ তাদের উত্তরসূরিরা সেই নীতিশিক্ষা ভুলে আপন

পশু-স্বভাব দ্বারা চালিত হয়। বিমলরা দ্বীপে পৌঁছালে তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু পূর্বতন নীতিজ্ঞানসম্পন্ন জন্তু-মানুষরা বিমলদের হয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাদের নীতিবাক্যগুলির মধ্যে অন্যতম হল, "আবার আমাদের প্রভুরা এসেছেন! এইবারে আমাদের শাস্তি পেতে হবে।"[৫৯] শাস্তি পেতে আনন্দিত, স্বজাতি-বিরোধী, ডাঃ মোরের বশংবদ সেই জন্তু-মানুষরাই হয়ে ওঠে বিমলদের সহায়, "এই অজানা দ্বীপেও আছে আমাদের না-জানা বন্ধু।"[৬০] আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, এই অজানা-বন্ধুরা আসলে অতি-জানা উপনিবেশের সেই প্রজারাই, যারা ঔপনিবেশিক শিক্ষাদ্বারা গ্রস্ত। আর বিমলরাই যেন শাসক ঔপনিবেশিকদের প্রতিভূ। জানা চৌহদ্দির শিকল ভাঙতে চায় বটে অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় বিমলরা, কিন্তু ঔপনিবেশিক-শিক্ষার জানা-শিকলেই আটকে থাকে তারা।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালির মূল সুরটি ছিল জাগরণের। দীর্ঘদিনের সুপ্তি নিয়ে, পিছন ফিরে থাকা নিয়ে বারেবারে মুখর হয়েছেন বাঙালি লেখকরা সেইসময়। প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কা বাঙালিকে আরোই চিনিয়েছে শক্তির প্রতাপ। চিনিয়েছে বিশ্বমানচিত্রের রূপ। গতি ও উন্নতির চেহারা। অন্যান্য জাতির সঙ্গে তুলনার মাধ্যমে বাঙালি আবিষ্কার করেছে নিজের অবস্থান। রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ভূত' গল্পে ভারতের অচল স্থাণুত্ব নিয়ে কটাক্ষ করতে করতে বলেন,

> কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।[৬১]

একই কথা আমরা ফিলিপ সাহেবকেও বলতে শুনি ‘সূর্যনগরীর গুপ্তধন’ উপন্যাসে—

> ভারতবর্ষ আজ যে জীবনের যাত্রাপথে এতটা পিছিয়ে পড়েছে, এর কারণ এখানকার লোকেরা আজ অবলম্বন করতে চায় জড়ের ধর্ম। অথচ আমাদের দেশ য়ুরোপের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেখান থেকে দলে দলে লোক বেরিয়ে পড়েছে পৃথিবীর চারিদিকে— জলে-স্থলে-শূন্যে![৬২]

বিমলকেও ‘যকের ধন’ উপন্যাসে বলতে শোনা যায়, “জগতে যেসব জাতি আজ মাথা তুলে বড় হয়ে আছে— বিপদের ভেতর দিয়ে, মরণের কুছ-পরোয়া না রেখে তারা সবাই শ্রেষ্ঠ হতে পেরেছে।”[৬৩]

তাই বিমল-কুমার সিরিজে দেখা যায় নানা দেশের অজস্র তথ্য সরবরাহ করে চলেছেন লেখক। ‘আবার যখের ধন’ উপন্যাসে আফ্রিকা সম্পর্কে নানা তথ্য, ‘যক্ষপতির রত্নপুরী’তে আফগানিস্তানের নানা জনজাতির ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি ও খাদ্যাভাসের বর্ণনা, ‘সূর্যনগরীর গুপ্তধন’-এ রেড ইন্ডিয়ান ও ইনকাদের ইতিহাস গল্পের ছলে জানিয়ে যেতে থাকেন লেখক। আবার ‘নীল সায়রের অচীনপুরে’ উপন্যাসে ক্রমপরিবর্তমান বিশ্বমানচিত্রের কথাও বলা হয়। বিশ শতকের পৃথিবীর বিস্তৃতি অপার কৌতূহলের উপহার নিয়ে দেখা দিচ্ছিল। সেই বিশ্ববোধ ও কৌতূহল বাঙালি কিশোর পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েই যেন কুমার-বিমল সিরিজ লিখে চলেন লেখক। এই বিশ্ববোধ অনেকসময় অপ্রত্যক্ষভাবেও ধরা থাকে উপন্যাসের বয়ানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ‘জেরিনার কণ্ঠহার’ (১৯৪১) উপন্যাসে বর্ণিত বিমলের বাগানের—

> বিমল ও কুমারের যত্নে এই মাঝারি বাগানখানি সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে এমন অপূর্ব হয়ে উঠেছিল যে, অধিকাংশ বিখ্যাত ও বৃহৎ উদ্যানকেও লজ্জা দিতে পারত অনায়াসেই। তারা যখনই পৃথিবীর যে-কোনও দেশে গিয়েছে, তখনই সেখান থেকে নিয়ে এসেছে নানা-জাতের গাছ-গাছড়া। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা দেশের গাছ ও চারার সঙ্গে মিলে-মিশে বাস করে এখানে বাংলার নিজস্ব বনভূমির রঙ, গন্ধ, শ্যামলতা।[৬৪]

বিশ্ববোধ ও স্বদেশীয়ানাকে বিমলের বাগানের মতোই মেলানোর চেষ্টা করেছেন লেখক সমগ্র সিরিজ জুড়ে। স্বদেশী সশস্ত্র আন্দোলনের ডানপিটেমোর তাগিদ ও প্রথম মহাযুদ্ধ জাত বিশ্ব-জানার আকাঙ্ক্ষা হাত ধরাধরি করে চলেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ উল্লেখও সিরিজে ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার। ‘আবার যখের ধন’ উপন্যাসে মানিকবাবুর দুই কাকা ফৌজের সঙ্গে আফ্রিকায় গিয়েছিল। সেখানে গিয়েই তার মেজ কাকা গুপ্তধনের সন্ধান পায়। ‘নীল সায়রের অচীনপুরে’ উপন্যাসে গোমেজকে বিমলরা তাদের মঙ্গলগ্রহের অভিযানের খবর শুনেছিল কিনা জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, “বিশেষ ১৯১৪ হচ্ছে মহাযুদ্ধের বৎসর, তখন যুদ্ধের হই-চই নিয়েই আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলুম।”[৬৫] আবার আটলান্টিস অভিযানে বিমলদের রক্ষীদলে ছিল শিখ, গুর্খা ও পাঠান সেপাই। লেখক জানিয়ে দেন, “এরা সকলেই আগে ফৌজে ছিল। অনেকেই ভারতের সীমানে বা মহাযুদ্ধে ফ্রান্সে ও মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশে লড়াই করে এসেছে।”[৬৬] আবার বিমল আধুনিক আণবিক যুদ্ধের সমালোচনাও করে, এ যুদ্ধ বীরত্বহীন বলে। 'কুমারের বাঘা গোয়েন্দা' উপন্যাসে বিমল বলে, আধুনিক যুদ্ধে কাপুরুষের মতো অসামরিক আবালবৃদ্ধবনিতাকে দূর থেকে আণবিক বোমার

আঘাতে হত্যা করা হয়। অসংখ্য নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়। বিমলের কাছে তা বীরত্বহীন মনে হয়েছে।

বাইরের পৃথিবীর প্রতি আগ্রহের এবং বিশ্বের খবর সংগ্রহের অন্যতম উপায় হিসেবে বারবার বিমল-কুমার সিরিজে উল্লিখিত হয় সংবাদপত্রের প্রসঙ্গ। 'আবার যখের ধন' উপন্যাসে আমরা কুমারকে দেখি খবরের কাগজে রোমাঞ্চের সন্ধান করতে। না পেলে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। আবার 'নীল সায়রের অচীন পুরে' উপন্যাসে দেখা যায় বিমল আর কুমার খবরের কাগজে ঝুঁকে পড়ে কি যেন খুঁজছে। রামহরি বলে, "ওই হতচ্ছাড়া কাগজগুলোই তো তোমাদের যত ছিষ্টিছাড়া খবর দেয়, তোমরা পাগলের মতো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাও।"[৬৭] ১৪ মার্চ ১৮৭৮ থেকে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হলে, *অমৃতবাজার* পত্রিকা ইংরাজি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়েছিল এবং ক্রমে বাংলায় *আনন্দবাজার* পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ১৮৭৯ সালে *সোমপ্রকাশ* পত্রিকাও রাজরোষে পড়ে ও ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। সংবাদপত্রকে তখন চলতে হচ্ছিল অনেক মাপজোক করে, যদিও তার মধ্যেই পরাধীনতার অসন্তোষ প্রকাশিত হয়ে পড়ত নানাভাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে কিন্তু সংবাদপত্র হয়ে ওঠে বিশ্বজ্ঞানের পাঠশালা। বাইরের পৃথিবীর যেসব তথ্য থেকে বাঙালি বঞ্চিত ছিল এতকাল, তা নাগালে এসেছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমেই। একাধারে সংবাদপত্রের প্রতি কিশোর পাঠককে আগ্রহী করে তোলা ও সমসময়ের মধ্যবিত্ত বাঙালির অভ্যাসকে চিহ্নিত করার কাজটি সেরে রেখেছেন লেখক।

অজানা নতুনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে এবং সেই নতুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখানোর জন্যই লেখক অবতারণা করেন বিনয়বাবু চরিত্রটির। 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাসে বিনয়বাবু ও কমলের প্রথম দেখা মেলে। বিনয়বাবু সম্পর্কে লেখক জানিয়ে দেন, "বিনয়বাবু

সরল হলেও তাঁর প্রকৃতি ঠিক সাধারণ লোকের মতন নয়। দিন-রাত তিনি পুঁথিপত্র আর লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকেন, সংসারের আর কোনও ধার বড় একটা ধারেন না।”[৬৮] এই জ্ঞানপিপাসু মানুষটিকে দেখা যায় মঙ্গলগ্রহের প্রাণীদের দ্বারা অপহৃত হয়েও নতুনতর বিশ্বকে জানার নেশায় আকুল হয়ে থাকতে। বিনয়বাবুর ভাষায়, “আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি কিন্তু খুব খুশি হয়েছি। আমাদের চোখের সামনে এখন এক নতুন জ্ঞানের রাজ্য খোলা রয়েছে– এক নতুন জগৎ, নতুন দৃশ্যের পর নতুন দৃশ্য!”[৬৯] আবার ‘ময়নামতীর মায়াকানন’ উপন্যাসে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের দ্বীপে আগুনহীন অবস্থায় কাটাতে হবে শুনেও বিনয়বাবু বলেন, “তা হলে আমাদের কাঁচা মাংস খাওয়াই অভ্যাস করতে হবে। মন্দ কি, সে-ও এক নতুনত্ব।”[৭০] আবার বিনয়বাবুর মাধ্যমে লেখক কিশোর পাঠকের কাছে সরবরাহ করে যান বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নানা তথ্য, এমনকি সেসব তথ্য যে কাল্পনিক নয় তাও উল্লেখ করে দেন লেখক। বন্ধনীর মধ্যে তিনি জানিয়ে দেন,

> বিনয়বাবুর ডায়রিতে মঙ্গলগ্রহের যেসব অদ্ভুত তথ্য আছে, তার অধিকাংশই প্রমাণিত সত্য, যাঁদের বিশ্বাস হবে না, তাঁরা এ সম্বন্ধে সিয়াপ্যারেলি, লাওয়েল, গান, স্ট্যানলি উইলিয়মস ও শ্লামেরিয়ন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামত পড়ে দেখতে পারেন।[৭১]

বোঝা যায়, মনোরঞ্জন ও নৈতিক চরিত্র নির্মাণের পাশাপাশি নবলব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারও কিশোর পাঠকের হাতে তুলে দিতে চাইছেন লেখক। তাই কুমার বিমলদেরও বারবার দেখা যায় বিনয়বাবুর কাছে জ্ঞান অর্জনের জন্য হাত পাততে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কাল একদিকে যেমন সংবাদপত্রের মাধ্যমে গোটা বিশ্বের চেহারা, নিত্যনতুন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও মানচিত্রের ক্রমাগত ভাঙাগড়াকে হাজির করছিল

বাঙালির সামনে– সে দেখতে শিখছিল পৃথিবীর অজানা বৈচিত্র্য, তেমনই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অগ্নিময় রূপ ধারণ করছিল। একদিকে বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০), মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ব্রিটিশদের জন্য অর্থ ও লোক সংগ্রহ করেছিলেন এই আশায় যে রাজভক্তি দেখানোর মাধ্যমে তারা শাসকের কাছ থেকে আরও বড় রাজনৈতিক সংস্কার মঞ্জুর করাতে পারবে।[৭২] অপরদিকে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত বিপ্লবীরা প্রথম মহাযুদ্ধকে দৈব-সুযোগ হিসেবে দেখেছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত থেকে ব্রিটিশ সেনাদলের একটা বড় অংশকে সরিয়ে নেওয়া হয়। সুমিত সরকারের মতে, একটা সময়ে ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ১৫০০০-এ গিয়ে ঠেকেছিল।[৭৩] এই সময়ে ব্রিটেনের শত্রুপক্ষ জার্মান বা তুর্কিদের কাছ থেকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখেছিল বিপ্লবীরা। বাঙালি বিপ্লবীরা পাঞ্জাবে ফিরে আসা গদরপন্থী বিপ্লবীদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রাঘাত বা ক্যু এর পরিকল্পনাও করেছিলেন। সুমিত সরকারের মতে, "প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন কয়েক বছর ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সত্যিকারের ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছিলেন।"[৭৪] সামগ্রিকভাবে অস্থির এই চালচিত্রই বাঙালির মধ্যে তৈরি করছিল বর্হিমুখী স্পৃহা। অথচ উপনিবেশের বাসিন্দা, কেরানি তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত, স্থবির জীবন ও সংস্কারে ডুবে থাকা, পারিবারিক নাগপাশে আটকে থাকা বাঙালির পক্ষে বেরিয়ে পড়া সহজ ছিল না আদৌ। সেই চাওয়া ও না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব থেকেই উৎসারিত হয় বিমল-কুমারের অভিযান।

'যকের ধন'-এ কুমার বিমলের আসামে গুপ্তধন খুঁজতে বেরিয়ে পড়া যেন সেই সময়ের বাঙালির বেরিয়ে পড়ায় বাধা, এবং বাধা টপকানোর এক প্রতীকী আলেখ্য। গুপ্তধনের পথের হদিশ পেয়ে শুরুতে কুমারের মনে হয়

> আমার বয়স সতের বৎসর। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি। জীবনে কখনও কোলকাতার বাইরে যাইনি। কোথায় কোন কোণে আসাম আর খাসিয়া-পাহাড়, আবার তার ভিতরে কোথায় আছে 'রূপনাথ গুহা'— এসব খুঁজে বার করাই তো আমার পক্ষে অসম্ভব![৭৫]

স্থানগত অনভিজ্ঞতা তার প্রথম বাধা, তবে একমাত্র বাধা নয়। কুমারের মনে হবে—

> তার উপরে সেই গভীর জঙ্গল, যেখানে বাঘ-ভাল্লুক-হাতিরা হানা দিচ্ছে! সেকেলে এক বৌদ্ধ মঠ, তার ভিতরে যকের ধন— সেও এক ভুতুড়ে কাণ্ড! শেষটা কি একলা সেখানে গিয়ে আলিবাবার ভাই কাসিমের মত টাকার লোভে প্রাণটা খোয়াব? এসব ভেবেও বুকটা ধুকধুক করে উঠল![৭৬]

দিনযাপনে বিপদসীমা অতিক্রম করার অনভ্যাস তার দ্বিতীয় বাধা। এসময়েই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে নায়কের পরিকল্পনা। বাঙালির অধরা সাহসিকতা ও শারীরিক বল, যা কিনা তার বেরিয়ে পড়ার পথে তৃতীয় বাধা, বিমলের চরিত্রনির্মাণ যেন সেই বাধাকে পেরোতে চাওয়ারই প্রতিফলন। এরপরেও সহজ নয় বাঙালির বেরিয়ে পড়া। সামাজিক-পারিবারিক বাধা তাকে পেরোতে হবে তারপরেও। রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৮৯৩-১৯৬৩) তাঁর *ভবঘুরে শাস্ত্র* (১৯৪৯) গ্রন্থে ভারতীয়দের ভবঘুরে হয়ে ওঠার পথে সবচেয়ে বড় বন্ধনরূপে মাতৃস্নেহকে চিহ্নিত করেছিলেন।[৭৭] 'যকের ধন' উপন্যাসেও আমরা দেখি বিমল আকস্মিকভাবে আসামে বেরিয়ে পড়ার কথা বললে কুমারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়— "মা গেছেন শান্তিপুরে, মামার বাড়িতে। তাঁকে না জানিয়ে আমি কি করে যাব?"[৭৮] মায়ের অনুমতি গ্রহণ যেন গণ্ডি টপকাতে না চাওয়ারই প্রাথমিক অজুহাত। তারপরেও বিমলের জেদাজেদিতে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হলে কুমারের মনে হয়—

> যাবার সময়ে মায়ের পায়ে প্রণাম পর্যন্ত করে যেতে পারলুম না— কে জানে এ জীবনে আর কখনও ফিরে এসে মাকে দেখতে পাব কিনা! একবার মনে হল বিমলকে বলি যে, আমি যাব না![৭৯]

তারপর বিমলের বুদ্ধিতে করালীদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য কুমাররা মামার বাড়ি ঘুরে তারপর আসামে রওনা হলে মায়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ মেলে। সেখানেও কুমারের অভিজ্ঞতা— "মা কি সহজে আমাকে ছেড়ে দিতে চান? তবু তাঁকে আমরা যকের ধন আর বিপদ-আপদের কথা কিছুই বলিনি, তিনি শুধু জানতেন আমরা আসামে বেড়াতে যাচ্ছি।"[৮০] পারিবারিক এই বন্ধন অতিক্রম করা যে কঠিন এবং তা যে বাঙালিকে পিছনের দিকে বেঁধে রাখার অন্যতম উপাদান, এ ব্যাপারে লেখক সচেতন ছিলেন বলেই নায়ক-বিমলের কোনো পারিবারিক পরিচয় আমরা পাই না। কেবল 'জেরিনার কণ্ঠহার' উপন্যাস থেকে জানতে পারা যায় বিমলদের দুটো বাড়ি। বড় বাড়িতে বাস করে বিমলের বহু আত্মীয়স্বজন। লেখক জানিয়ে দেন 'যাঁদের সঙ্গে আমাদের গল্পের কোনও যোগ নেই'।[৮১] আর ছোট বাড়িতে চাকর রামহরিকে নিয়ে পারিবারিক হট্টমেলা থেকে সরে এসে বাস করে বিমল। কেবল দুবেলা খাবার খেতে সে বড় বাড়িতে যায়। পরিবারের সঙ্গে এই বিযুক্ততাকে গৌরবময় করে তোলার জন্য লেখক বলেন, "শান্তিপূর্ণ নির্জনতায় বাড়িখানিকে মনে হত যেন আশ্রমের মতো।"[৮২] বাঙালি পাঠক এই পারিবারিক বিযুক্তিকে গ্রহণ করতে যাতে দ্বিধান্বিত না হয়, তাই এখানে বিমলকে করে তোলা হয়েছে ঋষিপ্রতিম। আবার নায়ক-বিমলের পরিবার সম্পর্কে গোটা সিরিজ জুড়ে লেখকের নিরবচ্ছিন্ন নির্বাক থাকা বুঝিয়ে দেয় পারিবারিক গণ্ডিকে দেখানো হলে বিমলের নায়কত্ব টিকিয়ে রাখাই দায় হতো।

পারিবারিক এই বাধা অতিক্রম করার পরেও বহুযুগের কুসংস্কারগ্রস্ততা কুমার বিমলদের সঙ্গ নেবে রামহরির বেশে। বিমলের প্রতি ভালোবাসায় অটুট থেকেও রামহরির কুসংস্কার-ভীরু আচরণ গোটা সিরিজ জুড়েই বাঙালির বাস্তবতাকে মনে করিয়ে দিতে থেকেছে। শুধু তাই নয়, মৃণুর সন্ধানে গিয়ে হিমালয়ের বিভীষিকাদের সম্মুখীন হলে রামহরি যখন বলে "হিমালয় হচ্ছে বাবা মহাদেবের ঠাঁই। বাবা মহাদেব হচ্ছেন ভূতেদের কর্তা। এ-জায়গাটা হচ্ছে ভূতপ্রেতদের আড্ডা।"[৮৩] তখন রামহরির কুসংস্কার দীর্ঘকালীন ধর্মচর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাকাপোক্ত আকার পায়, হয়ে ওঠে দুর্লঙ্ঘ্য। আর এই সংস্কারই তাকে সাম্প্রদায়িক করে তোলে যখন 'যক্ষপতির রত্নপুরী' উপন্যাসে সে কোনো মুসলমানের বাড়িতে অতিথি হতে রাজি হয় না জাত খোয়ানোর ভয়ে, পৌত্তলিক কাফির গুমলির আশ্রয় খুঁজে বার করে। গুমলিরাও গরুর মাংস খায় শুনে সে সেখানেও জলগ্রহণ করে না। রামহরির এমন আচরণ নিয়ে যতোই ঠাট্টা তামাশার ভঙ্গি করুন না লেখক, পুরাতন কাফ্রি ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হয়ে যাওয়া বার্মুকই কিন্তু হয়ে যায় বিমলদের স্থানীয় শত্রু। গুমলি জানিয়ে দেয়, "বার্মুক হচ্ছে পাজির পা-ঝাড়া, মানুষ মারতে তার হাত এতটুকুও কাঁপে না। সে কাফির হলেও আমাদের ধর্ম ছেড়েছে, তাই তাকে আমরা পরম শত্রু বলেই মনে করি।"[৮৪] উল্টো দিকে নিজের ধর্ম আঁকড়ে থাকা পৌত্তলিক কাফির গুমলিদেরও কিন্তু পরিচয় কম হিংস্র নয়—

> কেউ লুকিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত মুসলমানকে বধ করতে পারলে কাফির-সমাজে বীর বলে গণ্য হয়! তাদের মাথার পাগড়িতে গোঁজা পালকের সংখ্যা দেখেই বলে দেওয়া যায়, কে কয়জন মুসলমানকে হত্যা করেছে।[৮৫]

তবু এই গুমলিই বিমলদের দ্বারা উল্লিখিত হয় মহীয়সী নারী হিসেবে। সাম্প্রদায়িক চিহ্ন প্রকটতর হয়।

এই সংস্কারগ্রস্ত-সাম্প্রদায়িক রামহরি ও বিজ্ঞানমনস্ক-মুক্তমনা বিনয়বাবুর সহাবস্থান গোটা সিরিজে বারবার চোখে পড়বে আমাদের। একদিকে আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হলেও, সংস্কারের শিকড় যে ছিঁড়ে ফেলতে প্রস্তুত নয় বিশ শতকের প্রথমার্ধ তাই যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বরং এই দুয়ের যোগসাজশ, লেনদেন কিংবা নিরুপায় আঁতাতেই ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবে বাংলার সমাজ; সমঝোতা করবে।

কুমার বা বিমলের পেশাগত কোন পরিচয় ধরা পড়ে না 'যকের ধন' কাহিনিতে। তবে বোঝা যায় ভূমির সাথে তাদের প্রত্যক্ষ যোগ নেই। আবার সদা ব্যস্ত ব্যবসায়ী অংশও নয় তারা। দুটোর কোনো ক্ষেত্রেই তাদের পক্ষে ইচ্ছেমতো বেরিয়ে পড়া সম্ভব হতো না। অথচ তাদের যাবতীয় খরচ-খরচা নিয়ে ভাবিত হতেও দেখা যায় না। সম্পূর্ণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূমির সাথে জড়িত মানুষের বেরিয়ে পড়া যেমন ছিল অসম্ভব, তেমনি পূর্ণবিকশিত ধনতান্ত্রিক কাঠামোতেও উৎপাদন যন্ত্রের সাথে সম্পর্কহীন এই বেরিয়ে পড়াও কার্যত কষ্টকল্পনা হতো। কুমার বিমলরা গালিভর নয় যে আসলে বাড়তি মুনাফার বাজারের জন্য উপনিবেশ খুঁজতে অ্যাডভেঞ্চারে যাবে। উপনিবেশের যন্ত্রণা ও গ্রস্ততা, প্রতিরোধ ও স্বীকৃতির দ্বান্দ্বিক অবস্থান থেকেই তাদের যাত্রা। সামন্ত ও ধনতন্ত্রের টানাপোড়েনের মধ্যে, আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর অস্থির ভাঙাগড়ার মাঝখানেই এই ধরনের বেপরোয়া ও উদাসীন চরিত্রের পরিকল্পনা সম্ভব। বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘোর পরিবেশই বাঙালির কাছে সে সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছিল।

অনভ্যস্ত বাঙালিকে বাইরে বেরোনোর পথ ও পদ্ধতি শেখাতে চাইছেন লেখক। তাই ‘যক্ষপতির রত্নপুরী’তে দেখি বিমল বাঙালির সাধারণ প্রবাস যাত্রার রীতিপ্রকৃতির সমালোচনা করছে— “প্রবাসে যেতে হলে বাঙালিরা মস্ত বড় গৃহস্থালি ঘাড়ে করে বেরোয়— বড়-বড় ট্রাঙ্ক, সুটকেস, বিছানা, পোঁটলা-পুঁটলি!”[৮৬] পথে-বিপথে কত কম জিনিস নিয়ে দৈনিক যাপন অনায়াসে সম্ভব সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাবে বিমল— “যা দরকার সে সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে, অথচ আমাদের মালের সংখ্যা এত কম যে, কুলি ডাকবার দরকার হয় না— নিজেদের মাল নিজেরাই বয়ে নিয়ে যেতে পারি।”[৮৭] বাঙালির বেরিয়ে পড়তে পারার বাস্তবসম্মত রূপরেখা তৈরি করতে চাইবেন লেখক।

বাঙালিকে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় করে তুলতে যতোই সচেষ্ট হন লেখক, এই বাঙালির মধ্যে ততোই প্রকট হতে থাকে লিঙ্গ-রাজনীতি-নির্ধারিত বাঙালি-পুরুষের চেহারা। বিমল-কুমার সিরিজে একদিকে যেমন পুরুষ চরিত্রই মুখ্যত ভিড় করে আছে, অন্যদিকে বাঙালি নারী মাত্রেই যে অরক্ষিত, সেই চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছে বিনয়বাবুর মেয়ে মৃণু চরিত্রের অবতারণার মাধ্যমে। যদিও লেখক জানিয়ে দেন, “কলেজে পড়া বাঙালীর মেয়ে বললে মনের মধ্যে যে দুর্বলতার প্রতিমূর্তি ভেসে ওঠে, মৃণু তেমন মেয়ে নয়। তার দীর্ঘ ঋজু দেহখানি শক্তি ও স্বাস্থ্যে সুন্দর।”[৮৮] তবু ‘হিমালয়ে ভয়ঙ্কর’ কিংবা ‘সূর্যনগরীর গুপ্তধন’ উভয় উপন্যাসেই তাকে অরক্ষিত ও অপহৃত হিসেবে দেখা যায়। নারীমাত্রেই উদ্ধারকামী ও পুরুষ তার উদ্ধারকর্তা এই ছক কোথাও বানচাল হয় না। বরং ‘বাঙালী বীরবালা’[৮৯] বলে মৃণুকে চিহ্নিত করেও তাকে উদ্ধারকামী রূপে ধার্য করায় এই ছক আরো গলদবিহীন বলে প্রতিভাত হয়।

বাঙালি নারী যে আদতে অরক্ষিত, পুরুষের বানিয়ে তোলা ঘেরাটোপ না থাকলে যে সে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে যে কোনো অবস্থাতেই, যতই সে সাহসিনী হোক না কেন, এ

ধারণা আরও দৃঢ়মূল হয় যাতে কিশোর মনে তার জন্য এমনকি যৌন হেনস্তার প্রসঙ্গও শিশু-কিশোর সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধা করেন না লেখক। বাংলা শিশু-কিশোর অভিযান সাহিত্য যৌনতা এবং প্রেমের প্রসঙ্গে আশ্চর্যরকম নীরব এমনিতে। পুরুষ-শিশুর ব্রহ্মচর্যে যাতে কোনো অবান্তর ফাটল এসে না জোটে, তাই তাদের জন্য নির্মিত শিশু-সাহিত্যকেও করে রাখা হয় যৌনতা-বর্জিত। সেই যৌনতাকেও আমরা ব্যবহৃত হতে দেখব যখন বাইরের জগতে মেয়েদের পা-রাখার সময় আসবে। রীতিমতো জেদ করে, বিমল-রামহরি-বিনয়বাবুদের নিষেধের তোয়াক্কা না করেই দক্ষিণ আমেরিকায় ইনকা সভ্যতার গুপ্তধন খোঁজায় সঙ্গী হয় মৃণু। বিনয়বাবুর মনে হয়, "পৃথিবী ওল্টাতে বুঝি আর দেরি নেই!"[৯০] রামহরির বক্তব্য, "ভগবান পুরুষ গড়তে বসে ভুল করে তোমাকে গড়ে ফেলেছিলেন।"[৯১] মৃণু তাতে দমবার পাত্রী নয়। তার স্পষ্ট বক্তব্য, "সেইজন্যই আমি পুরুষের ব্রত নিয়ে ভগবানের ভুল শোধরাবার চেষ্টা করছি।"[৯২] বিমল কিংবা রামহরির প্রতিটি যুক্তির পিছনে পাল্টা যুক্তি দিয়ে যায় সে। অবশেষে হাজির হয় সূর্যনগরীর দেশে। সেখানে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় লাল-মানুষ তথা ইনকাদের জনগোষ্ঠীর অন্যতম সর্দার কালো-বাজের সঙ্গে। যার সম্পর্কে মৃণু বিমলকে জানায়, "মিঃ ফিলিপের সঙ্গে কথা কইতে কইতে কালো বাজ কি-রকম চোখে বার বার আমার পানে তাকাচ্ছিল, সেটা লক্ষ্য করেছ কি?"[৯৩] শুধু তাই নয়, এই তাকানোর ধরনকে আরও স্পষ্ট করে দিয়ে মৃণু বলে, "কালো বাজের চোখ যেন খাই খাই করছিল!"[৯৪] এখন প্রশ্ন হল শিশু-কিশোর সাহিত্যের যৌনতা বিষয়ে স্থায়ী ও অটল মৌনতার দেওয়াল টপকে এমন মন্তব্য যদি করতেই হয় নারীর অরক্ষিত অবস্থানকে দেগে দেওয়ার জন্য, তাহলে অভিযান-নায়কদের সঙ্গী, ডাকাবুকো, ভয়হীন মৃণু চরিত্রের অবতারণার প্রয়োজনই বা হল কেন লেখকের? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সেইসময় ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছিল নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি, যে প্রশ্ন শিক্ষিত বাঙালি

সমাজে উঠতে শুরু করেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় থেকেই। পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও যদি এসে দাঁড়ায় দেশের উন্নতিকল্পে, তাহলে আরও সুবিধা হবে উন্নততর দেশ গঠনে— এ ধারণা যেমন কাজ করতে শুরু করেছিল বিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে, তেমনই ক্রমশ দৃশ্যগোচর হতে থাকা বৃহত্তর পৃথিবী থেকে এই ধারণার পক্ষে প্রমাণও সে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছিল। তাই মৃণুকে আমরা বলতে শুনি,

> মেয়ে হলেই যে আলমারির সাজানো পুতুল হতে হবে, এ কথা আমি মানব না। অজ্ঞাতবাসে যাবার সময়ে পাণ্ডবরাও কি দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাননি? চাঁদবিবি, রানী লক্ষ্মীবাই কি সাজানো পুতুল ছিলেন? আজও কি রুশিয়ায় আর চীনদেশে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েরাও যুদ্ধ করছে না? মেয়ে হলেই ভীরু হতে হবে?[৯৫]

মৃণুর গানেও তাই পাওয়া যায় ভয়হীন অভিযানের ইঙ্গিত—

> সারথি হয় বিপদ-রথে
> কে সে ভাগ্যবন্ত রে—
> জয়যাত্রার রথ ছুটেছে
> দূর অজানা মন্তরে![৯৬]

কিংবা ইনকা নিজের সম্রাজ্ঞী করবে বলে মৃণুকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর, অবশেষে মৃণু উদ্ধার পেলে, গানে গানে সে জানিয়ে দেয়, রাজার বাধ্য, স্বামী-অনুগত ইনকী বা রানী হয়ে সে জীবন কাটাতো না নিশ্চয়ই। দেখিয়ে দিত সে মেয়েদের প্রতিস্পর্ধা—

> ইনকা যদি করত আমায় ইনকী রে!
> চক্ষে তবে জ্বলত আমার অগ্নিরাগের ফিনকি রে!

এক চড়ে তার ঘুরত মাথা,

কুঁচকে যেত বুকের ছাতা,

ভাবত বোকা— এমনি ভাবেই

কাটবে আমার দিন কি রে,—

এ যে বিষম ইনকী রে![৯৭]

মৃণুকে সহ-অভিযাত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে তবু বিমলের অস্বস্তি ঘোচে না কিছুতেই। সেই অস্বস্তির কারণও বিমল স্পষ্ট করেই বলে— "তুমি তো আমাদের মতো পুরুষ-মানুষ নও!"[৯৮] বীরত্ব পুরুষের একচেটিয়া অধিকার নয় বলে মৃণু ঘোষণা করলে, বিমল বলে,

> আমি তোমার মতো কাঁদুনে বীরবালার সঙ্গে তর্ক করতে ভয় পাই। তবে তর্ক না করেও এ-কথা বলতে পারি যে, তুমি সঙ্গে গেলে আমাদের তোমাকে নিয়েই বিব্রত হয়ে থাকতে হবে। আমরা ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যাচ্ছি না মৃণু![৯৯]

যদিও মৃণুর খোঁজে হিমালয়ে গিয়ে দানব-মানুষদের হাতে বন্দী হওয়ার পর বিমলরা মুক্তি পায় মৃণুরই বুদ্ধিতে, যদিও বারেবারে উল্লিখিত হয় মৃণুর শারীরিক সক্ষমতা, বন্দুক চালানোয় পারদর্শিতা ও সাহসিকতার প্রসঙ্গ, তবুও বিমলের চোখে মৃণু থেকেই যায় এক বাড়তি বোঝা হয়ে, যাকে স্থানে স্থানে অপরিণামদর্শী আচরণ করতেই দেখবে সে এবং বিরক্ত হবে। কোথাও আবার রক্তাত বীভৎস দৃশ্য দেখে বলবে "কুমার, ভাগ্যে মৃণু আমাদের সঙ্গে আসেনি! এ বীভৎস দৃশ্য সে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না!"[১০০] রাতে সবাইকে নিয়ম করে পাহারায় থাকতে হলেও সেক্ষেত্রে বাদ যাবে কেবল মৃণু। নারীর সঙ্গে কেবল যেন কোমলতারই সম্পর্ক— এই সমাজ প্রচলিত ধারণাকে বহন করে নিয়ে যাবে নায়ক-বিমল ও তার সঙ্গীরা।

শুধু মৃণুর ক্ষেত্রেই নয়, বিমলের নারী সম্পর্কিত একরকম বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে অন্যান্য উপন্যাসেও। 'জেরিনার কণ্ঠহার', 'সুন্দরবনের রক্তপাগল' কিংবা 'কুমারের বাঘা গোয়েন্দা' উপন্যাসে খলনায়ক, দস্যু অবলাকান্তের প্রতি বিমলের ঘৃণার কারণ যেমন অবলার নিষ্ঠুর দস্যুবৃত্তি, তেমনই অবলার নারীসুলভ কণ্ঠও বিমলের মনে বিতৃষ্ণার জন্ম দেওয়ার অন্যতম উপাদান—"বিরাট দেহে অমন কুৎসিত নারীকণ্ঠ ভগবান বোধহয় পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনও পুরুষকে দান করেননি!"[১০১] আবার 'যক্ষপতির রত্নপুরী' উপন্যাসে কাফ্রিস্থানের মেয়েরা বিমলদের নদীর জলে ফেলে দেবে বলে আক্রমণ করলে বিমলের মনে হয়, "নারীর ভয়ে পালাব? হ্যাঁ, তাছাড়া উপায় নেই! আত্মরক্ষার জন্যে মেয়েদের গায়ে তো আর হাত তুলতে পারি না।"[১০২] যোদ্ধা হিসেবে সমকক্ষ যে নয় মেয়েরা, তাদের সঙ্গে লড়তে গেলে যে পৌরুষকেই ছোট করা হবে এ বিষয়ে সন্দেহহীন বিমল লিঙ্গ রাজনীতির আবর্তে শেষ অবধি পুরুষ-পেশীশক্তির পক্ষেই থেকে যায় বরাবর।

হেমেন্দ্র কুমার বাংলা সাহিত্যে অভিযান সিরিজ শুরু করছেন যখন, তার সামনে নেই বাংলা সাহিত্যের অনুরূপ কোনো সিরিজের মডেল। ইংরাজি সাহিত্যের উদাহরণ তার হাতের কাছে থাকলেও বাংলা অ্যাডভেঞ্চার সিরিজের কাঠামো তাকে সাজাতে হয়েছে গোড়া থেকে। বিমল-কুমার সিরিজকে তাই যেতে হয়েছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। অভিযান কাহিনির নতুন এই পথ-হাঁটার মধ্য দিয়ে বিমল-কুমার সিরিজের গঠনে বিশেষ কতকগুলি নির্মাণচিহ্ন ফুটে উঠেছে—

প্রথমত, বৃহত্তর পৃথিবীর প্রতি বাঙালি নব্য কিশোরকে আকর্ষিত করতে চান বলেই অভিযান কাহিনিগুলিতে গন্তব্য স্থানগুলির তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। সচেষ্ট থেকেছেন তথ্যগুলিকে সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নানা নতুন খোঁজ গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। গল্পের চরিত্রদের মুখ দিয়েই স্থানে স্থানে সেইসব তথ্যের উৎস পাঠককে জানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন বস্তুনিষ্ঠতা। যেমন, 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' উপন্যাসে জার্মান ভূপর্যটক ও নৃতত্ত্ববিদ হেলমুট ডে তেরার (১৯০০-১৯৮১) অজানা জীবের দেহাবশেষ পাওয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করেন লেখক।[১০৩] আবার হিমালয়ে দানবাকৃতি মানুষ দেখতে পাওয়ার প্রসঙ্গ যে লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়, তাও পাদটীকায় জানিয়ে দেন লেখক— "আমরা যা বললুম, তা মন-গড়া মিথ্যা কথা নয়। অধুনালুপ্ত ইংরেজি দৈনিকপত্র "ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজের" পুরনো ফাইল খুঁজলে সকলেই এর বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করতে পারবেন।"[১০৪]

আবার 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাসে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কিত তথ্যকে বিশ্বাসযোগ্য করতে লেখক পাদটীকায় লেখন,

> বিনয়বাবুর ডায়ারিতে মঙ্গলগ্রহের যেসব অদ্ভুত তথ্য আছে, তার অধিকাংশই প্রমাণিত সত্য, যাঁদের বিশ্বাস হবে না, তাঁরা এ সম্বন্ধে সিয়াপ্যারেলি, লাওয়েল, গান, স্ট্যানলি, উইলিয়ামস ও শ্লামেরিয়ান প্রভৃতি বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতামত পড়ে দেখতে পারেন।— ইতি লেখক।[১০৫]

এই তথ্যসূত্র জ্ঞাপন একদিক দিয়ে যেমন কিশোর পাঠককে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াসেরও অংশ, তেমনই বৈজ্ঞানিক ও পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সঙ্গে অপরিচিত, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে কাহিনি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে কিনা সেই দোলাচলেরও প্রকাশ।

তৃতীয়ত, উপন্যাসগুলি যে একই সিরিজের অন্তর্গত তা বোঝানোর জন্য একটি উপন্যাসের মধ্যে পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে ঘটে যাওয়া এক বা একাধিক অভিযানের উল্লেখ করেন লেখক। কোথাও বা সেই পূর্ববর্তী অভিযানের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। যেমন 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাসে বিনয়বাবু বলেন, “যকের ধন বলে আমি একটা উপন্যাস পড়েছিলুম, তাতেও বিমল, কুমার, রামহরি আর বাঘা কুকুরের নাম আছে। কী আশ্চর্য মিল।”[১০৬] ‘ময়নামতীর মায়াকানন’ শুরু হয় ‘মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন’-এর শেষ অংশকে উদ্ধৃত করে। ‘মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন’-এর বর্ধিত অংশ রূপেই বর্ণিত হয় ‘ময়নামতীর মায়াকানন’। ‘আবার যখের ধন’ উপন্যাসে বিমল কুমারকে যখন জিজ্ঞাসা করে, “তাহলে তুমি আবার মঙ্গল গ্রহে ফিরে যেতে চাও?”[১০৭] তখন ‘মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন’-এর উল্লেখ করে ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। ‘হিমালয়ের ভয়ঙ্কর’ উপন্যাসে পাঠকদের কাছে চরিত্রদের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানান যারা ‘যখের ধন’ উপন্যাস পড়েছে তারা বিমল-কুমার-রামহরিকে চেনে ও ‘মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন’ ও ‘ময়নামতীর মায়াকানন’ উপন্যাসের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে বিনয়বাবুর পরিচয় পূর্বেই ঘটে গেছে। ‘সূর্যনগরীর গুপ্তধন’-এ আবার উল্লিখিত হবে বিমলদের মঙ্গলগ্রহ অভিযান অর্থাৎ ‘ময়নামতীর মায়াকানন’-এর প্রসঙ্গ এবং মৃণুর পরিচয় দেওয়ার সূত্রে আসবে পূর্বের ‘হিমালয়ের ভয়ঙ্কর’ উপন্যাসের প্রসঙ্গ। আবার ‘অসম্ভবের দেশে’ উপন্যাসে কুমার বলবে, “মঙ্গলগ্রহে, ময়নামতীর মায়াকাননে, আসাম ও আফ্রিকার বনেজঙ্গলে, সুন্দরবনে অমাবস্যার রাতে আর হিমালয়ের দানবপুরীতে অনেক অসম্ভব রহস্যই আমরা দেখলুম।”[১০৮] সামগ্রিক এক সিরিজের ক্রমবিন্যাস ফুটে উঠতে থাকবে এভাবে। আবার ‘জেরিনার কণ্ঠহার’, ‘সুন্দরবনের রক্তপাগল’ ও ‘কুমারের বাঘা গোয়েন্দা’ উপন্যাসে একই দস্যুর পিছনে ধাওয়া করবে বিমলরা। উপন্যাস তিনটি পরস্পর সংযুক্ত হিসেবে দেখা দেবে। যে অবলাকান্তের সঙ্গে

বিমলদের লড়াই শুরু হবে 'জেরিনার কণ্ঠহার'-এ তারই মৃত্যু ঘটবে 'কুমারের বাঘা গোয়েন্দা' উপন্যাসে। এভাবে একটি উপন্যাসে সিরিজের অন্যান্য পূর্ববর্তী উপন্যাসের উল্লেখের মাধ্যমে গোটা সিরিজের মধ্যে সুতোর বাঁধন নির্মাণ করে চলবেন লেখক।

চতুর্থত, এই সিরিজের উপন্যাসগুলির কথককে নিয়ে আমরা বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখব লেখককে। 'যকের ধন' উপন্যাসে কুমারের কথনের মাধ্যমে সিরিজ শুরু হলেও কুমারকে ধারাবাহিকভাবে কথক হিসেবে দেখা যায় না। 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাসেই সর্বজ্ঞ কথকের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণিত হতে দেখা যায়। আবার উপন্যাসের মাঝখানেই বিনয়বাবুর ডায়েরি উদ্‌ধৃত করার মাধ্যমে সর্বজ্ঞ কথকের বয়ান সমাপ্ত হয় ও বিনয়বাবু কথক হিসেবে দেখা দেন। যুক্তি হিসেবে লেখক জানান, "বিনয়বাবু স্বয়ং মঙ্গলগ্রহের যে বর্ণনা লিখেছেন, আমাদের কথার চেয়ে তা বেশি চিত্তাকর্ষক হবে বলে আমরা এবার থেকে তাঁর ডায়ারির লেখাই তুলে দেব।"[১০৯] কথন কৌশল কেমন হলে পাঠকের তা ভালো লাগবে বেশি, তাই নিয়ে লেখক চিন্তিত হলেও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন না। এরপর 'ময়নামতীর মায়াকানন'-এ বিনয়বাবুর ডায়েরি-উদ্‌ধৃত কথন চলতে থাকলেও 'আবার যখের ধন' উপন্যাসে বিনয়বাবুর চরিত্রটিই থেকে যায় অনুপস্থিত। সর্বজ্এঞ কথকের ওপর ভার বর্তায় কাহিনি বর্ণনার। 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', 'অসম্ভবের দেশে', 'নীল সায়রের অচীনপুরে', 'জেরিনার কণ্ঠহার' প্রভৃতি উপন্যাসে সর্বজ্ঞ কথকের বয়ান বজায় থাকে। কুমারের কথন ফেরে 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন' উপন্যাসে। আবার 'যক্ষপতির রত্নপুরী' উপন্যাসে স্বয়ং বিমলকেই দেখা যায় কথকের ভূমিকায়। তবে এখানে খেয়াল রাখা দরকার, যেহেতু অভিযান নায়ক হবে ভয়ভীতিহীন, দুর্লঙ্ঘ্য জাগতিক প্রতিরোধগুলিকে জয় করার শক্তি ও মেধাসম্পন্ন এবং নিখুঁত, তাই অভিযান কাহিনিতে আবশ্যিকভাবে কথক ও নায়কের মধ্যে গড়ে উঠবে ভেদরেখা। কথক ও নায়ক একই চরিত্র—

এমনটা অভিযান কাহিনিতে বিশেষ একটা ঘটতে দেখা যায় না তাই। ঘটলে তা ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। সেকারণেই 'যক্ষপতির রত্নপুরী'তে বিমলের বয়ান অনেকসময় আত্মম্ভরি বলে মনে হয়। আসলে ভয়ভীতি, আশঙ্কা, উদ্বিগ্নতা, টানাপোড়েন— অভিযান নায়ক থাকে এসবের ঊর্ধ্বে। তাই প্রয়োজন হয় কথকের কিংবা অভিযান সঙ্গীর। অভিযানসঙ্গী কিংবা কথক যেন নায়কের অপ্রকাশযোগ্য মানসিক অবস্থাগুলোরই প্রতিনিধিত্ব করে। এমনকি কথকের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারবোধও হয়ে থাকে নায়কনির্ভর। এই সঙ্গী ও কথকের কাজটি সামলেছে কুমার। এমনকি যেখানে বিনয়বাবু কিংবা সর্বজ্ঞ কথকের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে সেখানেও কুমার বিমলের অপ্রকাশিত মানসিক অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করেছে। বিমলের ছায়া কুমার। বিমলেরই অচ্ছেদ্য অংশ। যেন দ্বিতীয় সত্তা (alter ego)। খেয়াল রাখা প্রয়োজন, লেখক আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন কুমার ও বিমল 'দুজনেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে একই তিথিতে এবং একই দিনে।'[১১০] 'জেরিনার কণ্ঠহার' উপন্যাসে কুমারকে বলতে শোনা যায়, "তুমি তো জানোই ভাই বিমল, যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি ততক্ষণ আমি নিজের মস্তিষ্ককে ঘুম পাড়িয়ে আর নিজের বুদ্ধিকে মনের কৌটোয় বন্দি করে রাখি।"[১১১] কুমারের উপস্থিতি আসলে বিমল আর পাঠকের মধ্যে এক সুগম সেতু নির্মাণ করার জন্যই, যার একদিকে পাঠক ও আরেকদিকে নায়ক দাঁড়িয়ে। আসলে পাঠক কথকের দ্বন্দ্বজর্জর মানবীয় অবস্থানটিতেই নিজেকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। নায়কের অতিমানবিক অবস্থানটি থাকে পাঠকের গম্যতার বাইরে। নয়তো বিস্ময় নির্মাণ যেমন ব্যাহত হবে, তেমনি নায়ক থেকে প্রাপ্ত নৈতিক বিচারগুলিও পাঠকের কাছে হয়ে উঠবে শর্তসাপেক্ষ। সর্বজ্ঞ কথকের ক্ষেত্রেও বিষয়টা তাই। অগম্য নায়ক-অবস্থানের সাথে সেতু সংযোগের কাজ সর্বজ্ঞ কথকও করে। শুধু পাঠকের পক্ষে এক্ষেত্রে সর্বজ্ঞতালাভ যেহেতু সম্ভব নয়, তাই সম্ভব হয় না নিজেকে প্রতিস্থাপিত করাও। তখন অন্যান্য অভিযান সঙ্গীদের

অবস্থানের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেয় পাঠক। এক্ষেত্রেও নায়কের বিচার ধারাই কিন্তু প্রভাবিত করতে থাকে পাঠককে। নায়কের নৈতিক অবস্থান ও মূল্যবোধ যাতে গ্রহণযোগ্য হয় ও সমাদৃত হয় পাঠকের কাছে, সেইভাবেই বয়ান নির্মাণ করেন লেখক।[১১২]

পঞ্চমত, বিমল-কুমারের অভিযানের ঘটনাপ্রবাহের মাঝখানে নানা স্থানে গল্প শোনান লেখক, ধারাবাহিক উত্তেজনা যাতে একঘেয়েমি সৃষ্টি না করে সেই কারণেই। অনেকক্ষেত্রেই হেমেন্দ্রকুমার এখানে অন্যান্য লেখকের গল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে উপন্যাসের বিশেষ কোনো প্লট নির্মাণেও নিয়েছেন অন্য লেখকের কাহিনির সাহায্য। 'যকের ধন' উপন্যাসে বিমল যেমন জঙ্গলের মধ্যে বসে শুনিয়েছে ভূতের গল্প। আবার 'অসম্ভবের দেশে' উপন্যাসে লেখক জানিয়ে দিয়েছেন "পশুর মাথায় মানুষের মস্তিষ্ক চালান করবার এই অদ্ভুত কল্পনার জন্যে আমি এক বিলাতি লেখকের কাছে ঋণী।"[১১৩] প্রশান্ত সাগরের আগ্নেয়দ্বীপের মিশ্র-প্রাণীদের ধারণায় আছে এইচ. জি. ওয়েলসের (১৮৬৬-১৯৪৬) 'The Island of Dr. Moreau' (১৮৯৬) উপন্যাসের প্রভাব, যা লেখক উপন্যাসের মধ্যে স্বীকারও করে নিয়েছেন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, হেমেন্দ্রকুমার রায় শুধু অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস ও অ্যাডভেঞ্চার নায়ক বাংলা সাহিত্যে প্রথম আমদানিই করছেন না, সিরিজ নির্মাণের মধ্য দিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করছেন এবং জনপ্রিয়ও করে তুলছেন। অনির্দিষ্ট পথে হাঁটতে গিয়ে ভাঙাগড়া চালাচ্ছেন নির্মাণে। কেবলমাত্র বিমল-কুমার সিরিজই হেমেন্দ্রকুমারের অভিযান কাহিনির দৃষ্টান্ত নয় যদিও, তবু কেন্দ্রীয়ভাবে অভিযানকে সামনে রেখে বিমল-কুমারের মতো অন্যান্য সিরিজ কিংবা উপন্যাসের চরিত্ররা উঠে আসেনি হেমেন্দ্রকুমারের সাহিত্যে। অন্যান্য যেসব উপন্যাসে ফুটে উঠেছে অ্যাডভেঞ্চারের চরিত্রলক্ষণ, সেগুলিও খতিয়ে দেখব আমরা।

জয়ন্ত-মানিক সিরিজ:

গোয়েন্দা জয়ন্ত ও তার সহকারী মানিককে নিয়ে গড়ে উঠেছে হেমেন্দ্র কুমার রায়ের জয়ন্ত-মানিক সিরিজ। মূলত গোয়েন্দা কাহিনি হলেও বাঙালি পাঠক যে ধরনের গোয়েন্দা কাহিনি পাঠ করতে অভ্যস্ত ছিল, তার তুলনায় হেমেন্দ্রকুমারের গোয়েন্দা কাহিনি আলাদা। সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২) তার *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি* (১৯৮৮) গ্রন্থে হেমেন্দ্রকুমার কর্তৃক আমদানি করা দুটি নতুনত্বের উল্লেখ করেছেন—

প্রথমত, ডিটেকটিভ ভাবনায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঞ্চার। জয়ন্ত-মানিক সিরিজের প্রথম উপন্যাস 'জয়ন্তের কীর্তি' (১৯৩৭) উপন্যাসেই অপরাধের পদ্ধতি ও জয়ন্তের অপরাধ আবিষ্কারের পদ্ধতিতে যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও বিজ্ঞানের নানা তথ্যের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়, তা বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে এর আগে ছিল না। এ বিষয়ে হেমেন্দ্র কুমার রায়ের উপন্যাসের শেষে পরিশিষ্টতে নিজেই জানিয়েছেন, "এটি হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অপরাধের কাহিনি এবং বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে নূতন। এর আখ্যানবস্তু কাল্পনিক হলেও কতকগুলি সত্য তথ্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর নির্ভর করেই তা কল্পনা করা হয়েছে।"[114] অপরাধ বিজ্ঞানের নানা নতুন পদ্ধতি সম্পর্কেও লেখক আলোচনা করেছেন এই 'পরিশিষ্ট' অংশে। জয়ন্ত-মানিক সিরিজের নানা উপন্যাসেই দেখতে পাওয়া যাবে এই বৈজ্ঞানিক অপরাধ ও বিজ্ঞান-নির্ভর অপরাধী অন্বেষণের নমুনা।

দ্বিতীয়ত, 'ত্রিশূল' ডিটেকটিভ কল্পনা। গোয়েন্দা জয়ন্তের সহকারী রূপে মানিক ও পৃষ্ঠপোষক রূপে ইনসপেক্টর সুন্দরবাবুর উপস্থাপনার মাধ্যমে লেখক গোয়েন্দা ও তার দুই সঙ্গী মিলিয়ে তিন জনের দল নির্মাণ করেছেন। এছাড়াও অন্য সিরিজে ডিটেকটিভ হেমন্ত, সহচর রবীন ও

পৃষ্ঠপোষক রূপে ইনসপেক্টর সতীশবাবু উপস্থিত থেকে ত্রিশূল গোয়েন্দার ধারণাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

এখন প্রশ্ন হল গোয়েন্দা সিরিজ হিসেবে সমাদৃত জয়ন্ত-মানিক সিরিজ কী অভিযান তথা অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের আলোচনার মধ্যে আদৌ গণ্য হওয়ার কথা? খেয়াল রাখা প্রয়োজন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একাধিক গোয়েন্দা সিরিজের মধ্যে আমরা কেবল জয়ন্ত-মানিক সিরিজকেই অ্যাডভেঞ্চার আলোচনায় স্থান দিচ্ছি। কারণ গোয়েন্দা কাহিনি হলেও জয়ন্ত-মানিক সিরিজে নানা ক্ষেত্রে স্থানিক সরণ, অজানা পটভূমি, বিপদের ঝুঁকি তাকে অ্যাডভেঞ্চারের সমতুল্য করে তুলেছে। জয়ন্ত-হেমন্ত দুই আলাদা গোয়েন্দার নামের ধ্বনিগত মিল যেমন বুঝিয়ে দেয় দুই গোয়েন্দার মধ্যে একরকম অন্তর্লীন অভিন্নতাই কামনা করেছেন লেখক, তেমনই গল্পের রসবস্তুর ভিন্নতাকে নির্দিষ্ট করতেই গোয়েন্দা ও তার সহকারীদের নামের পার্থক্য এনে আলাদা সিরিজ নির্মাণ করেছেন লেখক। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের মন্তব্যটি খেয়াল রাখার মতো— “ত্রিশূল ডিটেকটিভের এই নামবদলের কারণ কী জানতে পাঠক উৎসুক হতে পারেন। মনে হয় কারণ আর কিছু নয়, ঘটনার রূপ রস নিয়ে। প্রথম সেটের (জয়ন্ত-মানিক সিরিজ) কাহিনিগুলিতে অলৌকিকের কাছ ঘেঁষা অসম্ভবত্ব আছে, বিভীষিকা আছে, রোমহষর্ক এ্যাডভেঞ্চার আছে। দ্বিতীয় সেটের (হেমন্ত-রবিন সিরিজ) কাহিনিতে এ সব নেই, আছে গোয়েন্দাগিরির চাতুর্য। ঘটনার স্বরূপে বিভিন্নতা থাকার জন্যই হেমেন্দ্রকুমার ডিটেকটিভের ভিন্নতা করেছেন।”[১১৫]

‘জয়ন্তের কীর্তি’তে শত্রুর বজরায় আটক জয়ন্ত মানিকের ঝড়ে উত্তাল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর সংগ্রামে যেমন লেগেছে বিপদসীমা পার করা রোমাঞ্চের ছোঁয়া, তেমনই ‘শনি-মঙ্গলের রহস্য’ উপন্যাসে রতনপুর গ্রামের রক্তপিপাসু জাগ্রত ডাকাতে-কালীর কিংবদন্তী

সমন্বিত মন্দির অঞ্চল, যেখানে শনি-মঙ্গলবারে পরপর খুন হয়েছে সেই পটভূমিটিও চেনা চৌহদ্দির কাছাকাছি হয়েও রহস্যময়তায় অচেনা হয়ে উঠেছে। কাহিনির চরিত্র মহেন্দ্রবাবুর কথায় লেখক সে স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন—

> দেখছেন না, এত কাছেই লোকালয়, তবু এখানে অরণ্য কত নিবিড় হয়ে উঠেছে! লোকালয়ের কাছে এতো নির্জনতা আর নিস্তব্ধতা আপনারা আর কোথাও দেখেছেন কি? এ ভয়াবহ ঠাঁই, কোনো অতি-বড়ো ভক্তও ভরসা করে দেবীকে এখানে পূজা দিতে আসে না। মানুষের সঙ্গ হারিয়ে এ-জায়গাটা এখন যেন অভিশপ্ত হয়ে আছে।[১১৬]

এই সেটিং (Setting) নির্মাণ তো বটেই, অপরাধীকে চিহ্নিত করতে জয়ন্তের একা একা মন্দির প্রাঙ্গনে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অনুসন্ধান চালানো কিংবা আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে যে প্লট নির্মাণ করেন লেখক, সেটিং সহযোগে সেই প্লটও গোয়ান্দা কাহিনির পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি হিসেবেও উপন্যাসটিকে স্বীকৃতি দিতে পারে। আবার 'মানুষ পিশাচ' (১৯৫৫) উপন্যাসে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে পিশাচ-মানবদের দৌরাত্ম্য, বিপদের সঙ্গে লড়াই করে পিশাচের আতঙ্ককে সমাপ্ত করায় জয়ন্তদের বীরত্ব— গোটা বিষয়টিতে জয়ন্তের গোয়েন্দাসুলভ পর্যবেক্ষণ থাকলেও, অনেক বেশি জায়গা করে দিয়েছে জয়ন্ত-মানিকদের সাহসিকতা ও বিপদ সংকুল পথে এক অলৌকিক আবহের মধ্যে সত্য উদঘাটনের জন্য অভিযানকে। উদাহরণের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে যাওয়া চলে। অজানা পটভূমিতে, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অপরাধীর অন্বেষণ জয়ন্ত-মানিক সিরিজের অন্যতম লক্ষণ হয়ে উঠে তাকে গোয়েন্দা সিরিজের পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিরও নিকটবর্তী করে তুলেছে।

জয়ন্ত-মানিক সিরিজে অ্যাডভেঞ্চারের লক্‌ষণ কেবলমাত্র লক্ষণ হয়েই থাকেনি, পুরোদস্তুর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিই হয়ে উঠেছে যখন জয়ন্ত-মানিকদের সঙ্গে একত্রিত ভাবে উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে বিমল-কুমার ও কখনো কখনো তাদের সঙ্গী কুকুর বাঘা ও ভৃত্য রামহরি। অন্তত নয়টি এমন উপন্যাসের খোঁজ পাওয়া যায় যেখানে বিমল-কুমার ও জয়ন্ত-মানিক একইসঙ্গে উপস্থিত। উপন্যাসগুলি হল— 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন' (১৯৩৯), 'অমৃত দ্বীপ' (১৯৪৪), 'জেরিনার কণ্ঠহার', 'সুন্দরবনের রক্তপাগল', 'কুমারের বাঘা গোয়েন্দা', 'প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ', 'নৃমুণ্ড-শিকারি', 'সুলু সাগরের ভূতুড়ে দেশ' (১৯৫৬) ও 'গহন রাতের ছায়া'। 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন' উপন্যাসেই প্রথম জয়ন্ত-মানিক ও বিমল-কুমার একই সঙ্গে উপস্থিত হয়। আলাদা দুটি সিরিজকে একসঙ্গে মেলানোর জন্য প্রথম পরিচ্ছেদ 'উড়ন্ত ছায়ামূর্তি'তে লেখক ভূমিকা করে জানিয়ে দিয়েছেন,

> এই জয়ন্ত ও মানিক এবং বিমল ও কুমার একবার একটি অদ্ভুত ঘটনাক্ষেত্রে এসে পড়ে একত্রে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং সেই আশ্চর্য কাহিনি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমরা আজ সেই গল্পই আরম্ভ করলুম।[১১৭]

এরপর 'অমৃত দ্বীপ' উপন্যাস আসলে 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন' উপন্যাসেরই পরের অংশ। প্রথম উপন্যাসে 'তাও' ধর্মের গুপ্তদলের হত্যা-রহস্য ফাঁস করতে জয়ন্তদের সাহায্য করে বিমল ও কুমার। আর সেখান থেকেই ম্যাপ সংগ্রহ করে দ্বিতীয় উপন্যাসে 'তাও'দের বিশ্বাস অনুসারে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত অমৃত-দ্বীপে অভিযানে বেরিয়ে পড়ে তারা। মূলত বিমল ও কুমারের উৎসাহতেই বাকিরা এই দলে যোগ দেয়। লেখক জানিয়েছেন, "জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবুর এ অভিযানে যোগ দেবার ইচ্ছা ছিল না। বিমল ও কুমার একরকম জোর করেই

তাদের টেনে এনেছে।"[১১৮] 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন'তে বিমলদের সঙ্গে জয়ন্তদের সুন্দরবাবুর মাধ্যমে প্রথম দেখা ও একসঙ্গে কাজ করা ঘটলেও তাদের প্রথম অচেনা পটভূমিতে বেরিয়ে পড়া ঘটেছে 'অমৃত-দ্বীপ' উপন্যাসেই। পরবর্তী উপন্যাসগুলোয় যদিও জয়ন্ত সাগ্রহেই রাজি হয়েছে বিমলদের অভিযানের সঙ্গী হতে। যেন অমৃত-দ্বীপে অভিযান গোয়েন্দা জয়ন্তকে প্রাণিত করেছে নিরস গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি রোমাঞ্চকর অজানায় বেরিয়ে পড়তেও।

অভিযান-প্রিয় বিমল ও তদন্ত-প্রিয় জয়ন্ত একসঙ্গে অভিযানে সামিল হয় বটে, তবুও অভিযাত্রী ও গোয়েন্দার পার্থক্যকে কথায় ও কাজে বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকেন লেখক। 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন' উপন্যাসে বিমল জানায় কুমারকে,

> জয়ন্তবাবু গোয়েন্দাগিরিতে আমাদের ওপর টেক্কা মারতে পারেন, কিন্তু 'তাও' ধর্মের গুপ্তকথা আর লাউৎজুর নাম হয়তো তিনি জানেন না। নতুন অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে ওসব বিষয় নিয়ে আমরা বিশেষ আলোচনা করেছি বলেই লাউ-ৎজুর মূর্তি দেখেই চিনেছি আর বুঝেছি যে নীরদবাবুর হত্যাকান্ডের সঙ্গে অদ্ভুত কোনো ব্যাপারের সম্পর্ক আছে।[১১৯]

গোয়েন্দার কাজকর্মের পরিধি আর অ্যাডভেঞ্চারিস্টদের কাজকর্মের পরিধি যে আলাদা, যতোই তারা ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকুক একে অপরের, তা যেন বৃত্ত টেনে বুঝিয়ে দেন লেখক। অপরদিকে জয়ন্তের বক্তব্য থেকেও সেই বৃত্তের দাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে— "বিমলবাবু, আপনার পথ আর আমার পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনার মতো আমিও রূপকথার দেশে যাবার জন্য ব্যস্ত নই। আমি চাই হত্যাকারীর সন্ধান করতে।"[১২০] কিংবা, "বিমলবাবু আপনি খুঁজছেন খালি 'অ্যাডভেঞ্চার', তাই ওই মূর্তিটার জন্যে শোক করছেন। কিন্তু আমরা হচ্ছি গোয়েন্দা, আমাদের দৃষ্টি কেবল অপরাধীদের দিকেই।"[১২১] বিমল ও জয়ন্ত দুই আলাদা বৃত্তের নায়ক হলেও তাদের অসুবিধা হয়

না একে অন্যকে শ্রদ্ধা জানাতে ও তারিফ করতে। বাংলা সাহিত্যে অপরীক্ষিত অ্যাডভেঞ্চারকে, লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য বর্গ গোয়েন্দাকাহিনির সঙ্গে মিলিয়ে লেখক বাংলায় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির রাস্তাকেও সুগম করে তুলেছেন আরও।

গোয়েন্দা কাহিনি ও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির দুই বৃত্তের নায়ক কাছাকাছি এসেছে যখন, পারস্পরিক সম্মানে তাদের কোনো ত্রুটি না হলেও লেখকের বয়ানে ও প্লট নির্মাণে তখন শ্রেষ্ঠত্বের ঝোঁকটি গিয়ে পড়েছে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট বিমলের দিকেই। বহু জায়গায় জয়ন্তের বুদ্ধি ও শারীরিক ক্ষমতার তারিফ করলেও শেষ পর্যন্ত বিপদ থেকে উদ্ধারকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বিমলই। যখন যখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিমল। জয়ন্তের মুখে তাই মাঝে মাঝেই শোনা গিয়েছে, "বিমলবাবু, এ অভিযানের নায়ক হচ্ছেন আপনি, আমরা আপনার সহচর মাত্র।"[১২২] গোয়েন্দাগিরিতেও যে বিমল কম যায় না সে পরিচয় মেলে 'নৃমুণ্ড শিকারি' উপন্যাসে। সুন্দরবাবুকে তো বলে উঠতেই দেখা যায়, "বিমলবাবু আপনি গোয়েন্দা না হয়েও আমাদের সবাইকে যে হারিয়ে দিলেন! জয়ন্তকে যদি ফিরে পাই, বলব— দুয়ো জয়ন্ত।"[১২৩] শুধু তাই নয়, লেখকের কথন কৌশলেও বিমলই হয়ে উঠেছে মুখ্য। "বিমল এবং আর সকলেই বিস্ময়ে নির্বাকভাবে তাকিয়ে রইল।"[১২৪] কিংবা "বিমল সর্বাগ্রে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চলুন আমরা সবাই তাহলে এখনই সুন্দরবাবুর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাই।"[১২৫] বিমলকে আলাদা করে জয়ন্তসহ বাকিদের এক সর্বনামে ঢেকে দেওয়া কিংবা ছোট-বড় সিদ্ধান্তে বিমলকে এগিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে অভিযান নায়কের শ্রেষ্ঠত্বকে পাঠকমনে সুকৌশলে জারিত করেছেন লেখক।

জয়ন্ত মানিক সিরিজের অনেক স্থানেই যেমন এসে পড়েছে বিমলের প্রভাব, তেমনই জয়ন্তও হয়ে উঠেছে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট গোয়েন্দা হিসেবে জনপ্রিয়। গোয়েন্দা নায়ক জয়ন্তের নৈতিকতার মধ্যেও সমসময়ে আবর্তিত কতকগুলি চরিত্রলক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রথমত, জয়ন্ত নিজেকে হিন্দু বলেই দাবি করে। এ শুধু তার জন্মগত পরিচয় হয়ে থাকে না। তার জীবন-বীক্ষার মধ্যেও থাকে সেই হিন্দুত্বের বোধ। জয়ন্তের গোমাংস গ্রহণে বিরোধিতা, হিন্দু হিসেবে নিজেকে বারবার ঘোষণা করা, হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদকে একরকম মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টার সামিল বলে মনে হবে অনেকক্ষেত্রে। 'ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন' উপন্যাসে মানিকের বক্তব্যে যখন দেশ ও ধর্মের চিহ্ন মিলেমিশে যায়, তখন এই ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের ভাবনা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়— "খ্রিস্টানদের যেমন ক্রুশ, মুসলমানদের যেমন অর্ধচন্দ্র, হিন্দুদের যেমন পদ্ম, তেমনি চিন দেশেরও নিদর্শন হচ্ছে ড্রাগন!"[১২৬] এ বক্তব্যের কোনো আপত্তি জয়ন্তর মুখেও শোনা যায় না। তিনটি ধর্মের চিহ্নের পাশাপাশি একটি জাতির চিহ্ন এখানে যখন একই পংক্তিতে চলে আসে তখন এই বিপর্যাস আমাদের আরেকদিক দিয়ে সন্দিগ্ধ করে— হিন্দু-চিহ্ন পদ্মওকেও কি তবে ভারতবর্ষের চিহ্ন হিসেবেই দেখতে চাইছেন লেখক? ভারতবর্ষের হিন্দুকেন্দ্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোত কী এই ধারণার পিছনে কাজ করছে না? সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীরা যেসব গ্রন্থকে অনুসরণীয় বলে মনে করত, 'শ্রীমদ্ভাগবদগীতা', 'আনন্দমঠ' কিংবা 'ভবানী মন্দির' সবগুলিই ছিল ধর্ম-আকীর্ণ, হিন্দুত্বমুখী। কালীচরণ ঘোষ (১৮৯৬—১৯৮৪) তাঁর *জাগরণ ও বিস্ফোরণ* (১৯৭২) গ্রন্থে লিখছেন, "দেখা গেল এক অতি প্রাচীন গ্রন্থ; বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, অরবিন্দ যার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন— "যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম-বিনিঃসৃতা" সেই শ্রীমদ্ভাগবদগীতা এককই স্বাধীনতাকামীর মনের সকল স্তরই প্রভাবিত করতে সক্ষম। দেশভক্তের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও সর্ব্বোপরি

আত্মিক-শক্তির সর্ব্বাঙ্গীণ অনুশীলনকল্পে যে-সকল আখড়া, ক্লাব, সমিতি, আশ্রম প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছিল, যে শিক্ষাদানই হোক্, গীতার একটি উচ্চস্থান ছিল সেখানে।”[১২৭] পাশাপাশি স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমানে পূর্ণ বাঙালিকে সন্তানদল গঠনের উৎসাহ দিয়েছে ‘আনন্দমঠ’, জানিয়েছেন কালীচরণ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য অনুসারে "আনন্দমঠ-এ আমরা দেখলাম— মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন, মা যা হবেন,— ত্রিকালের মূর্ত্তির সঙ্গে বাঙ্গালীর পরিচয় হ'ল।”[১২৮] এই দেশমাতৃকার বিবর্তনের চিত্রকল্পে হিন্দু দেবীর রূপগুলি স্পষ্টতই ধরা আছে আনন্দমঠে। আনন্দমঠের আদর্শ অনুসরণেই *ভবানী মন্দির* (১৯০৪) রচনা করেন অরবিন্দ। কালীচরণ ঘোষ গ্রন্থটি সম্পর্কে জানিয়েছেন, “ক্ষুদ্র জাপান কি-ভাবে জগতে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সে-বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ধর্মের ভিত্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, কারণ ভারতের বিভিন্ন কালের জাগরণ ধর্মভিত্তিক, এবং তারই থেকে সে-জাগরণের উদ্ভব।"[১২৯] স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল, হিন্দুকেন্দ্রিক সশস্ত্র আন্দোলনের পথে হাঁটতে থাকা, গীতা ও আনন্দমঠে দীক্ষিত বাঙালির নায়ক জয়ন্ত যে হিন্দুধর্মের প্রতি নিজের আস্থা ও ভক্তি প্রদর্শন করবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, জয়ন্ত স্বাধীন গোয়েন্দা। মূলত শখ মেটানোর জন্যই তার গোয়েন্দাগিরি। বিমলের মতোই আর্থিক প্রয়োজনীয়তা যে তার নেই একথা কথাবার্তায় বারবার বুঝিয়ে দেয় সে। ‘জয়ন্তের কীর্তি' উপন্যাসে জয়ন্ত ও মানিকের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন, তারা দুজনেই এক কলেজে পড়ত, কিন্তু “নন-কোঅপরেশন আন্দোলনের ফলে তারা দুজনেই কলেজী পড়াশোনা ত্যাগ করেছিল।”[১৩০] নন-কোঅপরেশন তথা অসহযোগ আন্দোলন বাংলার ছাত্রসমাজে প্রভূত উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন, গোয়েন্দা কর্মচারী ব্যামফোর্ডের *অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের ইতিহাস* (১৯২৫)-এ উল্লিখিত সর্বভারতীয়

তথ্য অনুযায়ী কলাবিভাগীয় কলেজগুলি থেকে ১৯১৯-২০-এ ৫২৪৮২ জন ও ১৯২১-২২-এ ৪৫৯৩৩ জন ছাত্র গরহাজির হওয়ার মাধ্যমে বয়কটে অংশগ্রহণ করেছিল।[১৩১] জয়ন্ত-মানিকরা সেই চলতি বয়কটের ঢেউয়েই সামিল হয়েছিল নিঃসন্দেহে। তবে কোনোভাবেই তাদের আর্থিক সংকট যে তৈরি হয়নি, সেকথা জানিয়েছেন লেখক। মাতৃ-পিতৃহীন ও পৈতৃক সম্পদের অধিকারী হওয়ায় তাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ হবার ভয়ও নেই। স্বাধীন থাকার প্রাকশর্ত হিসাবে পিতা-মাতা তথা পরিবারের অনুপস্থিতি, পিছুটানহীনতা জয়ন্তের ক্ষেত্রেও আরোপিত হয়েছে, বিমলের মতোই। উৎপাদন যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন স্বচ্ছল অবস্থাতেই অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে শখের জানা-বোঝা বাড়ানোর আগ্রহ গড়ে উঠেছে জয়ন্তদের। সেখানে বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছে বিদেশী গোয়েন্দাকাহিনি পাঠ। 'জয়ন্তের কীর্তি' তো বটেই তারপরেও নানা স্থানে জয়ন্তকে দেখা গেছে বিদেশী গোয়েন্দা কাহিনি পড়তে। লেখক জানাচ্ছেন, এডগার অ্যালেন পো (১৮০৯-১৮৪৯), কন্যান ডইল(১৮৫৯-১৯৩০), মরিস লেবলাঙ্ক(১৮৬৪-১৯৪১) প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের এবং অন্যান্য অবিখ্যাত লেখকদের গোয়েন্দাকাহিনি তারা গোগ্রাসে পড়ত। আর শার্লক হোমস ছিল তাদের কাছে 'উপাস্য দেবতার মতন।'[১৩২] বিদেশী শিক্ষা বয়কটে সামিল জয়ন্ত-মানিকরা কলেজ ছেড়ে দিলেও, বিদেশী গোয়েন্দাদের কাহিনি অবলম্বনেই শিখেছে অপরাধ বিজ্ঞান। সেই দৃষ্টিকোণ অনুসারেই তাদের দেখার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। উপনিবেশের শিক্ষা কায়েম থেকেছে চৈতন্যে।

তৃতীয়ত, দুঁদে গোয়েন্দা হওয়া সত্ত্বেও কায়-মন-বাক্যে জয়ন্ত যে বাঙালিই, অপরাধ-অপরাধী নিয়ে চর্চা করতে করতে করতে তার অন্তর্লীন সৌন্দর্যপ্রীতি যে মুছে যায়নি, তা বারবার প্রকাশ করতে ভোলেন না লেখক। ওই সৌন্দর্যপ্রীতি অপরাধ বিজ্ঞানে ও গোয়েন্দাগিরিতে সমকালকে ছাপিয়ে উঁচুতে উঠে যাওয়া গোয়েন্দা-নায়ক জয়ন্তকে সাধারণ বাঙালি পাঠকের ধরাছোঁয়ার

মধ্যে নিয়ে আসে, তার সঙ্গে সেতু নির্মাণের কাজ সহজতর করে। তাই মাঝে মাঝেই জয়ন্তকে কাজের ফাঁকে বাঁশি বাজাতে দেখা যায়। 'অমৃত-দ্বীপ' উপন্যাসে জয়ন্তকে বলতে শোনা যায়, "পৃথিবীকে আমার যখন বড়ো ভালো লাগে তখন আমি চাই বাঁশি বাজাতে!"[১৩৩] পাশাপাশি, বাঁশির বদলে বন্দুক সঙ্গে রাখতে হচ্ছে বলে তার আক্ষেপও শোনা যায়, "বন্দুকের নল থেকে তো গান বেরোয় না, বেরোয় কেবল বিষম ধমক।"[১৩৪]

শখের গোয়েন্দা জয়ন্ত ও তার সহকারী মানিককে উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার রায় সৃষ্টি করেছেন পুলিশ সহযোগী সুন্দরবাবুকে। সুন্দরবাবুকে নিয়ে মানিকের রসিকতা, স্থানে স্থানে ভীত, পরিশ্রমহীন সমাধানে আগ্রহী সুন্দরবাবুর চরিত্রটি অনেকক্ষেত্রেই আমাদের হাস্যস্পদ মনে হতে পারে। মনে হতে পারে গোয়েন্দা কাহিনির রোমহষর্ক উত্তেজনার মধ্যে কিছুটা কৌতুকের আবহ নির্মাণের জন্যই বুঝি চরিত্রটির অবতারণা। কিন্তু খতিয়ে দেখলে সুন্দরবাবুর মাধ্যমে তৎকালীন পুলিশি ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের অনাস্থা ও অনীহার পরিচয়ই ফুটে উঠতে দেখা যাবে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই পুলিশি নির্যাতন ও তার ফল হিসেবে মানুষের পুলিশ সম্পর্কে বিরূপতা বৃদ্ধি পেতে থেকেছিল। কালীচরণ ঘোষ জানাচ্ছেন, বনকাঠিতে 'বন্দেমাতরম্' বলার অপরাধে সাত-আট বছরের কিশোরদেরও পুলিশ টানতে টানতে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিল।[১৩৫] অজস্র উদাহরণ সহযোগে তিনি জানিয়েছেন, "এরকমভাবে কত নিরীহ লোক প্রহৃত হয়েছেন, তার হিসাব কেউ রাখেনি; রাখা সম্ভবও নয়। পুলিশ ও মিলিটারীর হাতে মানুষের দুর্দশা একেবারে চরম পর্যায়ে উঠেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।"[১৩৬] কালীচরণ ঘোষ আরও জানান, পুলিশি অত্যাচার যে মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে এই আশঙ্কায় *London Daily news* লিখেছিল, "To flog young men for political offences, however foolish they have been, is the surest way of

turning the whole educated sentiment of India against us."[১৩৭] শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে পুলিশ সম্পর্কে এই অনীহা তারপরেও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থেকেছিল। সেই অনীহা-বিদ্রূপ-অনাস্থা জয়ন্ত-মানিক সিরিজে ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার। পুলিশের গোটা কর্মকাণ্ডকেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। 'জয়ন্তের কীর্তি' উপন্যাসে মুকুন্দবাবু জয়ন্তের সঙ্গে দেখা করতে এলে স্পষ্টতই জানিয়ে দেন, "পুলিশের চেয়ে আমি আপনাকেই বেশি বিশ্বাস করি। পুলিশ ঘুষ খায়, আপনি খাঁটি লোক।"[১৩৮] আবার 'মানুষ পিশাচ' উপন্যাসে মেয়ে-অপহরণের ঘটনা প্রসঙ্গে মানিক খবর কাগজ থেকে পড়ে শোনায়,

> এখন প্রশ্ন হইতেছে, একালে ইংরেজ রাজত্বের কোনো জায়গায় উপরি-উপরি এমন তিন-তিনটি ঘটনা ঘটা সম্ভব কি না? যদি সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়, তবে অনর্থক এই বিপুল পুলিশ-বাহিনী পুষিয়া লাভ কী?[১৩৯]

খেয়াল রাখা প্রয়োজন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও পুলিশ সম্পর্কে মানুষের অসন্তোষ কমেনি। ব্রিটিশ-কাঠামো অনুসরণ করেই অটুট থাকা পুলিশি ব্যবস্থাকে স্বাধীন দেশের পুলিশি ব্যবস্থা হিসেবে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারা, কিংবা আলাদা করে সম্মান করার মতো অবস্থাও তৈরি হয়নি। রাষ্ট্রযন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখতে দমনমূলক ব্যবস্থাও অব্যাহত থেকেছে পুলিশ-প্রশাসনের। ফলে হেমেন্দ্রকুমারের স্বাধীনতা পরবর্তী উপন্যাসেও পুলিশ সম্পর্কে বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়েছে একইভাবে। 'নৃমুণ্ড-শিকারি' উপন্যাসে সুন্দরবাবুসহ গোটা পুলিশবাহিনীকেই অপরাধীদের হাতে নাকাল ও বিপর্যস্ত হতে হয় এবং বিপদ-কালে তাদের ভীতুর মতো প্রাণবাঁচাতে সরে পড়তে দেখা যায়। এমনকি সুন্দরবাবুও এক জায়গায় বলতে বাধ্য হন, "এতক্ষণ কোন গর্তে ঢুকে হিল্লি-দিল্লি ফতে করছিলে যাদু? গরিব-নিরীহদের গলাধাক্কা দিয়ে

এখন তো বাহাদুরি দেখাচ্ছ।"[১৪০] সুন্দরবাবু ও তার পুলিশবাহিনীর প্রতি এমন অজস্র বিদ্রূপের তালিকা বাড়িয়ে যাওয়া চলে আরো, জনমানসের অসন্তোষ যেখানে মজার ছলে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

Ernst Kaemel তাঁর 'Literature under the Table: The Detective Novel and its Social Mission' প্রবন্ধে গোয়েন্দা কাহিনিকে বলেছেন পুঁজিবাদের সন্তান।[১৪১] গোয়েন্দাকাহিনি ব্যক্তিমালিকানা তথা পুঁজিবাদের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যেকার শোষণের ছবিকেও প্রত্যক্ষগোচর করে তোলে। অনেকক্ষেত্রেই সেই শোষণের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সামাজিক সম্পর্কগুলির ওপরেও অপরাধী আঘাত এনে ফেলে। অধিকাংশক্ষেত্রেই অপরাধী বা খুনির অপরাধের মূল কারণ হয়ে থাকে অর্থনৈতিক। এভাবে তা পুঁজিবাদী সভ্যতার মূল চাবি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিয়ে বসে। তখন না পুঁজিবাদী সমাজ, না তার নির্মিত পুলিশি ব্যবস্থার মতো প্রতিষ্ঠান, কেউই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এখানেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ বা স্বনির্ভর ও শখের গোয়েন্দার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যে একাই পুঁজিবাদী নৈতিক কাঠামোকে অটুট রাখতে সক্ষম, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ ব্যক্তি একাই যে সমাজের দুর্বলতাগুলোকে শুধরে দিতে পারে, এই ধারণাও গোয়েন্দা-নায়ক বহন করে আনে। এই একক ক্ষমতাবান হিসেবে ব্যক্তি-গোয়েন্দাকে গড়ে তুলতে গিয়ে সাহিত্যে তাকে করে তোলা হয় প্রায় অলৌকিক পর্যায়ের মেধা ও মানসিক শক্তির মালিক। যার শক্তিময়তায় মুগ্ধ পাঠক খেয়ালই রাখতে পারে না, কীভাবে সামাজিক খুঁতগুলোর ওপর পলেস্তারা ফেলে সমাজ-কাঠামো অটুট রাখতে ব্যবহৃত হচ্ছে গোয়েন্দার মেধা ও শ্রম। জয়ন্ত-মানিক সিরিজে যেমন খেয়াল রাখা যায় না কীভাবে সুন্দরবাবুকে হাস্যস্পদ করে পুলিশি ব্যবস্থার সমালোচনা করলেও, সেই পুলিশি ব্যবস্থার ত্রুটিকে আড়াল করে দেয় জয়ন্তের

সাফল্য, পুলিশি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভকে হাল্কা স্রোতে বাহিত করে দিয়ে সমাজ-কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অ্যাডভেঞ্চার-নায়ক বিমলের সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দা-নায়ক জয়ন্তের কাহিনি লিখতে শুরু করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। বিমল-কুমার সিরিজের মতো জয়ন্ত-মানিক সিরিজেও ঘুরে ফিরে এসেছে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গ। তবে সিরিজ এগোতে এগোতে বিমল-জয়ন্তদের অ্যাডভেঞ্চারের পরিবেশে ঘনিয়ে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা। প্রথম মহাযুদ্ধ বাঙালির মধ্যে জারিত করেছিল নতুন ধারণা, নতুন উদ্দীপনা, সেকথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু বাঙালিকে দেখিয়েছিল মহাযুদ্ধের সর্বগ্রাসী বিপন্নতার রূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসেবে অংশগ্রহণ করতে কার্যত বাধ্য হয়েছিল ভারত। ফলে অক্ষশক্তির, বিশেষত জাপানের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুও হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষ। চীন ও ভারতবর্ষ অধিকার করার মাধ্যমে জাপান বিশ্বের সামনে নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। রেহাই পায়নি কলকাতাও। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪ সাল অবধি মাঝে মাঝেই কলকাতায় চলেছে জাপানি বোমাবর্ষণ। মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। বোমাবর্ষণ থেকে বাঁচতে, মাঝে মাঝেই কলকাতাকে ডুব দিতে হয়েছে ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, ব্ল্যাক আউট, বোমাবর্ষণ আর তীব্র অর্থনৈতিক মন্দার পরিস্থিতে ভালো-না-থাকা বাঙালির বিপন্নতা ছাপ ফেলেছে শিশু কিশোর সাহিত্যেও। ভারতবর্ষ একদিকে যেমন ছিল ইংল্যান্ডকে কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্র, অন্যদিকে সুয়েজ খাল দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে ভারত মহাসাগর দিয়ে সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ইংল্যান্ডের যোগাযোগের মাঝে অবস্থান করছিল ভারতীয় উপমহাদেশ। ভূমধ্যসাগরের আশেপাশের দেশগুলোতে লড়াইয়ের জন্য সেনা পাঠানো ছাড়াও, যুদ্ধেক্ষেত্রে খাদ্য সরবরাহের জন্য ভারতের

শস্য-সম্পদকে ধার্য করা হয়। ১৯৪২ এর মে মাস থেকে প্রতিমাসে চল্লিশ হাজার টন খাদ্যশস্য জাহাজে করে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। উপনিবেশের সমস্তরকম বাণিজ্যিক উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশই ব্যবহৃত হতে থেকেছিল যুদ্ধে। বড়োলাট লিনলিথগো (১৮৮৭-১৯৫২) এই সময় জানিয়েছিলেন, ভারতীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতার কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি অক্ষম এবং খাদ্য, জ্বালানি থেকে ওষুধপত্র কিংবা জামাকাপড় সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে।[১৪২] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভয়ানক কালোবাজারি ও খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখা। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল ভারতবর্ষে। বাংলায় গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ খাবারের আশায় এসে পৌঁছেছিল শহরে। পথে বিপথে অনাহারে মৃত্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সাধারণ ছবি। একদিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রবল দাপটে, যুদ্ধের বীভৎসতায় ক্ষতবিক্ষত হতে থেকেছে পৃথিবী, আরেকদিকে অনাহারক্লিষ্ট খাবারের আশায় উন্মুখ মানুষের ক্রমাগত মরতে থাকা— ব্যথাতুর সেই সময়ের ছাপ সাহিত্যিকরা লুকোতে চাননি তাদের শিশু সাহিত্যে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অভিযান কাহিনিতেও উল্লিখিত হয়েছে নিষ্ঠুর সেই সময়ের চিহ্ন। অভিযানের হিংস্রতার বিপরীতে সেখানে ফুটে উঠতে থেকেছে মানবিক আবেদন ও সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের সমালোচনা।

'নৃমুণ্ড-শিকারি' উপন্যাসে দুনিয়া জোড়া অশুভ ঘটনার তালিকা দিতে থাকেন লেখক— জাপান কর্তৃক চীনকে টুকরো করার চেষ্টা, ইতালির হাতে আবিসিনিয়ার বিপর্যয় ও ফ্রান্সের বিপন্নতা, গোটা ইউরোপ জুড়ে জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী হানা, ইংল্যান্ডে বোমাবর্ষণ। এসবের উল্লেখ করতে করতে লেখক বলেন, "অথচ ভেবে দ্যাখো। যেসব দেশে ওই সব অশুভ হানাহানি চলছে সেখানকার উপাস্য হচ্ছেন শান্তি ও প্রেমের ঠাকুর খ্রিস্ট ও বুদ্ধদেব।"[১৪৩] 'নৃমুণ্ড-শিকারি'তে যেমন, তেমনি 'সুলু সাগরের ভূতুড়ে দেশ' উপন্যাসেও এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস বলতে বলতে কুমার জানিয়েছে কিভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফিলিপাইন জাপানিদের করতলগত হয়ে থেকেছে। মনোহরবাবুর সিঙ্গাপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসার পিছনেও কার্যকর থেকেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকা, বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জয়ন্ত-মানিক সিরিজ নিছক গোয়েন্দাকাহিনি হয়ে না থেকে, অ্যাডভেঞ্চার তথা অভিযান কাহিনি ও গোয়েন্দাকাহিনির মেলবন্ধন ঘটিয়েছে একদিকে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অংশ পুলিশ-প্রশাসনের প্রতি মজার ছলে সমালোচনা করেও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গড়ে তুলেছে নায়ক চরিত্র। ইউরোপীয় গোয়েন্দা কাহিনির ভক্ত জয়ন্তের দৃষ্টিভঙ্গিতে থেকেছে ঔপনিবেশিক চশমা, আবার উদীয়মান জাতীয়তাবোধ, যা অনেকটা হিন্দু-ধর্মকেন্দ্রিক ছিল, প্রভাবিত করেছে সিরিজটিকে।

অন্যান্য উপন্যাস:

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'আলেয়া সিরিজ' প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই। 'মায়ামৃগের মৃগয়া', 'বজ্র আর ভূমিকম্প', 'নীলপত্রের রক্তলেখা', 'ব্যাধের ফাঁদ', 'সূর্যকরের দ্বীপ' ইত্যাদি উপন্যাস এই সিরিজের অন্তর্গত। উপন্যাসগুলির সব কয়টিকে যথার্থ অভিযান কাহিনি বলা চলে না। স্থানিক সরণের মাধ্যমে অজানা পটভূমিতে প্রাণ বিপন্ন করে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করার যে ধরনটি অ্যাডভেঞ্চার তথা অভিযান কাহিনিতে নির্দিষ্ট কাঠামো দান করে ও উপাদান হিসেবে কাজ করে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিকে বিশিষ্টতা দেয়, তা এই উপন্যাসগুলিতে দেখতে পাওয়া যায় না। বরং কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জানাচেনা গণ্ডির মধ্যেই রোমাঞ্চের সম্ভাবনা সাজিয়ে তুলেছে উপন্যাসগুলি। কেবল 'সূর্যকরের দ্বীপ' উপন্যাসে বোর্নিওর জঙ্গলের পটভূমিতে অরণ্যসঙ্কুল বিপদঘন যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা অভিযান কাহিনিরই

সমতুল্য। নায়ক বরুণ ওরফে 'দস্যু দীনবন্ধু' পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অসৎ ধনীদের সম্পত্তি লুঠ করে তা গরীব-সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এই রবিনহুডি ক্রিয়াকলাপের রোমাঞ্চই এখানে মূল বিষয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালের কলকাতার বর্ণনা, জাপানি বোমার ভয়ে ব্ল্যাকআউট হওয়া ঘোর অন্ধকার রাতের শহর— এসবই ধরা পড়েছে উপন্যাসগুলিতে। 'সূর্য করের দ্বীপ' উপন্যাসে তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিদের হাত থেকে বাঁচতেই বোর্নিওর জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে প্রশান্ত চৌধুরী, উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। বোর্নিওর ভৌগোলিক পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার ছবিও ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক—

> বোর্নিয়োর নগরের পর নগরের উপর একসঙ্গে বর্ষিত হচ্ছে বিমান ও জাহাজ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা, কামানের গোলা ও বন্দুকের গুলি। বোর্নিওর চতুর্দিক হয়ে উঠেছে শব্দময়, ধূম্রময় ও অগ্নিময়। শহরে শহরে মৃত্যুর তাণ্ডবনৃত্য, যেদিকে তাকানো যায় দেখা যায় রক্তের নদী এবং শোনা যায় ভীত ও আহতদের নিদারুণ ক্রন্দনধ্বনি![১৪৫]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতার পাশাপাশি ধনী দরিদ্রের বৈষম্য ও সেই বৈষম্য-বিরোধী কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেছে ক্ষেত্র বিশেষে। আবার পুলিশ অফিসার প্রশান্ত চৌধুরিকে ভ্রান্তির জালে জড়িয়ে নাস্তানাবুদ করার মাধ্যমে একদিকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত পুলিশ সম্পর্কিত ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও প্রতিশোধস্পৃহার এক ইচ্ছাপূরণের গল্প নির্মাণ করেছেন লেখক। আবার বহু জায়গায় পুলিশ অফিসার প্রশান্ত চৌধুরীর প্রাণরক্ষাও করেছে বরুণ। দস্যু দীনবন্ধুর মানবদরদি অবস্থান ও নানা ছদ্মবেশে নিখুঁত অভিনয় করে পুলিশকে বোকা বানানো আমাদের ক্ষেত্র বিশেষে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবি' (১৯২৬) উপন্যাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। যদিও 'পথের দাবি'-এর রাজনৈতিক জটিলতা এখানে অনুপস্থিত।

কেবলমাত্র দূর দেশের অজানা পটভূমিই যে অ্যাডভেঞ্চারের একমাত্র আধার হতে পারে, এই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। নিজের দেশের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের উপযোগী স্থান খুঁজতে তিনি যেমন বেছে নিয়েছিলেন আসামের জঙ্গল কিংবা চট্টগ্রামের পাহাড়, তেমনই পুঁজির কেন্দ্র হিসেবে ক্রমশ জনবহুল ও আধুনিক হয়ে উঠতে থাকা কলকাতাকেও তিনি বেছে নিয়েছিলেন অভিযান কাহিনির পটভূমি হিসেবে। বাংলা অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, আর কেন তা বিদেশী অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের থেকে আলাদা, সেই সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার ধীরেন্দ্রলাল ধরকে (১৯১৩-১৯৯১) বলেছিলেন,

> তোমার প্রথম বইটা তুমি আফ্রিকার জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছ, ওটা সাহেবদের পক্ষে চলতে পারে। তারা সারা পৃথিবী জুড়ে রাজ্য করছে, আমাদের তো সে সুযোগ নেই। আমাদের দেশের মধ্যেই তোমাকে অ্যাডভেঞ্চার খুঁজে নিতে হবে, তাতে সারা দেশের সঙ্গে ছোটরা পরিচিত হবে, দেশের কথাও জানবে। আর তার সঙ্গেই দেবে দেশপ্রেম, ছোটরা যেন এই দেশের মানুষ বলে গর্ব করতে পারে। তাতে তোমার লেখা ভালো হোক আর না-হোক, যারা পড়বে তাদের চরিত্র ও আদর্শ তৈরি হবে। অ্যাডভেঞ্চার গল্পের উদ্দেশ্যই হল, দুঃসাহসী দৃঢ় চরিত্রের ছেলেমেয়ে গড়ে তোলা।[১৪৫]

যদিও হেমেন্দ্রকুমারের অভিযান নায়করা আফ্রিকা তো বটেই, পৃথিবীর নানা দেশে, এমনকি গ্রহান্তরেও অভিযানে গিয়েছে, তবু ব্রিটিশ-শাসিত, পরাধীন দেশের অভিযানের ভাষ্য যে ইউরোপীয় মডেলের থেকে আলাদা হওয়া প্রয়োজন এ ধারণা পোষণ করেছিলেন তিনি। ইউরোপীয় মডেল থেকে তার অভিযান কাহিনিকে সর্বদা স্বতন্ত্র না রাখতে পারলেও, এই স্বাতন্ত্র্য যে প্রয়োজন, সে সম্পর্কে তাঁর দ্বিমত ছিল না। এই স্বাতন্ত্র্যের সন্ধানে তিনি দেশের

বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে তার অভিযান নায়কদের পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে, এমন এক পটভূমিকে বেছে নিয়েছেন অ্যাডভেঞ্চারের সেটিং হিসেবে, যা ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে বিরল। সেই পটভূমি হল শহুরে সভ্যতা। ভারতবর্ষ তথা বাংলার নিরিখে সেই সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে কলকাতা। গ্রাম থেকে শহরের অভিমুখে যে মানুষ আসতে থেকেছে সামন্তবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ জোরালো নাড়া দেওয়ার পর থেকে, সেইসব মানুষের চোখে কলকাতার চালচলন, প্রযুক্তি, জটিলতা, ভিড় সমস্তটাই তৈরি করে এক অজানা পট। দুর্গম অঞ্চলে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অজানাকে জানাও যেমন, শহুরে সভ্যতার মধ্যে এসে অনভ্যস্ত গ্রামীণ মানুষের প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝতে যুঝতে নতুন পরিবেশকে জানা বোঝাও তার চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়। 'দেড়'শ খোকার কাণ্ড' (১৯৪৭) কিংবা 'বিমানের নতুন দাদা' উপন্যাসের কিশোর নায়করা কলকাতা শহরে বেড়াতে এসে নিজেদের আবিষ্কার করেছে রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির মধ্যে। কলকাতা আসার আগে কলকাতা সম্পর্কে তাদের যেটুকু জানাবোঝা তা কলকাতা-যাত্রাকে তাদের সামনে অভিযানে যাওয়ার সমতুল্য রূপেই হাজির করেছে। 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' উপন্যাসে গোবিন্দর কলকাতা যাত্রার আগে গোবিন্দর মা তাকে বলেছে, "কলকাতা হচ্ছে ছেলে-মেয়েদেরই দেখবার শহর! রাত হলেও সেখানে অন্ধকার হয় না! আর মোটর গাড়িগুলো দিন-রাত কী চ্যাঁচায়— মা, মা, মা! কান বলে কালা হয়ে যাই!"[১৪৬] কলকাতা এক গন্তব্য-শহরের পরিবর্তে গোবিন্দর কাছে প্রতিভাত হয়েছে বিস্ময়-নগরী রূপে। 'বিমানের নতুন দাদা' উপন্যাসে হারাধনকে তো তার বাবা ছিদাম কলকাতার যে বর্ণনা দেয়, তাতে বিপদশঙ্কুল এক জনপদের ধারণাই ফুটে ওঠে— "যতবারই গিয়েছি, ততবারই দেখেছি, ওই রাক্ষুসে শহরটা দিনে দিনে যেন আরও ডাগর হয়ে উঠছে। সেখানে বাইরে বেরুলে লাখো লাখো মানুষের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়, সেখানে পথে পা বাড়ালেই মস্ত মস্ত হাওয়া-গাড়িরা বাঘ-ভাল্লুকের

মতো মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে, সেখানে হাওয়া গাড়িদের ফাঁকি দিলেও চোর-জোচ্চোর-গুন্ডাদের ফাঁকি দেবার জো নেই, সেখানে লাল-পাগড়ি-পরা চৌকিদাররা চোরদের কিছু বলে না, কিন্তু সাধুদের ধরে নিয়ে যায় হাতে দড়ির বাঁধন দিয়ে!"[১৪৭] খেয়াল করা প্রয়োজন কলকাতার ভিড়, গাড়ি-ঘোরার দৌরাত্ম্য, গুন্ডা-অপরাধীদের বিপদের পাশাপাশি হারাধনের বাবা হারাধনকে সাবধান করে দেবে পুলিশ তথা প্রশাসনের পক্ষপাত, দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা সম্পর্কেও। চাষীর ছেলে বলে অসম্মান পেয়ে পেয়ে অধৈর্য হয়ে কলকাতায় যেতে চায় হারাধন; কিন্তু কলকাতাও যে এই বৈষম্যমূলক আচরণের ঊর্ধ্বে নয়, তা যেন আগাম সতর্ক করে দিতে চায় ছিদাম। তবু নিজের বৃত্তের বাইরের পৃথিবীকে দেখবার টান হারাধনকে কলকাতা নিয়ে যায়। কলকাতায় ব্যারিস্টার মিস্টার রায়ের মাধ্যমে লেখক এই চেনা বৃত্তের বাইরে পা রাখাকেই উৎসাহিত করেন, উৎসাহ ছড়িয়ে দিতে চান কিশোর পাঠকদের মধ্যে। মিস্টার রায় বলেন, "আমি ইউরোপে গিয়ে দেখেছি, সেখানকার মানুষেরা শিশু বয়স থেকে স্বাবলম্বন-মন্ত্রের সাধনা করে; সেই জন্যে যে-বয়সে বাঙালির ছেলেরা পৃথিবীর কিছুই বোঝে না, ইউরোপের প্রায়-বালকরাও সেই বয়সেই অনায়াসেই নিজের পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।"[১৪৮]

ইউরোপের তুলনায় বাঙালি শিশু-কিশোরদের অবস্থানকে জরিপ করতে চেয়েছেন লেখক বারবার। সাহস ও স্বাবলম্বনে যাতে তারা পিছিয়ে না থাকে আর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধজাত এই আকাঙ্ক্ষাই তো বাংলা অ্যাডভেঞ্চার গল্প লেখায় লেখকের প্রণোদনা। অ্যাডভেঞ্চারের কেন্দ্র হিসেবে কলকাতাকে বেছে নেওয়ার মধ্যে ইউরোপীয় অভিযান কাহিনির থেকে স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, তেমনই কলকাতায় আসার পর গোবিন্দ ও দেড়শো খোকারা মিলে চোর জটাধরকে যেভাবে নাকাল করে, কিংবা হারাধন যেভাবে অপহরণকারীদের দল থেকে ছোট্ট বিমানকে বাঁচিয়ে আনে তা অ্যাডভেঞ্চারের ঝুঁকিপূর্ণ রোমাঞ্চের আদলটিও বজায় রাখে। খেয়াল রাখা

প্রয়োজন ‘বিমানের নতুন দাদা’ কিংবা ‘দেড়শো খোকার কান্ড’ উপন্যাসে কলকাতার সামাজিক-রাজনৈতিক চালচিত্র সেভাবে ফুটে ওঠেনি, যেমনটা উঠে এসেছে শিবরাম চক্রবর্তীর (১৯০৩-১৯৮০) ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ (১৯৩৭) উপন্যাসে। বাস্তবতার থেকে কিছুটা সরিয়ে রেখে কাল্পনিক কলকাতাতেই হেমেন্দ্রকুমার অভিযানে পাঠান তার কিশোর নায়কদের। খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলবেন,

> হেমেন্দ্রকুমার ছিলেন রক্ষণশীল। তার রচনায় আদর্শ-বিচ্যুতির সামান্য ইঙ্গিতও প্রকাশ পায় না। সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, সংশোধনবাদ বা কোন রকমের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বাদানুবাদ তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে, এমন কিছু তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়নি।[১৪৯]

সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাত, ও মতবাদের স্রোত তার লেখার বিষয়বস্তু, চরিত্রদের মনোভঙ্গির ওপর কার্যকরী যে কতটা ছিল, তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তিনি কেবল সন্তর্পণে প্রকাশ্য দলীয় রাজনৈতিক বক্তব্যকে শিশু সাহিত্যে স্থান দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। তাই অ্যাডভেঞ্চারের কেন্দ্রভূমি হিসেবে কলকাতাকে বেছে নিলেও কলকাতায় চলতে থাকা রাজনৈতিক উদ্দাম আবহাওয়াকে তিনি পরিহার করেছেন। পরিবর্তে কাল্পনিক বিপদ যেমন এনেছেন তেমনই চেষ্টা করেছেন মায়া-জড়ানো পরিবেশ সৃষ্টি করতে। এমনকি 'দেড়’শ খোকার কাণ্ড'-এ লেখক নিজেই চরিত্র হিসেবে হাজির হয়ে গোবিন্দর সাথে গল্প করেছে, তাকে সাহায্যও করেছে। কলকাতায় বিপদের মুখোমুখি হয়েছে বটে তার কিশোর নায়করা, কর্কশতা বা বীভৎসতার মুখোমুখি হয়নি কখনোই।

হেমেন্দ্রকুমার অভিযান কাহিনি যেমন শুরু করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে, তেমনই বহুমুখী পথে তাতে প্রসারিত করারও চেষ্টা করেছেন। বিমল-কুমার কিংবা জয়ন্ত-মানিক সিরিজের মতো

জনপ্রিয়তা না পেলেও সেগুলি বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিকে বিচিত্র রাস্তায় নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ‘রুনু টুনুর অ্যাডভেঞ্চার’ (১৯৬০) উপন্যাসে মানবকন্যা টুনুর সঙ্গে রুনু নামে হাতির বন্ধুত্ব, অরণ্যের মধ্যে তাদের জীবন যাপন অভিযানের পটভূমি নির্মাণ করেও মানবিক আবেদনের কাহিনিই উপস্থাপন করেছে শেষ পর্যন্ত। ‘হন্তারক নরদানব’ আঠারো শতকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করায়, সেখানের জলদস্যুদের বিপজ্জনক জীবনের কাহিনি বলতে বলতে সেই সময়ের ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকার সমাজ জীবনের নানা ছোট ছোট ছবি তুলে ধরে। চেনা বৃত্ত ছাড়িয়ে বাঙালি কিশোর যাতে পৃথিবীকে দেখতে শেখে সেই অভিপ্রায়ে, সমসময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক চলনকে সঙ্গে নিয়েই অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি লিখতে শুরু করেছেন হেমেন্দ্রকুমার, যা জারিত হয়েছে পরবর্তী সাহিত্যিকদের মধ্যেও।

নির্দেশিকা ও টীকা

১. Las, J., *The Hero: Manhood and Power*, Thames and Hudson, London, 1995, page no. 5

২. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *ছোটদের অমনিবাস*, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১২

৩. ঐ, পৃ-২৬

৪. ঐ, পৃ-৪৩

৫. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন', *আবার যখের ধন,* দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ-১৫৯

৬. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *ছোটদের অমনিবাস*, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১১, পৃ-৪৩

৭. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র* ১, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-৩৫৪

৮. ঐ, পৃ-৪৩২

৯. ঐ, পৃ-৪১৫

১০. ঐ, পৃ-৪১৪

১১. ঐ, পৃ-৪১৫

১২. ঐ, পৃ-৪২৮

১৩. ঐ, পৃ-৪৪৭

১৪. ঐ, পৃ-৪৪৭

১৫. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ', *জয়ন্তের কীর্তি,* দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-১১৫

১৬. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০২১, পৃ-৩৫৫

১৭. Las, J., *The Hero: Manhood and Power*, Thames and Hudson, London, 1995, page no. 5

১৮. Hourihan, Margery, *Deconstructing the Hero,* Routledge, London and New York, 1997, page no. 39

১৯. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'আবার যখের ধন', *আবার যখের ধন*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ-৭

২০. সেন, অশোক (সম্পা.), 'সংকলন প্রসঙ্গে', *অ্যাডভেঞ্চারের গল্প*, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ-৭

২১. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'আবার যখের ধন', *আবার যখের ধন*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ-৭৪

২২. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *ছোটদের অমনিবাস*, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১৫

২৩. ঐ, পৃ-২১

২৪. Stefanson, Dominic, *Man as Hero: Hero as Citizen*, School of History and Politics, The University of Adelaide, 2004, page no. 4

২৫. "The Homeric heroes cannot serve as models for citizenship because they lack self-restraint and subordination to the common interests of the widercommunity that mark a citizen."— Stefanson, Dominic, *Man as Hero: Hero as Citizen*, School of History and Politics, The University of Adelaide, 2004 page no. 4

২৬. Stefanson, Dominic, *Man as Hero: Hero as Citizen*, School of History and Politics, The University of Adelaide, 2004 page no. 5

২৭. ঐ

২৮. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-৩৭৪

২৯. ঐ

৩০. ঐ, পৃ-১৯৩

৩১. ঐ

৩২. ঐ, পৃ-১৯৪

৩৩. Stefanson, Dominic, *Man as Hero: Hero as Citizen*, School of History and Politics, The University of Adelaide, 2004 page no. 8

৩৪. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *আবার যখের ধন*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ-২৮

৩৫. ঐ, পৃ-২৯

৩৬. ঐ, পৃ-২৬

৩৭. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন', *আবার যখের ধন,* দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ-১০৬

৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস,* কারিগর, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-২৯২

৩৯. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-১৯৪

৪০. ঐ

৪১. হালদার, জীবনতারা, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা,* প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ-২৩

৪২. ঐ, পৃ-১৯

৪৩. ঐ, পৃ-২৮

৪৪. ঐ

৪৫. ঐ

৪৬. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-২৬৪

৪৭. ঐ, পৃ-১৪৪

৪৮. ঐ, পৃ-১৪৫

৪৯. ঐ, পৃ-৩৮২

৫০. দত্ত, শ্রীক্ষীরোদকুমার, *ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি,* অনুশীলন সমিতি ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন কমিটি, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ-২৮

৫১. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-৩৭৫

৫২. ঐ, পৃ-৩৭৭

৫৩. ঐ, পৃ-৩৮৯

৫৪. ঐ, পৃ-৪০৩

৫৫. ঐ, পৃ-১৯৩

৫৬. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', *আবার যখের ধন,* দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১ পৃ-১৯৬

৫৭. ঐ

৫৮. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, ‘সূর্যনগরীর গুপ্তধন’, *আবার যখের ধন,* দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১ পৃ-১৪৭

৫৯. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, ‘প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ’, *জয়ন্তের কীর্তি,* দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-১৪৩

৬০. ঐ

৬১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ-৬৩৭

৬২. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, ‘সূর্যনগরীর গুপ্তধন’, *আবার যখের ধন,* দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১ পৃ-১০৭

৬৩. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *ছোটদের অমনিবাস,* এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১৭

৬৪. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১,* দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-২০৯

৬৫. ঐ, পৃ-১৫৭

৬৬. ঐ, পৃ-১৪৫

৬৭. ঐ, পৃ-১৩৮

৬৮. ঐ, পৃ-৩৪৯

৬৯. ঐ, পৃ-৩৭০

৭০. ঐ, পৃ-৪০৮

৭১. ঐ, পৃ-৩৪৮

৭২. বাল গঙ্গাধর তিলকের বক্তব্য ছিল, “যুদ্ধের ঋণপত্র কেনো, কিন্তু সেগুলোকে দেখো স্ব-রাজের স্বত্বের দলিল হিসেবে।”— সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-১৫০

৭৩. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-১৪৮

৭৪. ঐ, পৃ-১৪৬

৭৫. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *ছোটদের অমনিবাস,* এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১২

৭৬. ঐ

৭৭. "সবচেয়ে বড় বন্ধন হল স্নেহের। আর স্নেহের সঙ্গে যদি নিরীহতা জড়িয়ে থাকে তাহলে সেটা হয়ে পড়ে আরো মজবুত। ভবঘুরেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাঁরা যদি তাঁদের মায়েদের স্নেহ আর চোখের জলের কথা ভাবতেন তাহলে তাঁদের মধ্যে একজনও ঘর ছেড়ে বেরুতে পারতেন না।"— সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, *ভবঘুরে শাস্ত্র*, সিংহ, রণজিৎ (অনু.), চিরায়ত, কলকাতা, ২০০৯, পৃ-১৮

৭৮. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *ছোটদের অমনিবাস*, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১১, পৃ-১৯

৭৯. ঐ, পৃ-২১

৮০. ঐ, পৃ-২২

৮১. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-২০৯

৮২. ঐ

৮৩. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', *আবার যখের ধন*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ-১৮০

৮৪. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-৪৮২

৮৫. ঐ, পৃ-৪৭৯

৮৬. ঐ, পৃ-৪৮৭

৮৭. ঐ

৮৮. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'সূর্যনগরীর গুপ্তধন', *আবার যখের ধন*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ-১১৫

৮৯. ঐ, পৃ-১০৬

৯০. ঐ, পৃ-১১১

৯১. ঐ, পৃ-১১৪

৯২. ঐ, পৃ-১১৫

৯৩. ঐ, পৃ-১২০

৯৪. ঐ

৯৫. ঐ, পৃ-১১০

৯৬. ঐ, পৃ-১৬৬

৯৭. ঐ, পৃ-১৭০

৯৮. ঐ, পৃ-১১০

৯৯. ঐ, পৃ-১১৩

১০০. ঐ, ১২৮

১০১. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-২৯৬

১০২. ঐ, পৃ-৪৮১

১০৩. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর', *আবার যখের ধন*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ-২১২

১০৪. ঐ, পৃ-১৮৭

১০৫. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-৩৮৪

১০৬. ঐ, পৃ-৩৫৫

১০৭. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'আবার যখের ধন', *আবার যখের ধন*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃ-৭

১০৮. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-৮৮

১০৯. ঐ, পৃ-৩৮৪

১১০. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ', *জয়ন্তের কীর্তি*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-১১৩

১১১. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-২২০

১১২. "Narrative point of view is the most powerful means by which the reader's perceptions and sympathies are manipulated. In first-person narratives the character telling the story filters the events through his or her own consciousness. A first-person narrator may be naive or limited in understanding so that the reader will be sceptical of his or her judgements as, for instance, we are sceptical of the superficial, pedantic Lockwood's judgement of Heathcliff in Wuthering Heights, but even so the narrator's perspective cannot be ignored. More usually,

especially in children's literature, a first-person narrative invites the reader's acceptance of the narrator's values and judgements.

In third-person narratives the point of view is less obvious and consistent. The events may be focalized through the consciousness of one or more of the characters. The reader's opinions about the other characters and events will, therefore, be influenced by the attitudes of the focalizing character. The structuralist critic Gérard Genette (Genette [1972] 1980:161–211) usefully distinguishes between focalization and narrative voice. Narrative voice is the anonymous voice which tells the story. It is not the voice of the author (although it may express some of the author's views) since even an omniscient narrator 'assumes' that the events are true, whereas the author knows that he or she is imagining them. The narrative voice influences the responses of the reader in various ways—for example, by the selection and ordering of information, and by the use of language. Most obviously an anonymous narrator may intrude comments to guide the reader's responses. This was common in nineteenth- and early twentieth-century children's books." — Hourihan, Margery, *Deconstructing the Hero,* Routledge, London and New York, 1997, page no. 38

১১৩. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২১, পৃ-১২৬

১১৪. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'জয়ন্তের কীর্তি', *জয়ন্তের কীর্তি,* দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-৬১

১১৫. সেন, সুকুমার, *ক্রাইম কাহিনির কালক্রান্তি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-১৯০

বিঃ দ্রঃ উদ্ধৃতির মধ্যে বন্ধনীতে আবদ্ধ শব্দগুলি গবেষক কর্তৃক লিখিত হয়েছে।

১১৬. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *জয়ন্ত-মানিক সমগ্র-১*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০২১, পৃ-৭৩

১১৭. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার-জয়ন্ত-মানিক অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র,* এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৯, পৃ-২

১১৮. ঐ, পৃ-৪৩

১১৯. ঐ, পৃ-১৯

১২০. ঐ, পৃ-২৯

১২১. ঐ, পৃ-৩৫

১২২. ঐ, পৃ-৪৭

১২৩. ঐ, পৃ-২৭১

১২৪. ঐ, পৃ-৩৬

১২৫. ঐ, পৃ-৩৭

১২৬. ঐ, পৃ-১৬

১২৭. ঘোষ, কালীচরন, *জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৭৫৭-১০৯৭),* প্রথম খণ্ড, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ-১৯৩

১২৮. ঐ, পৃ-১৯৭

১২৯. ঐ, পৃ-১৯৯

১৩০. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'জয়ন্তের কীর্তি', *জয়ন্তের কীর্তি,* দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-৯

১৩১. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-২০৮

১৩২. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'জয়ন্তের কীর্তি', *জয়ন্তের কীর্তি,* দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-৯

১৩৩. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার-জয়ন্ত-মানিক অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র,* এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৯, পৃ-৫১

১৩৪. ঐ

১৩৫. ঘোষ, কালীচরন, *জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৭৫৭-১০৯৭) প্রথম খণ্ড,* র‍্যাডিকাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ-১৩১

১৩৬. ঐ, পৃ-১৩২

১৩৭. ঐ, পৃ-১৯১

১৩৮. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, 'জয়ন্তের কীর্তি', *জয়ন্তের কীর্তি,* দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-১০

১৩৯. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *জয়ন্ত-মানিক সমগ্র-১,* দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০২১, পৃ-১১১

১৪০. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার-জয়ন্ত-মানিক অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র,* এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৯, পৃ-২৪২

১৪১. “The Detective novel is a child of Capitalism”—Kaemel, Ernst, ‘Literature under the Table: The Detective Novel and its Social Mission’, *The Poetics Of Murder*, Most, Glenn W. and Stowe, William W. (editors), Harcourt Brace Jovanovich Publishers, Sandiego, Newyork, London, 1946, page no. 57

১৪২. মুখোপাধ্যায়, মধুশ্রী, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র*, সুর, নিখিল এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ (অনু.), সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ-১৫৩

১৪৩. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার-জয়ন্ত-মানিক অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র*, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৯, পৃ-২৩৪

১৪৪. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *রহস্যের আলোছায়ায়*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ-২৬৬

১৪৫. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ-৫

১৪৬. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *দেড়'শ খোকার কাণ্ড*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-৭

১৪৭. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *রহস্যের আলোছায়ায়*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ-৩৩১

১৪৮. ঐ, পৃ-৩৪২

১৪৯. রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ-৮

চতুর্থ অধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: ঔপনিবেশিক বোধের বৈচিত্র্য

বিশ শতকের তিনের দশক থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার পূর্ণতা পেতে আরম্ভ করে। বিভূতিভূষণের প্রসাদগুণ তার স্বল্প সংখ্যক অভিযান কাহিনিগুলিকে কালজয়ী করে রেখেছে। পাশাপাশি অভিযান কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির অবয়বে ধরে রেখেছে সময়ের চিহ্ন। মূলত তিনটি উপন্যাস— 'চাঁদের পাহাড়', 'হীরামানিক জ্বলে' এবং 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসই বিভূতিভূষণের অ্যাডভেঞ্চার তথা অভিযানমূলক উপন্যাস। 'মিসমিদের কবচ' উপন্যাসটি উপরের তিনটি উপন্যাসের সঙ্গে একই পংক্তিতে উচ্চারিত হয় যদিও, আসলে উপন্যাসটি গোয়েন্দাকাহিনি। তবু কিছু ক্ষেত্রে উপন্যাসটিতে অ্যাডভেঞ্চারেরে স্পর্শ লেগেছে। এছাড়া 'সুন্দরবনে সাত বৎসর' উপন্যাসটিতেও বিভূতিভূষণের কলমের ছোঁয়া থাকলেও শেষ কয়েকটি অধ্যায় ব্যতীত বাকি উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের রচিত নয়। ফলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযান সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ পরিচয় সেখানে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা উপন্যাসটিকে আলোচনার পরিধির বাইরে রাখব। বিভূতিভূষণের অভিযান কাহিনি আমাদের যেমন পরিচিত চৌহদ্দির বাইরে অজানা বিপদসঙ্কুল ভূমিতে নিয়ে যায়, তেমনি একটু খুঁজে দেখলে সেইসময়ের বাঙালির চিন্তা ও মননের দ্বিধাদীর্ণ অবস্থান, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও নৈতিক টানাপোড়েনের চালচিত্রও নজর করতে পারা যায় অনায়াসেই। উপন্যাসগুলিকে খতিয়ে দেখব আমরা।

চাঁদের পাহাড়:

বিভূতিভূষণের প্রথম অভিযান উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়'। *মৌচাক* পত্রিকায় ১৯৩৫-৩৬ সালে (আষাঢ় ১৩৪২ থেকে চৈত্র ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) ধারাবাহিকভাবে 'চাঁদের পাহাড়' প্রকাশিত হতে থাকে। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি। প্রকাশক এম-সি-

সরকার অ্যান্ড সন্স। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে উপন্যাসটি রচনা হলেও, উপন্যাসের সময়কাল প্রথম মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী। উপন্যাসের শুরুতেই শঙ্করের পারিবারিক অনটনের ছবি ও সংসারের দায় শঙ্করের কাঁধে এসে পড়ার সম্ভাবনার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেই সূত্রেই বাবার উদ্যোগে পাটকলের চাকরিতে শঙ্করের নিযুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গ আসে। এখানেই লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কেন তিনি কাহিনির রচনাকাল প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী হলেও কথনকালকে প্রথম মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে টেনে নিয়ে গিয়েছেন– "আমরা যে সময়ের কথা বলছি, ইউরোপের মহাযুদ্ধ বাধতে তখনও পাঁচ বছর দেরি। ১৯০৯ সালের কথা। তখন চাকরির বাজার এতটা খারাপ ছিল না।"[১] আর্থিক অনটন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এফ. এ. পাশ করা শঙ্করের চটকলের বাবু হবার অসুবিধা প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ছিল না। রচনাকালের তুলনায় কর্মসংস্থান তথা বেঁচেবর্তে থাকার সুযোগ ছিল বেশি। শঙ্করের অভিযান তাই আর্থিক বাধ্যতা থেকে নয়, অজানাকে জানার টান থেকেই তৈরি। এই অজানাকে জানার জন্য ঝুঁকি নেওয়ার আগ্রহ প্রথম মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী বাঙালির পক্ষে স্বাভাবিক নয়। মহাযুদ্ধ পরবর্তী বাঙালি, যার কাছে বাইরের অজস্র নানামাত্রিক অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের দুয়ার খুলে গিয়েছে, সেই বাঙালির সত্তাকে ধারণ করেই বিভূতিভূষণ শঙ্করের অভিযান কাহিনি বলতে বসেছেন। তাই লেখকের পূর্ববর্তী সময়কালের শঙ্কর হয়ে উঠেছে সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা ব্যক্তিত্ব। এই এগিয়ে রাখার মাধ্যমেই নায়ক নির্মাণের প্রাথমিক কাজটি সারা হয়ে গিয়েছে লেখকের।

অভিযাত্রী হিসেবে শঙ্করকে নির্মাণ করতে গিয়ে বুদ্ধি ও শক্তির কতকগুলি চিহ্ন নির্মাণ করেছেন বিভূতিভূষণ। শঙ্কর যে সাধারণ ধরনের ছেলে নয়, তা স্পষ্টই জানিয়েছেন লেখক। সে খেলাধূলায় প্রথম। সাঁতারে প্রথম। গাছে চড়া, ঘোড়ায় চড়া, বক্সিং এ নিপুণ। ভূগোলের ধারণা তার স্পষ্ট। নক্ষত্র পরিচিতিতে তার তুলনা মেলা ভার। লেখক জানিয়েই দিয়েছেন, "আমাদের

দেশের বেশী ছেলে যে এসব জানে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।”[২] এরপরেও আমরা বারবার দেখতে পাব, শঙ্করের উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে দিতে তাকে লেখক বারবার স্বতন্ত্র প্রমাণ করতে চাইবেন। আফ্রিকার নুডসবার্গের কাছে রেললাইনের কনস্ট্রাকশনে কাজ করার সময়ে একরাতে আচমকা এক সিংহকে তাঁবুর গায়ে গর্ত খুঁড়তে দেখে শঙ্কর যখন নিঃশব্দে পিছু হঠছে, তখন লেখক জানান, “নিজের স্নায়ু মণ্ডলীর ওপর যে তার এত কর্তৃত্ব ছিল, তা এর আগে শঙ্কর জানতো না।”[৩] আবার কিসুমুর কাছে একটা স্টেশনে যখন শঙ্কর স্টেশন মাস্টারি করছে তখন রাতে ঘুম থেকে আচমকা উঠে সে ঘরে ব্ল্যাক মাম্বার মুখোমুখি হয় ও নিজ উপস্থিত বুদ্ধি ও ধৈর্যের বলে রক্ষা পায়। তখনও লেখক জানান, “শঙ্করের একটা গুণ বাল্যকাল থেকেই আছে, বিপদে তার সহজে বুদ্ধিভ্রংশ হয় না—আর তার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর সে ঘোর বিপদেও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে।”[৪] প্রথমবার আলভারেজকে বাঁচানোর প্রসঙ্গে লেখক তার হৃদয়বৃত্তির পরিচয় দিয়ে বলেন “বাল্যকাল থেকেই পরের দুঃখ সহ্য করতে পারে না সে।”[৫] আবার কাবালোতে হিংস্র জুয়াড়ী আলবুকার্ক পোকার খেলার নামে তার সর্বস্ব হরণ করতে চাইলে সে প্রতিবাদ করে। তাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলে মৃত্যু অনিবার্য জেনেও সে মনস্থির করে, “ভীরুর মত সে পাশবিক শক্তির কাছে মাথা নীচু করবে না, হোক্ মৃত্যু।”[৬] এভাবে শঙ্করের মধ্যে নায়কোচিত বীরত্ব, সাহস ও মানবিকতা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন লেখক। যদিও শঙ্করের এই স্বাতন্ত্র্য ও বীরত্বের ছাপ মলিন হয়ে যায় আলভারেজের সঙ্গে জঙ্গলে পৌঁছানোর পর থেকে। এমনকি আলভারেজের মৃত্যুর পর শঙ্করের নিজ ক্ষমতায় বিপদ থেকে মুক্তিলাভও যেন আসলে আলভারেজ দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে। সে কথায় আমরা পরে আসব।

১৯০৯ এ বাঙলার পটভূমি শঙ্করের অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্নপূরণের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। পাটকলের বাবু হওয়াটাই ছিল বরং বাস্তবতা। এই বাস্তবতার সঙ্গে স্বপ্নের দ্বন্দ্বে শঙ্কর আসলে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় কেরানি হওয়ার জন্য শিক্ষিত বাঙালির যৌবনের ভেতরকার অস্বস্তির প্রতিনিধিত্ব করেছে। "নিকেলের বইয়ের আকারের কৌটোতে খাবার কি পান নিয়ে ঝাড়ন পকেটে করে তাকে সকালের ভোঁ বাজতেই ছুটতে হবে কলে— আবার বারোটার সময় এসে দুটো খেয়ে নিয়েই আবার রওনা— ওদিকে সেই ছ'টার ভোঁ বাজলে ছুটি। তার তরুণ তাজা মন এর কথা ভাবতেই পারে না যে! ভাবতে গেলেই তার সারা দেহ-মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—।"[৭] শঙ্করের এই বিদ্রোহে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার পরাধীন উপনিবেশের অবস্থান যেখানে সমাজ ব্যবস্থা তথা শিক্ষা ব্যবস্থা গোটাটাই ঢেলে সাজানো হয়েছে কেরানি কিংবা স্কুলমাস্টার, ডাক্তার কিংবা উকিল তৈরি করার জন্য। তাই "অন্যদেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালীর ছেলের পক্ষে তা ঘটা একরকম অসম্ভব।"[৮] আবার যাদের কথা ভেবে তার মন দুঃসাহসিক কাজের দিকে উড়ে যেতে চায় সেই ডেভিড লিভিং স্টোন(১৮১৩-১৮৭৩), হেনরি মর্টন স্ট্যানলি(১৮৪১-১৯০৪), হ্যারি জনস্টন (১৮৫৮-১৯২৭), মার্কো পোলো (১২৫৪—১৩২৪) কিংবা ড্যানিয়াল ডিফোর সৃষ্ট চরিত্র রবিনসন ক্রুশোদের খোঁজও সে পেয়েছে এই ঔপনিবেশিক শিক্ষার হাত ধরেই। আঁটোসাটো, পরিকল্পিত বন্দোবস্তের ফাঁকফোঁকড়েই ঢুকে পড়েছে, সেই আঁটোসাটো পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

আফ্রিকা যাওয়ার প্রাথমিক ইচ্ছাও শঙ্করের তৈরি হয়েছে ইউরোপীয় লেখকদের লেখাপত্রের মাধ্যমেই। আফ্রিকার 'মাউন্টেন অফ দি মুন' বা চাঁদের পাহাড়ে ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের আরোহণের বিবরণ ভূগোল বইতে পড়ার মাধ্যমেই সে উৎসাহিত হয় আফ্রিকায় যাত্রা করতে। ইউরোপীয়দের কাছে আফ্রিকা ছিল না-ইতিহাস, না-ভূগোলের দেশ। ইউরোপের কাছে

অনাবিষ্কৃত ছিল যে আফ্রিকা, অরণ্যে ঢাকা যে মহাদেশের বিস্তারিত বিবরণ ইউরোপের জানা ছিল না, তা তাদের কাছে না-ভূগোলের দেশ। আর যেহেতু সে দেশের সভ্যতার ধরন মিশ খায় না ইউরোপের সঙ্গে, সভ্যতার ইউরোপধর্মী অগ্রগতি যেহেতু নেই সেখানে তাই ইউরোপের চোখে তারা ইতিহাসহীন। আফ্রিকাকে না-ভূগোল আর না-ইতিহাসের দেশ বলে ভাবার মূল কারণ আসলে ইউরোপীয় যুক্তি-কাঠামোয় আফ্রিকাকে বিশ্লেষণ করতে না পারা। আঠারো শতক থেকে ইউরোপের এই যুক্তি-কাঠামো গড়ে উঠেছিল আইজ্যাক নিউটনের (১৬৪৩—১৭২৩) বলবিদ্যার ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে, যা বুঝিয়েছিল প্রকৃতির নিয়মে কোথাও কোনো ফাঁকি নেই, কোনো ভুলচুক নেই। সামান্যতম ভুলচুকে ধ্বসে পড়বে সমগ্র মহাবিশ্ব। নিয়মের নিগড় যেমন স্বতঃসিদ্ধভাবে বহাল গ্রহ-নক্ষত্রদের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে, তেমনই মানুষের সমাজেও যেন না ঘটে সামান্যতম নিয়মের শৈথিল্য। এই প্রকৃতির-যুক্তির ওপরেই গড়ে উঠেছিল আঠারো-উনিশ শতকের ইউরোপীয় সমাজের নীতি। এই নিয়মের বাঁধনের বিপরীতে আফ্রিকাকে তারা দেখেছিল নৈরাজ্যের দেশ হিসেবে। না-ভূগোল, না-ইতিহাসের দেশ হিসেবে। কীভাবে আফ্রিকা হয়ে থাকে না ভূগোলের দেশ, তার হদিশ আমরা খুঁজে পাব চাঁদের পাহাড়ের মধ্যেও, যখন জঙ্গলের ম্যাপের ওপর বারবার অনাস্থা প্রকাশিত হতে দেখা যাবে আলভারেজের কথায় বার্তায়। জিম কার্টারের সঙ্গে অভিযানের কাহিনি বলতে গিয়ে আলভারেজ শঙ্করকে বলে, “কোনো সভ্য মানুষ সে অঞ্চলে পদার্পণ করে নি— দু-একজন দুর্ধর্ষ দেশ-আবিষ্কারক বা ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া। ঐ বিস্তীর্ণ বনপর্বতের অধিকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ অজানা, তার ম্যাপ নেই, তার কোথায় কি আছে কেউ বলতে পারে না।”[৯] আবার রিখটারসভেল্ডে পৌঁছে যখন শঙ্কর ও আলভারেজ পাহাড়ের মধ্যেকার বিশেষ স্যাডলটি খুঁজে পাচ্ছে না, তখনও শঙ্কর বোঝে আলভারেজ ম্যাপের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। আলভারেজকে সে বলতে শোনে, “এ ম্যাপ অত

খুঁটিনাটি ভাবে তৈরী নয়। এ পর্বতে উঠেছে কে যে ম্যাপ তৈরী হবে?”[১০] আলভারেজ মারা যাওয়ার পর যখন শঙ্কর সলসবেরির উদ্দেশে পা বাড়ায় তখন শঙ্‌কর নিজেও উপলব্ধি করে, ওই অরণ্য পর্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছু উল্লেখ নেই। এই না-ইতিহাস না-ভূগোলের দেশের প্রতি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা ইউরোপীয়দের আকর্ষণ, ইউরোপীয় শিক্ষার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল শিক্ষিত বাঙালির মধ্যেও। বাঙালি অভিযান কাহিনির লেখকরাও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় সার্থকভাবেই দেখিয়েছেন রাইডার হ্যাগার্ডের ‘কিং সলোমন’স মাইন’ (১৮৮৫) ও ‘অ্যালান কোয়াটারমেন’ (১৮৭৭) উপন্যাসের নায়ক কোয়াটারমেনের কাছে আফ্রিকা আদতে ইংল্যান্ডের উলটো আদলে তৈরি এক কল্পলোক, উন্নত ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে খারিজ করতে যা বারবার প্রতীকরূপে এসে দাঁড়ায় এক না-দেশ হিসেবে। যুক্তি-পারম্পর্য-ইতিহাস-উন্নতির শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আধার হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে আফ্রিকা। অথচ দ্বিতীয় উপন্যাসে কোয়াটারমেনের আফ্রিকায় আসার কারণ আফ্রিকার দুর্গমে সাদা মানুষের বসতির সন্ধান। আফ্রিকায় মিস্টার ম্যাকেনজির মিশনের প্রাঙ্গণে ক্ষুদে লণ্ডনের সংস্করণ দেখে চমৎকৃত কোয়াটারমেন। এসব কোয়াটারমেনকে তার ছেড়ে আসতে চাওয়া ইংল্যান্ডের সঙ্গেই সংযুক্ত করে দেয়। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, “কোয়াটারমেনের মনে কি তাহলে তার চেনা আবহের প্রতি পক্ষপাত রয়েই যায়, ইংল্যান্ড থেকে বেরিয়ে আফ্রিকার মধ্যস্থতায় সে কি ইংল্যান্ডেই ফিরতে চায়?”[১১] এই প্রশ্নের নিরিখে আমরা ফিরে দেখতে চাইব শঙ্করকে। খেয়াল রাখতে হবে, কোয়াটারমেন ইংল্যান্ডের সাদা চামড়ার প্রতিনিধি। তার নাকোচ করতে চাওয়া ও গ্রস্ততা উভয়ই ইংল্যান্ডের সাপেক্ষে গড়ে ওঠা। আর শঙ্কর সেই ইংল্যান্ডেরই উপনিবেশ ভারতবর্ষ থেকে এসেছে, পর্তুগীজ জুয়ারী আলবুকার্ক যাকে ‘নিগার’ বলে সম্বোধন করে। তারপরেও দেখা যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠার ঘাটতি না থাকলেও

যেরকম অভাববোধের তাড়না ও অতৃপ্তি থেকে কোয়াটারমেন আফ্রিকামুখী হয়, শঙ্করও তেমনি এক অতৃপ্তি ও অভাববোধ নিয়েই বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে তার আগামী বাধ্যতামূলক কেরানি জীবনের সঙ্গে। উত্তেজনাহীন বঙ্গজীবনের বিপরীতে ঝুঁকিপূর্ণ সুদূরের আহ্বান তাকে অহরহ নাড়া দিতে থাকে। অথচ আফ্রিকার অজানা পরিসরে পৌঁছে নতুন অভিজ্ঞতাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা গ্রামবাংলার পরিবেশ ও যাপনের প্রতি পিছুটান ক্রিয়াশীল থাকে তার মধ্যে।

আফ্রিকায় আসার প্রাথমিক পর্যায়ে শঙ্করের সুদূর পিয়াসী মন আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিল কিছুদিন। আফ্রিকার বিপদ সম্পর্কে সে তখন অসচেতন। যদিও বিপদের মুখোমুখি হবার ইচ্ছাই তার এতদূর আসার প্রণোদনা। রহস্যের দেশ আফ্রিকাকে ঘেঁটে দেখার আগ্রহ তাকে তাড়িত করে। তবু বারবার আফ্রিকার সূত্র ধরে তাকে ফিরতে হয় ভারতবর্ষের কাছেই। নুডসবার্গের কাছে রেল লাইন নির্মাণের কাজ করা কালীন আরেক ভারতীয় তিরুমল আপ্পার সাথে শঙ্করের 'বন্ধুত্ব' হয়। আলভারেজের আগে আর কোনও বিদেশী মানুষের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়নি। আফ্রিকার কোনো মানুষের সঙ্গে তো কখনোই না। ভৌগোলিক দূরত্বকে অতিক্রম করলেও যাপনের দূরত্বকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি শঙ্করের পক্ষে। তিরুমলও শঙ্করের মতোই অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় এসেছে আফ্রিকাতে। তিরুমলের বাবা-মায়ের জন্য স্মৃতিচারণ, ছোট বোনের প্রতি ভালোবাসা, ছুটিতে একবার বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা, স্বাভাবিকভাবেই শঙ্করকে একাত্ম করে দেয় তিরুমলের সঙ্গে। তারপরেও অস্বাভাবিক লাগে, যখন তিরুমলকে সিংহে নিয়ে যাওয়ার পর লেখক শঙ্করের ভাবনা বোঝাতে লেখেন, "আফ্রিকা প্রথম বলি গ্রহণ করেছে– তরুণ হিন্দুযুবক তিরুমলকে। সে বলি চায়।"[১২] আফ্রিকার প্রথম বলি তো নয়ই, এমনকি শঙ্করের অভিজ্ঞতার মধ্যেও প্রথম সিংহের খাদ্যে পরিণত হওয়া ব্যক্তি তিরুমল নয়। তার মাসখানেক আগেই শঙ্করদের ক্যাম্প থেকে আরেকজন কুলির মৃত্যু হয়

সিংহের আঘাতে। শঙ্কর নিজে সেই মৃত কুলির অনুসন্ধান দলে যুক্ত থাকলেও শঙ্কর কর্তৃক আফ্রিকার বলি গণনায় তার কোনো স্থান নেই। ভারতীয়-হিন্দু-কেরানি তিনটি চিহ্নই তিরুমলকে শঙ্করের কাছে গণনযোগ্য করে তোলে, দেশ-ধর্ম-শ্রেণি চিহ্নের পার্থক্যে কুলির মৃত্যু শুধু সেই মুহূর্তে নয়, গোটা উপন্যাস জুড়েই শঙ্করের চেতনার বাইরে থেকে যায়।

শঙ্করের মনে বারবার এসে পড়ে আফ্রিকার প্রকৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা। তিরুমল আপ্পার মৃত্যুর সময়েও তার মনে হয় "দেখতে বাবলা বনে ভর্তি বাংলাদেশের মাঠের মত দেখালে কি হবে, আফ্রিকা অজানা মৃত্যুসঙ্কুল!"[১৩] কিছুদিন পরেই জঙ্গলের মধ্যে শেয়ালের ডাক তাকে বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের স্মৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আমরা জানতে পারি, আফ্রিকার জঙ্গলের শেয়ালের ডাক শুনলেই শঙ্কর নিজের গ্রামকে ভাবার চেষ্টা করে। আলভারেজের সঙ্গে পথচলাকালীন এক ইউরেশীয় শিকারির বাংলোতে তারা যখন আশ্রয় নেয়, তখন সেই শিকারির প্রাথমিক ধারণা হয় 'হিন্দু' শঙ্কর আসলে শ্বেতাঙ্গ আলভারেজের কুলি। পরিবর্তে আলভারেজ শঙ্করকে নিজের ছেলের সম্মান দিয়ে পরিচয় দিলে শ্বেতাঙ্গের চোখে সে ভালো-কৃষ্ণাঙ্গ তথা পরাধীন উপনিবেশের 'ভালো লোক' হয়েই থেকে যায়। ইউরেশীয় শিকারিটি জানায়, ইস্ট ইন্ডিজের হিন্দুরা লোক হিসেবে সাধারণত ভালোই হয়। এই ভালোত্বের পরিমাপ সে করে কীভাবে? করে শ্বেতাঙ্গদের প্রতি এই মানুষদের আচরণের নিরিখে। তারা লোক হিসেবে ভালো, কারণ তারা শ্বেতাঙ্গদের সেবা শুশ্রূষা করে, সুন্দর আতিথেয়তা করে। শঙ্কর এই বক্তব্যের যাবতীয় হীনতাকে প্রশংসা স্বরূপ গ্রহণ করে নেয়।

কাবালো থেকে স্টীমারে কঙ্গো নদীর পথে যাওয়ার সময় লেখক শঙ্করের সৌন্দর্যপ্রীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে তার বাঙালিয়ানাকেই বন্ধনীর মধ্যে বাড়তি জোর দিয়ে লেখেন "হাজার হোক্ সে বাংলার মাটির ছেলে, ডিয়েগো আলভারেজের মত শুধু কঠিন-প্রাণ স্বর্ণান্বেষী

প্রসপেক্টর নয়"।[১৪] সেই বাঙালিয়ানা প্রমাণ করতেই যেন রাতে সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে শঙ্করের নিজের গ্রামের আকাশ মনে পড়ে যায়। পাশাপাশি মনে হয়, "সে সব পরিচিত আকাশ ছেড়ে কতদূর সে এসে পড়েছে, আরও কতদূরে তাকে যেতে হবে, কি এর পরিণতি কে জানে?"[১৫] পিছুটান স্পষ্ট হয়। আবার রিখটারসভেল্ডের কাছাকাছি পৌঁছে দূর থেকে বাওবাব গাছ দেখে তার বট বা অশ্বত্থ গাছের মতো মনে হয়। গ্রামবাংলা তার স্মৃতিতে আনাগোনা করলেও আফ্রিকার ভয়ংকরতা সম্পর্কে সন্দেহহীন শঙ্কর সেই বাওবাব গাছের মধ্যেই খুঁজে পায় আফ্রিকার নিষ্ঠুরতা। ছায়াহীন বিশাল সেই গাছের 'সারা গায়ে যেন বড় বড় আঁচিল কি আব বেরিয়েছে, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা বেঁটে, কুদর্শন, কুব্জ দৈত্য'।[১৬] উপমার প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায় আফ্রিকার সৌন্দর্য নয়, নিষ্ঠুরতা আর রহস্যে ঘেরা আফ্রিকার চেহারাই শঙ্করের মনে দাগ কেটেছে।

বাংলা থেকে অনেকদূরে না-ভূগোলের দেশ আফ্রিকাতে দাঁড়িয়েও শঙ্কর বারবার খুঁজে ফেরে দেশের চিহ্ন আর দেশের স্মৃতি। কখনো ইপোমিয়া লতার ফুল দেখে তার মনে হয় বাংলাদেশের বনকলমী ফুলের মতো, কখনো রাতজুড়ে বন্য প্রাণীদের চিৎকার তাকে মনে করায় স্কুল-বোর্ডিংয়ের পাশে সার্কাসদলের তাঁবু ফেলার ঘটনা। এমনকি এইসব পিছুটান তার অভিযান-ক্লান্ত মনকে বিরূপও করে তোলে কখনো কখনো। তার মনে হয় "হীরার খনিতে তার দরকার নেই। বাংলা দেশের খড়ে ছাওয়া ঘর, ছায়াভরা শান্ত গ্রাম্যপথ, ক্ষুদ্রনদী, পরিচিত পাখীদের কাকলি— সেসব যেন কতদূরের কোন্ অবাস্তব স্বপ্ন-রাজ্যের জিনিস, আফ্রিকার কোনো হীরকখনি তাদের চেয়ে মূল্যবান নয়।"[১৭]

চিরায়ত বাঙালি জীবনকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে বটে শঙ্কর, তবু হিন্দু-বাঙালির সংস্কারকে সে ধারণ করে রাখে গোটা অভিযান জুড়েই। সেই সংস্কার সঙ্গে থাকে বলেই আগ্নেয়গিরির

অগ্নুৎপাতের সাক্ষী হয়ে 'ভারতবর্ষের ছেলে' শঙ্করের হাত কপাল ছুঁয়ে প্রণতি জানায় রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে। সংস্কার ও ঐতিহ্যকে মনে করে রাখতে চায় বলেই আফ্রিকার জঙ্গলে তাঁবুর মধ্যে বসে শঙ্কর 'রাজসিংহ' পড়ে। সংস্কার থাকে বলেই আলভারেজের মৃত্যুর পরেও একা বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে সে নিজেকে সাহস যোগায় এই ভেবে যে তার জন্মকোষ্ঠিতে লেখা আছে সে এখনও অনেকদিন বাঁচবে। বাঙালি কিংবা ভারতীয় চিহ্নগুলির প্রতি টান থেকেই একরকম জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ কাজ করতে দেখা যায় শঙ্করের মধ্যে। রিখটারসভেল্ডে আরোহণের সময় আজন্ম সমতলভূমিতে মানুষ হওয়া শঙ্কর যখন পথক্লান্ত, তখনও আলভারেজকে তার ক্লান্তি ও অসুবিধার কথা বলতে সে নারাজ। 'হয়তো তাতে আলভারেজ্ ভাববে, ঈস্ট ইন্ডিজের মানুষগুলো দেখছি নিতান্ত অপদার্থ। এই মহাদুর্গম পর্বত ও অরণ্যে সে ভারতের প্রতিনিধি— এমন কোনো কাজ সে করতে পারে না যাতে তার মাতৃভূমির মুখ ছোট হয়ে যায়।"[১৮] ব্যক্তি শঙ্করের নিজেকে উপযুক্ত অভিযাত্রী প্রমাণ করার পাশাপাশি ভারতীয় হিসাবেও ইউরোপীয়ের কাছে যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার দায় শঙ্কর নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়।

ভারতীয় বা বাঙালি হিসেবে নিজের চিহ্নের স্বাতন্ত্র্য রাখতে গিয়ে অপর সম্পর্কে শঙ্করের দৃষ্টি বারবার আচ্ছন্ন হয় উপনিবেশ-নির্মিত চেতনার দ্বারা। একদিকে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের প্রতি তার যেমন ফুটে ওঠে সম্ভ্রম, অন্যদিকে আফ্রিকার ভূমিজ মানুষদের প্রতি তার মানসিকতা বরাবরই বিরূপ থেকে যায়। আফ্রিকার পরাধীন কালো মানুষদের প্রতি আরেক পরাধীন দেশ থেকে আগত শঙ্করকে একাত্মতা বোধ করতে দেখা যায় না কখনোই। বরং হাবেভাবে, অবস্থানে সে শ্বেতাঙ্গ আলভারেজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই প্রশ্নহীনভাবে আস্থাশীল। শঙ্করের আফ্রিকায় ছুটে আসার পিছনে প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে যে সব বইপত্র সেসবও তো

লিখিত ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের দ্বারাই। ফলে আফ্রিকা আসার আগেই আফ্রিকা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপীয় আদলে নির্মিত হয়ে গিয়েছিল। বহিরাগত পর্যটকদের পথ চলতে চলতে আচমকা সোনার খনি আবিষ্কারের নানান কাহিনি পড়তে পড়তে তার আফ্রিকা সম্পর্কে আগ্রহ গড়ে উঠেছে। আফ্রিকায় পৌঁছানোর পর শঙ্করের প্রাথমিক অনুভূতি ছিল, "এই সেই আফ্রিকা, সেই রহস্যময় মহাদেশ, সোনার দেশ, হীরের দেশ— কত অজানা জাতি, অজানা দৃশ্যাবলী, অজানা জীবজন্তু এর সীমাহীন ট্রপিক্যাল অরণ্যে আত্মগোপন করে আছে, কে তার হিসেব রেখেছে?"[১৯] রহস্য-সোনা-হীরে-ভূমিরূপ-জীবজন্তু-গাছপালা দিয়ে গড়ে ওঠা শঙ্করের মানস আফ্রিকায় সেখানকার মানুষ বরাবরই ছিল অনুপস্থিত। গোটা উপন্যাস জুড়ে যাদের সঙ্গে তাকে কথায়বার্তায় জড়িত হতে দেখা যায় তারা হয় ইউরোপীয়, নয়তো ভারতীয়— কনস্ট্রাকশন তাঁবুর ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেবে (ইউরোপীয়), তিরুমল আপ্পা (মাদ্রাজী), রেল স্টেশনের পূর্বতন স্টেশন মাস্টার (গুজরাটি), ট্রেনের গার্ড (সম্ভবত ইউরোপীয়), রসদের বস্তা দিতে আসা কুলি (গুজরাটি), আলভারেজ (পর্তুগীজ), শিকারি (ইউরেশীয়), আলবুকার্ক (পর্তুগীজ)। এমনকি উপন্যাসের শেষ অংশে সলসবেরিতে সে টাকা ধার নেয় যে দোকানদারের থেকে সেও ভারতীয়। আর আফ্রিকার ভূমিজ মানুষদের সে বরাবরই দেখে দূর থেকে। দেখে রেলের কনস্ট্রাকশনের কাজে সিংহের উপদ্রব বাড়ার পর যখন কেউ তাঁবু ছেড়ে দূরে কাজ করতে যেতে চায় না তখন কেবল মাসাই কুলিরাই ভয়হীন ভাবে কাজ করে চলেছে। যে ভয়টুকু দিয়ে কনস্ট্রাকশনের কাজের সঙ্গে জড়িত বাকি মানুষদের সঙ্গে একই বর্গে সামিল শঙ্কর, মাসাই কুলিদের মধ্যে সেই ভয়ের অনুপস্থিতি নজরে পড়ে শঙ্করের। এই ভয়হীনতা শঙ্করের মনে যত না সম্ভ্রম যুগিয়েছে তাদের প্রতি, তার চেয়ে অপর করে দিয়েছে বেশি।

আমরা আগেও দেখেছি, চাঁদের পাহাড়ে আফ্রিকা এক না-ভূগোলের দেশ হিসেবে উপস্থাপিত। কারণ সভ্য মানুষ দ্বারা তা সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত নয়। আবিষ্কারের এই ধারণার সঙ্গেই মিলেমিশে আছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিভঙ্গি। 'অসভ্য' কর্তৃক 'সভ্যকে' খুঁজে পাওয়া 'আবিষ্কার' নয়। 'সভ্য' যা খুঁজে পায়, যা তার মুনাফার পরিকল্পনায়, নতুন বাজার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় তাই আসলে 'আবিষ্কার' হয়ে দাঁড়ায়। রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বন্য ও অজ্ঞাত অঞ্চল, কারণ 'কোনো সভ্য মানুষ সে অঞ্চলে পদার্পণ করে নি'।[২০] আফ্রিকার ভূমিজ মানুষদের উপস্থিতি এখানে ধর্তব্যই থাকে না। হীরের খনির সন্ধানরত শঙ্কর-আলভারেজদের তাঁবুতে মাটবেল জাতির কিছু আফ্রিকান মানুষ দেখা করতে এলে, আলভারেজ শঙ্করকে সাবধান হতে বলে। আলভারেজ জানায় ওরা ভয়ানক দুর্দান্ত। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অনেকবার লড়াই হয়েছে ওদের। আলভারেজ জানায়, "ওরা সন্দেহ করেছে আমরা ওদের দেশে এসেছি হীরের খনির সন্ধানে।"[২১] ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশের বাসিন্দা শঙ্কর ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াইয়ের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তো হয়ই না, বরং সভ্য গভর্নমেন্টের আইন অর্থাৎ ঔপনিবেশিকের আইন এখানে কার্যকর থাকবে না জেনে আশঙ্কিত হয়। শঙ্কর আশ্বস্ত হয় যখন আলভারেজ বলে, "ওদের হাতের মাছ মুখে পৌঁছোবার আগেই আমার পিস্তলের গুলি ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিত।"[২২] পরাধীন দুই দেশের প্রতিনিধিরা একে অন্যের মুখ দেখেও চিনতে পারে না নিজেদের। আলভারেজ-প্রভাবিত শঙ্করের কাছে ব্রিটিশ বিরোধী মাটবেল জাতির আফ্রিকানরা হয়ে দাঁড়ায় হিংস্র শত্রু। হীরের খনির সন্ধানে আসা, ইউরোপীয়রা গোটা আফ্রিকাময় রেখে দিয়েছিল রক্তের ছাপ। সেই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ভূমিজ আফ্রিকানরা, যারা নিজেদের দেশের সম্পদ লুঠ হবার রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে, পরাধীন শঙ্করের চোখে বর্বর, নিষ্ঠুর। তাদের চোখে শঙ্করও ইউরোপীয়দের মতোই লুঠেরা।

ভারতীয় শঙ্কর, ইউরোপীয় শিক্ষার ধাঁচায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা শঙ্কর শোষিত আফ্রিকার তুলনায় নিজেকে শোষক ইউরোপেরই ঘনিষ্ঠ মনে করেছে বেশি। ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল দেহে ভারতীয় ও মননে ইউরোপীয় একদল দোভাষী শ্রেণির সৃষ্টি করা, টমাস ব্যাবিংটন মেকলে তার *মিনিট অন ইন্ডিয়ান এডুকেশন*-এ (১৮৩৫) একথা স্পষ্টতই বলে গিয়েছেন। চার্লস এডওয়ার্ড ট্রেভেলিয়ান(১৮০৭-১৮৮৬) তার *On The Education Of The People Of India* (১৯৩৮) গ্রন্থে বলেন, “the natives will not rise against us, because we shall stoop to rise them: there will be no reaction because there will be no pressure.”[২৩] সেই শিক্ষার ধাঁচায় বেড়ে ওঠা, এফ এ পাশ করা, ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের অভিযান কাহিনিতে বুঁদ হয়ে থাকা শঙ্কর ইউরোপীয় শোষকদেরই ঘনিষ্ঠ মনে করবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। ফলে ইউরোপের কাছে শাসনের পক্ষে সুবিধাজনক, অপেক্ষাকৃত ভালো ভারতবর্ষের তুলনায় কিছুতেই নিজেদের যুক্তির ছাঁচে ঢেলে সাজিয়ে না ফেলতে পারা আফ্রিকা যেমন রহস্যময় ও ভয়ানক বেশি, শঙ্করের কাছেও ঠিক তাই হয়ে দাঁড়ায় আফ্রিকার চেহারা। ভারতীয় সংস্কারের প্রতি পিছুটান এবং ইউরোপের চোখ দিয়ে দেখা আফ্রিকাবীক্ষণ তাকে ভাবতে বাধ্য করিয়েছে, “রিখটারসভেল্ড পর্বতমালা ভারতবর্ষের দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় নয়— এদেশের মাসাই, জুলু, মাটাবেল, প্রভৃতি আদিম জাতির মতই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংসলোলুপ।”[২৪]

ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের চোখে আফ্রিকার ভূমিজ মানুষদের প্রতি যে ঘৃণা ঝলক দিয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে বারবার, তার প্রতিফলন ছড়িয়ে আছে অজস্র বাংলা শিশুকিশোর সাহিত্যে। রবার্ট মিশেল ব্যালেন্টাইনের (১৮২৫-১৮৯৪) 'দ্য গোরিলা হান্টারস' (১৮৫৮) অবলম্বনে লেখা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আফ্রিকার জঙ্গলে' উপন্যাসে তো আরো উগ্রভাবেই ধরা পড়ে সে চিত্র।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গরিলা শিকারে যাওয়া তিন ভারতীয় শোভনলাল, ধীরেন্দ্র আর রতনের সাহসের পরিচয় দিতে গিয়ে শুরুতেই লেখক বলেন, “পথের মাঝে হিংস্র জন্তুর মুখে, কি নিগ্রোদের হাতে বা তৃষ্ণায় অথবা অসুখে প্রাণ হারাতে হত। তবু উৎসাহ ও সাহস যাদের আছে তারা কি ওতে ভয় পায়?”[২৫] কিশোর পাঠকদের সাহসী করে তোলার আয়োজনের পাশাপাশি ভিন্ন জনজাতির প্রতি বিরূপ করে তোলার রসদও ঠাসা থাকে এভাবেই। গরিলা শিকারে অভিযানরত তিন বাঙালির গল্প এগোতে থাকলে একসময় দেখা যায় তারা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় এক ‘নিগ্রোপল্লী’তে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেখানের কৃষ্ণাঙ্গ গ্রামবাসীরা তাদের আক্রমণ করে ও বন্দী বানায়। যদিও লেখক জানিয়ে দেন মাত্র কয়েকমাস আগেই দাস ব্যাবসায়ীদের হাতে গ্রামবাসীরা কিভাবে নিগৃহীত হয়েছে, এবং তারই ফলশ্রুতিতে এই শিকারিদেরও তারা দাস-ব্যাবসায়ী ভেবে শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে, তারপরেও ওই উপন্যাসের শেষেই এই কালো মানুষদের পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় ‘রাক্ষুসে নিগ্রো’। তাদের কোলাহল বর্ণিত হয় ‘রাক্ষসদের চিৎকার’ বলে। উপনিবেশের বাসিন্দাদের চোখও আচ্ছন্ন থাকে ঔপনিবেশিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতেই। আফ্রিকা সম্পর্কে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গিও তার ব্যতিক্রম হয়ে থাকেনি ‘চাঁদের পাহাড়ে’।

শুধু আফ্রিকার মানুষদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, ইউরোপীয় মানুষদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও ‘চাঁদের পাহাড়’-এর ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে ইউরোপের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন। শঙ্করকে যে নায়কোচিত আদল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক, সেকথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। অথচ এই সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা, আর দশজন বাঙালি ছেলের তুলনায় শক্তি-সাহস-কষ্টসহিষ্ণুতায় অগ্রবর্তী শঙ্করের যাবতীয় কৃতিত্ব ম্লান হয়ে যেতে দেখা যায় আলভারেজের সামনে। পরের দুঃখে কাতর শঙ্কর দয়াপরবশ হয়ে আলভারেজকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে

এনেছিল নিজের শুশ্রূষার গুণে। হীরকখনির হদিশ জানানোর সময়ও আলভারেজ স্বীকার করেছিল, "দেশ ছেড়ে এত দূর এসে আছ যখন, তখন তোমার সাহস আছে, কষ্ট সহ্য করবার শক্তি আছে।"[২৬] আলভারেজের সঙ্গে হীরের খনির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার পর থেকে কিন্তু আলভারেজের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতার কাছে পরাধীন ভারতবর্ষের সন্তান শঙ্করকে নেহাতই অপটু ও পরনির্ভরশীল বলে প্রতিপন্ন হতে হয় বারবার। আলবুকার্কের সঙ্গে ডুয়ালে শঙ্কর ভয় না পেলেও নিশ্চিত মৃত্যুস্বরূপ সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় না শুধু ঠিক সময়ে আলভারেজ উপস্থিত হয়ে যাওয়ার ফলেই। আলবুকার্ককে উদ্দেশ্য করে আলভারেজ বলে, "বালককে একা পেয়ে খুব বীরত্ব জাহির করছিলি, না?"[২৭] তারপর থেকে গোটা উপন্যাসে শঙ্করের বালকত্ব আর ঘোচে না। কয়েকদিন পরেই শঙ্কর যখন জঙ্গলে পথ হারায় আলভারেজ পূর্বে সতর্ক করে দেওয়ার পরেও তখন তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করার পর আলভারেজ বলে, "তুমি আর কখনও তাঁবু থেকে ওরকম বেরিও না, কারণ তুমি আনাড়ী।"[২৮] ফলত আলভারেজের ওপর নির্ভরশীল হয়েই অভিযানে বহাল থাকে শঙ্কর। আর নানা ছোটবড় ঘটনায় 'আনাড়ী' ভারতীয় শঙ্করের তুলনায় দুঁদে অভিযাত্রী আলভারেজ যে কতোটা পটু তার প্রমাণ দেওয়া চলতে থাকে। দূর থেকে মাটবেল জাতির লোকদের আসার চিহ্ন শঙ্কর বুঝতে পারে না; কিন্তু 'আলভারেজের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার হাতের বন্দুকের গুলির মতোই অব্যর্থ',[২৯] তাই আগেই সতর্ক হয়ে যায় সে। বিষ-লতার প্রভাবে অচৈতন্য শঙ্করকে উদ্ধার করে আলভারেজ। অতিবর্ষণের ফলে নিরীহ পাহাড়ি নদী আচমকা ফুলে ফেঁপে উঠে মধ্যরাতে তাদের তাঁবুসমেত ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করলে শেষরক্ষা হয় আলভারেজের সজাগ ঘুমের জন্যই। বিপদগ্রস্ত শঙ্করের কাছে সর্বদাই উদ্ধারকর্তা হয়ে থাকে আলভারেজ। বারে বারে তা শঙ্করকে স্মরণও করিয়ে দেয় আলভারেজ। গহন অরণ্যে প্রবেশ করলে শঙ্করকে আলভারেজ বালককে

সতর্ক করার মতোই সাবধান করে, "মধ্য আফ্রিকার বন শৌখিন ভ্রমণের পার্ক নয়।"[৩০] আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের সময় শঙ্কর কৌতূহলবশে তাড়াতাড়ি বেরোতে গেলে, আলভারেজ বারণ করে বলে, "তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি। বিনা বন্দুকেই বা যাচ্ছ কোথায়?"[৩১] অপ্রশিক্ষিত শঙ্করের প্রতি তার বিরক্তি গোপন থাকে না। শঙ্কর রিখটারসভেল্ডের বাইরের থাকটাকেই প্রকৃত রিখটারসভেল্ড বলে ভাবলে আলভারেজ আবারও তার আনকোড়া অপটুত্বের দিকে ইশারা করে, "তোমার ধারণা নেই বললাম যে।"[৩২] আফ্রিকার জঙ্গলে দিশাহীন হয়ে পড়া শঙ্করের এই অপটুত্বের কথা আলভারেজ আবারও বলে যখন তারা জঙ্গলে মরণ ঘূর্ণিতে (death circle) পথ হারায়। আলভারেজ বলে, "তুমি তো বুঝতে পারো না, তোমার কাছে সব বনই সমান।"[৩৩] যদিও পথ হারিয়ে ডেথ সার্কেলে ফাঁসে দুজনেই, কিন্তু সাদা চামড়ার আলভারেজের ধারণায় তবু পিছিয়ে থাকতেই হবে কালো চামড়ার শঙ্করকে। মরণ ঘূর্ণিতে দুজনে ফাঁসলেও কিছুতেই একই পংক্তিতে এসে দাঁড়াতে পারবে না তারা। আলভারেজের ধারণায় রক্ষকের ভূমিকায় আলভারেজ নিজেই তখনো। যেভাবে শ্বেতাঙ্গরা মনে করে এসেছে কালো মানুষদের উদ্ধার করা তাদেরই দায়, ঈশ্বর নির্দেশিত যে দায় পূরণ করতে তারা দাপিয়ে বেড়িয়েছে উপনিবেশ জুড়ে আর দলামোচড়া করে নিজেদের সুবিধামাফিক ছাঁদে ঢেলেছে তাদের সংস্কৃতি, ঠিক তেমনই দায় নয় কি? অথচ আলভারেজের নেতৃত্বে চলতে গিয়ে পথ ভুল হবার দায় আসলে নেওয়ার কথা আলভারেজেরই। বর্ণের ভেদ তবু আলভারেজের কণ্ঠেই এনে দেয় প্রভুত্বের স্বর। আর ঔপনিবেশিক শিক্ষার ছাঁচে গড়ে ওঠা শঙ্করের শ্বেতাঙ্গচরিত্রের প্রতি সম্ভ্রমই প্রকাশ পেতে থাকে বারবার। প্রবল বৃষ্টিতে যখন তারা আলভারেজের 'হুকুমে' পর্বতের চড়াই ভেঙে উঠতে শুরু করে তখনই লেখক শঙ্করের মনোভঙ্গি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "শঙ্কর এটা আশা করেনি। এখানে শঙ্কর কর্মী

শ্বেতাঙ্গচরিত্রের একটা দিক লক্ষ্য করলে। তার মনে হচ্ছিল, কেন এই বৃষ্টিতে মিছে মিছে বার হওয়া?”[৩৪] লক্ষণীয় এখানে ব্যক্তি আলভারেজ নয় শ্বেতাঙ্গ চরিত্রেরই মহিমা আচ্ছন্ন করে শঙ্করকে। শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ ফারাক, স্বাধীন-পরাধীনের ফারাক, ইউরোপ ও এশিয়ার ফারাক আরও স্পষ্ট ও বিরোধমূলক হয়ে দেখা দেয় যখন তারা নদীর জলে সোনার রেণুর সন্ধান পায়। জানা যায় এক টন বালি ধুয়ে সোনা পাওয়া যেতে পারে আউন্স তিনেক, যা আলভারেজের মতে মজুরিতে পোষাবে না। কিন্তু শঙ্করের কাছে তা উৎসাহব্যঞ্জক। কারণটা লেখকই বুঝিয়ে দেন, “শঙ্করের মজুরির ধারণার সঙ্গে আলভারেজের মজুরির ধারণা মিল খায় না।”[৩৫] উপনিবেশের মজুরি আর ঔপনিবেশিক ইউরোপের মজুরির পার্থক্য, শোষক ও শোষিতের পার্থক্যের দ্যোতনা বহন করে আনে এখানেও। শেষ পর্যন্ত আলভারেজের মজুরির ধারণাই বলবৎ হয়। শুধু প্রসপেক্টর আলভারেজের অভিজ্ঞতার কারণেই? শ্রম সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ঔপনিবেশিকের হাতে থেকে যায় বলেও নয় কি?

আলভারেজকে অজ্ঞাত ও অদ্ভুত কোনো জন্তু কখনো দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে আলভারেজ যখন কোনো এক অজানা বিভীষিকাময় স্মৃতিকে স্মরণ করে শিউরে ওঠে তখন সেই ভয় অলক্ষিতে শঙ্করের মনকেও গ্রাস করে। কারণ শঙ্কর এই অজানা অরণ্যে কেবলই যেন আলভারেজের প্রতি নির্ভরশীল এক শিক্ষানবিশ। তার সাহস, শক্তি, স্থৈর্য যা তাকে সুদূর আফ্রিকায় ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েও এতদিন রক্ষা করেছে তা সবই যেন মূল্যহীন আলভারেজের উপস্থিতিতে। বারবার লেখক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এসবই ব্যক্তি আলভারেজের প্রতি শঙ্করের শ্রদ্ধা থেকেই তৈরি হওয়া, শ্বেতাঙ্গ-প্রীতি বা আনুগত্য থেকে নয়। আলভারেজের মৃত্যুর পর লেখকের মন্তব্য, “এই ক’মাসে সে আলভারেজকে সত্যিই ভালবেসেছিল, তার নির্ভীকতা, তার সঙ্কল্পে অটলতা, তার পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তি, তার বীরত্ব— শঙ্করকে মুগ্ধ

করেছিল।”[৩৬] আলভারেজ-শঙ্করের সম্পর্ককে পিতা-পুত্রের সম্পর্কের দ্যোতনা দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন লেখক। যেন এই শ্রদ্ধাবশতই শঙ্করের মনে হয়েছে আলভারেজের মতো লোকেরা কাঙাল নয় অর্থের, বিপদের নেশাই তাদের চালকবল, “কুবেরের ভাণ্ডারও তাকে এক জায়গা চিরকাল আটকে রাখতে পারতো না।”[৩৭] যদিও একথা স্পষ্ট হয়েই তাকে আফ্রিকার প্রাণীজ-উদ্ভিজ বৈচিত্র্য কিংবা সাংস্কৃতিক অভিনবত্ব, ভৌগোলিক আবিষ্কার কিংবা জীববিজ্ঞানের নতুন তথ্যের খোঁজ, কোনটাই আলভারেজের আফ্রিকা অভিযানের মূল উদ্দেশ্য নয়। হীরের খনির মতো আর্থিক লাভজনক বিষয়ে আগ্রহ থেকেই তার আফ্রিকার জঙ্গলে ছুটে ছুটে আসা। এও ভুলে যাওয়া যায় না, যে হীরের খনি খুঁজে বার করার নক্সা আলভারেজ ও জিম কার্টার এমনভাবেই বানিয়েছিল যাতে তা আর কেউ দেখে সেই খনি খুঁজে বার করতে না পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষাহীন মানুষ বলে সত্যিই কি তাহলে আলভারেজকে ধরে নেওয়া যায়? শঙ্করের চেতনায় আলভারেজকে নিয়ে কোনো বিরূপ প্রশ্ন উঠতে দেখা যায় না কখনো। বরং তার মনোভঙ্গি থেকে মনে হয়, ডেথ সার্কেল থেকে বেরিয়ে কালাহান্ডি মরুভূমি পেরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে ফিরে আসার যাবতীয় সফল চেষ্টা শঙ্কর একাই করলেও নেপথ্যে যেন আলভারেজই তাকে চালনা করে গিয়েছে। আলভারেজের মুখে বুলাওয়েও আর সলসবেরী শহরের নাম, জঙ্গলে তাদের অবস্থান থেকে শহরদুটির আনুমানিক দূরত্ব ও অবস্থানের দিক শঙ্কর ঘটনাচক্রে শুনেছিল বলেই আলভারেজের মৃত্যুর পর সে নিজ গন্তব্য স্থির করতে পেরেছিল। বারেবারে শঙ্কর আলভারেজকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছে এই কারণে। আলভারেজের কাছ থেকে শিখে নেওয়া ‘বুশ ক্রাফট’ তার জঙ্গল পাড়ি দেওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হয়ে থেকেছে। গুহার মধ্যে পথ হারিয়ে শঙ্কর যখন মৃতপ্রায় তখনও হতাশা কাটিয়ে উঠে বাঁচার চেষ্টা করতে তার ভাবনায় আলভারেজেরই উপস্থিতি লক্ষণীয়,

"আলভারেজের শিষ্য সে, নিশ্চেষ্ট ভাবে হাত-পা কোলে করে বসে কখনই মরবে না।"[৩৮] ভয়ঙ্কর কালাহাণ্ডি মরুভূমি একা পেরোবার প্রাক-মুহূর্তেও তার ভেতরে আশার সঞ্চার হয় বৃদ্ধ আলভারেজ যা একা পারবে বলে স্থির করেছিল তা সেও পারবে মনে করে।

আলভারেজ শঙ্করের কাছে হয়ে উঠেছিল আদর্শ পুরুষ। বম্বেগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আলভারেজকে স্মরণ করতে করতে শঙ্কর ভেবেছে, "যেন তোমার মতো হতে পারি জীবনে, অমনি সুখে-দুঃখে নিস্পৃহ, অমনি নির্ভীক।"[৩৯] আদর্শায়িত আলভারেজের হীরের খনির মালিকানা সম্পর্কিত ইউরোপীয় ধারণার দ্বারাও যে শঙ্কর প্রভাবিত হয়ে থাকবে সেটাও স্বাভাবিক। চিমানিমানি পর্বতের কাছে পৌঁছে শঙ্করের মনে হয়েছে, "আজ পৃথিবীর বৃহত্তম রত্নখনির মালিক সে। নিজের পরিশ্রমে ও দুঃসাহসের বলে সে তার স্বত্ব অর্জন করেছে।"[৪০] সাহস ও শ্রম যুক্ত হলেই পৃথিবীর যে কোনো স্থানের ভূমিজ সম্পদ যে কোনো ব্যক্তি অধিকার করে নিতে পারে তবে? সাম্রাজ্যবাদের এই যুক্তির দ্বারা পরাধীন দেশের শঙ্করও যে গ্রস্ত হয়েছে তাতে আলভারেজের শিক্ষাও দায়ী। ফলে ব্যক্তি-আলভারেজের প্রতি শ্রদ্ধা কখন যে শ্বেতাঙ্গ আলভারেজের প্রতি অন্ধত্বে পরিণত হয়েছে তা খেয়ালই করেনি শঙ্কর।

যে আলভারেজ দ্বারা এতটাই গ্রস্ত শঙ্কর, তার ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে খুব বেশি কিছু না জানা গেলেও কিছু ভয়ানক তথ্য প্রকাশিত হয়ে উপন্যাসেই। আলভারেজের মৃত্যুর পর তার কাগজপত্র ঘেঁটে খনি-বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা অর্জনের নথি দেখে শঙ্কর তার আদর্শায়িত ব্যক্তির শিক্ষা সম্পর্কে আশ্বস্ত হলেও তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় আলভারেজ শুরুতেই রোগশয্যায় শুয়ে জানিয়েছিল শঙ্করকে। জিম কার্টারের সঙ্গে অভিযান অসমাপ্ত রেখে ফিরে এলে তারপর আর আলভারেজের রিখটারসভেল্ডে যাওয়া হয়নি, কারণ সে বুয়র যুদ্ধে যোগদান করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘকাল ধরে অবস্থানরত ডাচদের একাংশ ব্রিটিশ শাসনের অধীনতা থেকে

নিজেদের স্বাধীন বোয়ার জাতি বলে ঘোষণা করেছিল। প্রথম বোয়ার যুদ্ধ (১৮৮০-৮১) অল্প কয়েকমাস স্থায়ী হয়েছিল এবং তাতে ইংরেজরা বিপর্যস্ত হয়েছিল। তারপর সমঝোতার নানা চেষ্টা চললেও অবশেষে দ্বিতীয় বোয়ার যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৮৯ সালে এবং ১৯০২ সাল পর্যন্ত চলে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বোয়ার গেরিলারা মরণপণ করে লড়ে প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করলেও অবশেষে ব্রিটিশরা জয়লাভ করেছিল। এই দ্বিতীয় বোয়ারযুদ্ধে ইংরেজদের হয়ে লড়াই করেছিল আলভারেজ। আলভারেজ ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর নিয়মিত সৈনিক ছিল না। ফলে এই যুদ্ধে যোগ দেওয়াটা তার ইচ্ছাধীন ছিল। ইচ্ছা কিংবা কেবলমাত্র অর্থ রোজগারের স্বার্থে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গ দিয়ে অনায়াসে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে সেই কিনা হয়ে ওঠে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ছেলে শঙ্করের আদর্শ পুরুষ, পিতাসম। আফ্রিকান মাটবেল জাতির মানুষ সম্পর্কেও আলভারেজ যখন বলে, “ওদের হাতের মাছ মুখে পৌঁছবার আগেই আমার পিস্তলের গুলি ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিত”,[৪১] তখনও আলভারেজের সেই ভিন-জাতি সম্পর্কে খুনে মানসিকতা শঙ্করকে মুগ্ধ করে; অনুসরণযোগ্যও করে তোলে।

এই একই মনোভাব আমরা দেখতে পাই আত্তিলিও গাত্তি সম্পর্কেও। ফ্লোরেন্সের সম্ভ্রান্ত গাত্তি বংশে জন্মানো আত্তিলিও সম্পর্কে উপন্যাসের শেষে শঙ্করকে বলতে দেখা গিয়েছে, “অনেক জন্মের বন্ধু ছিলে তুমি।”[৪২] আত্তিলিওর চিঠি থেকে জানা যায়, তার সঙ্গীরা হীরের খনির সন্ধান আত্তিলিও ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করছে ভেবে তাকে আক্রমণ করে। তাদের সম্পর্কে আত্তিলিওর মনোভাব, ‘আমার সঙ্গীরা বর্বর জাহাজের খালাসী’[৪৩] এবং তার পূর্বপুরুষ অমন বহু বর্বরকেই আগে হত্যা করেছে। শ্রেণিগত এই উচ্চমন্যতার পাশাপাশি সেই মালিকানা সম্পর্কিত সাম্রাজ্যবাদী বক্তব্য আত্তিলিওকেও লিখতে দেখা যায়, “জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হীরক খনির মালিক আমি, কারণ নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তা আমি আবিষ্কার করেছি।”[৪৪] শঙ্কর-আলভারেজ-

আত্তিলিও প্রত্যেকের কাছেই 'আবিষ্কার' আর 'মালিকানা' সমার্থক হয়ে উঠেছে এভাবেই। যে যুক্তিতে অরণ্য-সম্পদ লুণ্ঠিত হয় অরণ্য-মানুষের থেকে, সে যুক্তি চাঁদের পাহাড়ে পেয়েছে সার্বিক স্বীকৃতি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসে শঙ্করকে 'নায়ক' করে তুলতে চেয়ে যতোই স্বতন্ত্র এবং সাধারণের তুলনায় আলাদা করে আঁকতে চান লেখক, স্থান ও কালের মাপকাঠিতে শঙ্করও আটকে আছে বিশ শতকের ইউরোপমুখী জাতীয়তাবাদের নৈতিক অবস্থানগুলিতেই। নায়ককে সাধারণের থেকে স্বতন্ত্র রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা লেখক শুরু থেকেই করে গেলেও দেশ-কাল সাপেক্ষ নৈতিকতার ঊর্ধ্বে তাকে স্থাপন করতে পারেননি।

হীরা মানিক জ্বলে:

বিভূতিভূষণের হীরামানিক জ্বলে' উপন্যাসটি *মৌচাক* পত্রিকায় ১৩৪৮ এর বৈশাখ থেকে ১৩৪৯-এর চৈত্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'চাঁদের পাহাড়'-এর শঙ্কর যেমন, তেমনি 'হীরামানিক জ্বলে'-এর সুশীলও এক অসুখী চৈতন্যের থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হয়েছিল সুদূরের অ্যাডভেঞ্চারে। তবে শঙ্কর চরিত্রের বুনটে লেখক যেমন শুরু থেকেই এঁকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নায়কোচিত গুণের ছাপ, যেভাবে ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চারিস্টদের প্রেরণাপ্রাপ্ত হয়ে তাদেরই মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে শঙ্কর, সুশীল তার তুলনায় আলাদা। সুশীলের আশৈশব কোনো অ্যাডভেঞ্চারের পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। ছিল না নিজেকে মেলে ধরার কোনো তাগাদা। গ্রামের সমৃদ্ধশালী মুস্তফি বংশে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। "বনেদি পুরানো চালচলনে আবাল্য অভ্যস্ত সুশীল। বয়সে যুবক হলেও প্রাচীনের ভক্ত।"[৪৫] গ্রামীণ জমিদার বাড়ির বনেদিয়ানার মধ্যেই তার জীবন সুখে অতিবাহিত হতে পারত যদি না বিশ শতকের

পুঁজিবাদের আয়নায় ধ্বস্ত সামন্ততন্ত্র তার নিজের মুখ না দেখতে পেত। ম্যাট্রিক পাসের পর নিছকই বাড়িতে বসে সময় কাটানোকেই স্বাভাবিক বলে মনে করে আসা সুশীলের কাছে অন্য কোনো জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করাও বুঝি ছিল বনেদিয়ানার অপমান। অথচ আশেপাশের গ্রামের মধ্যে বড়োলোক হলেও তাদের ক্ষয়িষ্ণু আর্থিক অবস্থার কথা লেখক বলে দিয়েছেন শুরুতেই— "ভাঙা পুজোর দালানে আগের মত জাঁকজমকে এখন আর পুজো হয় না— প্রকাণ্ড বাড়ীর যে মহলগুলোর ছাদ খসে পড়েছে গত বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে, সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না, বাড়ীর মেয়েদের বিবাহ দিতে হয় কেরানি পাত্রদের সঙ্গে— অর্থের এতই অভাব।"[৪৬] এই অভাবটুকুও সুশীল স্বাভাবিক বলে মেনে নিত যদি না একদা তাদেরই আশ্রিত রায় বাড়ির বর্তমানে সুশিক্ষিত ও চাকরির মাধ্যমে উন্নতি ঘটানো উত্তরসূরিরা পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সংঘাতকে সুন্দরপুরগ্রামেও নিয়ে গিয়ে হাজির করত। পুজো উপলক্ষে রায়বাড়ির ছেলে অবনীর বাড়ি আসা এবং নতুন আমদানী অর্থের মাধ্যমে বড়লোকি চালচলন সুশীলকে পীড়া দিতে থাকে। নতুন ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্তের কাছে সুশীল বারবার মার খেতে দেখে তার এতদিনকার সামন্ততন্ত্রের লালিত চিহ্নগুলিকে। শতরঞ্চি, ঝাড়বাতি বনাম ডে লাইট, হাতি বনাম মোটর গাড়ি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুশীল সামন্ততান্ত্রিক চিহ্নগুলির পক্ষ নেয় এবং উপহাসের পাত্র হয়। সুশীল নিজের কাছেই যেন যুক্তি দেয়, "এরা এখন সব হঠাৎ-বড়লোকের দল, পুরনো বংশের ওপর এদের রাগ থাকা অসম্ভব নয়।"[৪৭]

ধনতন্ত্রের চিহ্নরা যখন সুশীলদের গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তখন ধ্বস্ত সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বিপরীতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বাড়বাড়ন্তই শুধু নয়, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপরীতে ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের, ধ্যানধারণার বিকাশকেও সূচিত করে দেয়। যার ফলশ্রুতিতেই সুশীল তার জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা জ্যাঠামণি, আমাদের বংশে

কখনো কেউ চাকরি করেছে?”[৪৮] চাকরি করলে তাদের বংশের মান যায় জেনে সাময়িক ভাবে আশ্বস্ত হলেও, বারবার সুশীলের সামনে নব্য বিকাশোন্মুখ পুঁজিবাদী সভ্যতার ধারণাগুলো বিদ্রূপের মতো এসে দাঁড়ায়। লেখাপড়া শিখেও সুশীলের কাজের চেষ্টা না করে ঘরে বসে থাকাকে গ্রামের লোকজন ভালো চোখে দেখছে না, প্রথম অনুভব করে সুশীল। লেখক জানান, “এদিক থেকে সে কোনদিন নিজেকে বিচার করে দেখেনি। চিরকাল তো এইরকম হয়ে আসছে তাদের বংশে, এতদিন কেউ কিছু বলে নি, আজকাল বলে কেন তবে?”[৪৯] আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না নতুন বিকশিত ধনতন্ত্রের ধারণা যা অবনীরা বহন করে নিয়ে গেছে সুন্দরপুর গ্রামে, সেই ধারণাই পুরাতন সামন্তবাদী ধারণাকে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। যার ফলে সুশীল প্রথমে বন্ধুর আড়তে কাজ শিখতে যোগ দেয়। অন্তরের যোগ না থাকায় তারপর সে কাজ সেরে যাত্রা করে কলকাতায়। এভাবে ধনতন্ত্রের কাছে পর্যদুস্ত হয়ে সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি সুশীল গিয়ে উপস্থিত হয় ধনতন্ত্রেরই কেন্দ্রভূমি কলকাতায়।

সুশীলের প্রাথমিক স্থানিক সরণ ঘটেছিল সুন্দরপুর থেকে কলকাতায়, গ্রাম থেকে শহরে। অতীতের সামন্ততন্ত্র থেকে ভবিষ্যতের ধনতন্ত্রের দিকে। নতুন অভিজ্ঞতাহীন যে নিশ্চল অবস্থায় সুন্দরপুরে তার বনেদি জীবন বয়ে যাচ্ছিল তার তুলনায় কলকাতা তার কাছে বেশ কিছু নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে। প্রাথমিকভাবে ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছা নিয়ে কলকাতায় এলেও আসার পর সে জানতে পারে ডাক্তারি পড়ার নতুন বছর জুলাই মাসে শুরু হবে যার এখনো কয়েকমাস দেরী। ফলে সে অফিসে কাজের চেষ্টা করে। পনের দিন পেরিয়ে গেলেও সে কাজ জোটাতে পারে না। বোঝা যায় এই প্রথম সুশীল তার চেনা চৌহদ্দি ছেড়ে বাস্তবের মাটিতে পা রাখছে। নগদ টাকার টানাটানি তার এই বাস্তবতাকে কর্কশই করে তোলে কিছুটা। পাশাপাশি নাগরিক জীবনের স্থানাভাব, যা গ্রামের বাড়িতে থাকাকালীন সুশীলকে ভোগ করতে হয়নি তাও

অনুভব করতে থাকে সুশীল, "খিদিরপুরে তার মামার বাসাটিও ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের চিৎকার ও উপদ্রবে সদা সরগরম— সেখানে গিয়ে একটা ঘরে তিন-চারটি আট-দশ বছরের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে হবে। সুশীলের ভালো লাগে না আদৌ।"[৫০] এই নাগরিক দমবন্ধ অবস্থা থেকে ক্ষণিকের মুক্তির জন্যই সে সন্ধ্যার দিকে রোজ গড়ের মাঠে গিয়ে বসত। সেই সূত্রেই জামাতুল্লার সঙ্গে তার আলাপ ও অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়া।

জামতুল্লার সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের মুহূর্তটি লক্ষণীয়। গড়ের মাঠে একা বসে সুশীল তার গ্রামের বাড়ির চাকর হরির সাপে কামড়ানো ও প্রাণরক্ষার ঘটনার কথা ভাবছিল। তার মনে হয়েছে, "হরি যে বেঁচে গেল, তার পুনর্জন্ম বলতে হবে।"[৫১] ঠিক সেই সময়েই অপরিচিত জামাতুল্লা তার কাছে দেশলাইয়ের সন্ধানে আসে। জামাতুল্লার সঙ্গে আলাপ হওয়া ও সুদূর সুলু সীতে অ্যাডভেঞ্চারের আশায় ছুটে যাওয়া, বনেদি ঘরের সুশীলের জীবন রহস্য রোমাঞ্চে ভরে ওঠা, এসবের মধ্যে দিয়ে সুশীলের নতুন জীবন লাভ হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। যে জীবনের সূচনা জামাতুল্লার 'ম্যাচিস' চাইতে আসার মাধ্যমেই। সে অর্থে জামাতুল্লার সঙ্গে প্রথম আলাপের মুহূর্তটিতে এক অর্থে সুশীলেরও 'পুনর্জন্ম' ঘটে। এই পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষাই আবার ফিরে আসবে যখন দুর্বল ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি হিন্দুর প্রতিনিধি সুশীল প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের মধ্যে খুঁজে পাবে হিন্দুশৌর্যের নানা নিদর্শন। লেখকের বর্ণনায়, "মনে মনে সুশীল তাদের প্রণতি জানালে। নমো নমঃ দিগ্বিজয়ী পূর্বপুরুষগণ, আশীর্বাদ কর— যে বল ও তেজ তোমাদের বাহুতে, যে দুর্ধর্ষ অনমনীয়তা ছিল তোমাদের মনে, আজ তোমাত অধঃপতিত দুর্বল উত্তরপুরুষরা যেন সেই বল ও তেজের আদর্শে আবার নিজেদের গড়ে তুলতে পারে, সার্থক করতে পারে ভারতের নাম বিশ্বের দরবারে!"[৫২] হতে পারে হিন্দু-ভারতের 'পুনর্জন্ম'-এর আকাঙ্ক্ষা নির্মাণের প্রকল্পের জন্যই পূর্বোক্ত পুনর্জন্মগুলির অবতারণা। সুশীলের দ্বিতীয় সরণ, বর্তমান থেকে অতীতের

দিকে। উদীয়মান ধনতন্ত্রের কেন্দ্রভূমি কলকাতা থেকে হিন্দু বলবত্তার লুপ্ত ইতিহাসের কেন্দ্রভূমি সুলু-সীর অজানা দ্বীপে।

'হীরামানিক জ্বলে'র সুশীল 'চাঁদের পাহাড়'-এর শঙ্করের মতো আশৈশব প্রস্তুত ছিল না অ্যাডভেঞ্চারের জন্য। ফলে ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চারিস্টদের প্রভাবও তার ক্ষেত্রে কম। ঘটনাচক্রে জামাতুল্লার সঙ্গে মোলাকাতই তাকে অভিযানের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। প্রথমদিন আলাপের পর যখন জামাতুল্লা তাকে পরেরদিন দেখা করতে বলে তখন কৌতূহল ও উত্তেজনায় সুশীল রাতে ভালো করে ঘুমাতে পারে না। "জাহাজী মাল্লা কত দূর কত দেশ ঘুরেছে, কোন এক আশ্চর্য ব্যাপারের কথা কি তাকে বলবে?"[৫৩] এরপর জামাতুল্লার কাছে সুলু সীতে তার 'বিক্ষমুনির দ্বীপ'-এ আটকে পড়ার গল্প ও সেখানের প্রাচীন হিন্দু নগরের ধ্বংসাবশেষের কথা শুনতে শুনতে তার মনে হয়, "পৃথিবীর কত পর্বতে, কন্দরে মরুতে অরণ্যে অজানা স্বর্ণরাশি মানুষের চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে— বেরিয়ে পড়তে হবে সেই লুকানো রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে— পুরুষ যদি হও!"[৫৪] অভিযানের বিপরীতে 'আপিসের দোরে দোরে মেরুদন্ডহীন প্রাণীদের মত ঘুরে ঘুরে সেলাম বাজিতে চাকুরির সন্ধান'[৫৫] যা বিগত কিছুদিন যাবৎ সুশীল করে আসছিল, তা নিজের কাছেই ক্লিশে লাগতে থাকে সুশীলের। বিদেশী অভিযান নায়করা নয়, অশিক্ষিত খালাসি জামাতুল্লাই তার কাছে অ্যাডভেঞ্চারিস্টের নমুনা— "এই খালাসিটা হয়ত লেখাপড়া শেখে নি, হয়ত মার্জিত নয়— কিন্তু এ সপ্ত সমুদ্র পাড়ি জমিয়ে এসেছে, দুনিয়ার কত বড় বড় বন্দর বড় বড় দ্বীপ দেখতে কিছু বাকি রাখে নি—।"[৫৬] বিপদের সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা থেকে বনেদি ঘরের সুশীল বঞ্চিত থেকেছে চিরকাল, সে অভিজ্ঞতাই সুশীলের কাছে জামাতুল্লাকে করে তুলেছে নায়কসম, যদিও তখনও সেই নায়কের হাতছানিতে সুদূর সুলু সীতে রওনা দেওয়ার অভিপ্রায় সুশীলের ছিল না। তাই

বাড়ি ফিরে সনৎকে সে বলে “এই কলকাতা শহরেই অনেক মজা ঘটে যায় দেখছি!”[৫৭] তার অভিযানের ইচ্ছা জেগে ওঠে যখন ডাঃ বসু জামাতুল্লার কাছে থাকা পদ্মরাগমণির ওপরের সীলমোহর দেখে তা নবম শতাব্দীর বলে দাবি করেন এবং ভারতবাসী যখন সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল সেই সময়ের সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

সুশীলের কাছে জামাতুল্লা যেমন একদিকে হয়ে উঠছিল নায়ক চরিত্র, অন্যদিকে সুশীলের মামাত ভাই সনৎ, যে কিনা ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকে সুশীলের, তার মধ্যেও লেখক এঁকে দিতে চেয়েছিলেন কিছু নায়কোচিত বীরত্বের ছাপ। সনৎ লেখাপড়ায় ভালো, ফুটবল খেলায় ভালো, নির্ভীক। খেলার মাঠে ফিরিঙ্গি সার্জেন্টের সঙ্গে সে মারামারিতে জড়িয়ে যেতে পারে, গুণ্ডার হাত থেকে একটি মেয়েকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ বিপন্ন করতে পারে। সুন্দরপুরে থাকাকালীন যা সুশীল নিজে কখনোই ছিল না, তা সনৎ এবং জামাতুল্লার মধ্যে আবিষ্কার করে সুশীল।

অভিযান ভাবনায় ইউরোপীয় ধারণা থেকে সুশীল যে নিজেকে দূরে রাখতে চায় তার উদাহরণ আমরা পাই যখন ‘বিষ্ণমুনির দ্বীপ’-এর ধ্বংসাবশেষে পৌঁছে, সন্ধানরত সুশীলরা সামনে বিরাট সমুদ্রকে পুনরাবিষ্কার করে। সনৎ ‘আলাট্টা’ বলে চিৎকার করে উঠলে সুশীল তাকে সতর্ক করে বলে, “তোমার এ চিৎকার সাজে না সনৎ। তুমি জেনোফেনের বর্ণিত গ্রীক সৈন্য নও, সমুদ্রের ধারে তোমার বাড়ী নয়—”[৫৮] নিজের দেশীয় অবস্থান সম্পর্কে সদাচেতন থাকতে দেখা যায় সুশীলকে।

এই যে ইউরোপীয় প্রভাবমুক্ত অভিযানের প্রকল্প নির্মাণ করছেন লেখক, তার পিছনের উদ্দেশ্যটি আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *প্রবন্ধ পুস্তক* প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে। পরবর্তীকালে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তা *বিবিধ প্রবন্ধ—প্রথম ভাগ*-এর অন্তর্ভুক্ত

হয়। *প্রবন্ধ পুস্তক*-এর অন্যতম প্রবন্ধ 'ভারত কলঙ্ক'-তে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভারতীয়-হিন্দুরা বলবীর্যহীন, এ ধারণাকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ইউরোপীয়রা স্বীকার না করলেও হিন্দুদের বাহুবলেই তারা কাবুল জয় করেছিল। আবার "সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে— মহারাষ্ট্র এবং শীকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন।"[৫৯] তিনি একথা আরও জোরের সঙ্গে বলেন, তৎকালীন হিন্দুদের চেয়ে প্রাচীন হিন্দুরা শক্তি ও বীরত্বে অনেক এগিয়ে ছিল, "প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ পরজাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে— দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহারা পরাধীন হয়েন নাই।"[৬০] তাহলে ভারতীয় হিন্দুদের এই ভীরুতার তকমা জুটল কেমন করে? বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি— "দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের যে শ্লাঘনীয় সমর-কীর্ত্তি ছিল, তাহাও লোপ পাইয়াছে।"[৬১] বিদেশী ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ থেকে তিনি হিন্দু-ভারতের বলবীর্যের উদাহরণ তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। গ্রীকদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রতিরোধের নানাকীর্তির উল্লেখ করে তিনি জানান, "ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহাদের নিকটে হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন তখন হিন্দুদিগের সুসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল,— রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"[৬২] হিন্দুধর্মী বীরত্বের অতীত সম্পর্কে নিঃসন্দেহ বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছেন, "এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ।"[৬৩] কারণ সেই বলবীর্যের ইতিহাস কোথাও গ্রন্থিত হয়নি। "আপনার গুণগান আপনি না গায়িলে কে গায়?"[৬৪] খেয়াল রাখা প্রয়োজন 'ভারত

কলঙ্ক’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারত অর্থে হিন্দু ভারতকেই চিহ্নিত করেছেন। প্রাচীন ভারতের শক্তি ও বীরত্ব আসলে প্রাচীন হিন্দু ভারতের শক্তি ও বীরত্বের সমার্থক তাঁর কাছে।

জামাতুল্লার কাছে পাওয়া পদ্মরাগমণি ও তার সীলমোহর নবম শতাব্দীর সময়ছাপযুক্ত একথা জানতে পারার পর সুশীলের মনে হয়েছিল, “সে এমন এক দিনের স্বপ্ন— যা প্রত্যেক ভারতবাসীর আত্মসম্মানকে জাগ্রত করে”।[৬৫] কারণ জীর্ণ ভারতবাসীর সামনে তা এমন এক বৈপরীত্যের ছবিকে তুলে ধরে যে ছবিতে পরাক্রমী হিন্দুদের দুর্জয় সাহসে গড়া সুদূর উপনিবেশ স্থাপনের গরিমা জড়িয়ে আছে। সুশীলের মনে হয়, “কোথায় সে পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে, পুরোনো জমিদার-ঘরের বিলাসপুষ্ট আয়েসী ছেলেটি সেজে— তাদেরই পূর্বপুরুষ একদিন যে অসি হাতে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল— তাদেরই স্বজাতি, স্বদেশবাসী— আর সে থাকবে দিব্যি আরামে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে, তেলে জলে দাদখানি চালের ভাত আর মাছের ঝোলে কোনরকমে পৈতৃক বাঙালী প্রাণটুকু বজায় রেখে চলবে টায় টায়!”[৬৬] অতীত কল্পনায় অস্ত্র হাতে পূর্বপুরুষের সমুদ্রপথে বিজয়াভিযানের দৃশ্যের পাশে মামলা-মোকদ্দমা-ক্লান্ত, চণ্ডীমণ্ডপসর্বস্ব, রায়বাহাদুর খেতাবের জন্য উন্মুখ তার ভবিতব্যকে সুশীলের গা-গুলিয়ে-ওঠা, নিরর্থক ও পরিত্যাজ্য লাগতে থাকে। জামাতুল্লার সাথে অভিযানের পরিকল্পনা সে শুরু করে সেই অতীতমুখীনতা থেকেই।

অর্থের সন্ধান নয়, হিন্দু-কীর্তি তথা হিন্দু-বীরত্বের সন্ধানই সুশীলকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছে সুলু সী পেরিয়ে সুদূর অজানা নগরীতে। হিন্দু বীরত্বের সূচক এখানে হয়ে উঠেছে উপনিবেশ স্থাপন। পরাধীন ভারতবাসী, পরাধীন বাঙালি, পরাধীন হিন্দু সুশীল। তার কাছে সেই ক্ষমতাশালী যে অন্যকে পরাধীন করতে পারে। চিরকেলে বিজিত নয়, হিন্দুরাও ছিল কোনোকালে বিজয়ী জাতি এই ধারণাই তার কাছে বর্তমানের ক্লেশ থেকে মুক্তির ইশারা এনে

দেয়। "মহাকালের চক্রনেমির আবর্তনে অরণ্য গ্রাস করেছে সে নগরী— তবুও ভারতের সন্তান সে, প্রাচীন যুগের সেই পুণ্যভূমির পবিত্র ধূলি স্পর্শ করে সে ধন্য হতে চায়।"[৬৭] 'বিষ্ণমুনির দ্বীপ'-এ পৌঁছানোর পর থেকে বারবার সুশীলের মনে বর্তমান হিন্দু-বাঙালি জীবন যাপনের প্রতি অস্বীকৃতি ও অতীতের হিন্দু বলবীর্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ফুটে উঠতে থাকে। তার মনে হয় নির্বিঘ্নে জমিজমার খাজনা শোধ, দুপুরের লম্বা ঘুম, বিকেলের মাছ ধরা, সন্ধ্যার তাস খেলা, রাত্রে নিশ্চিন্ত আহার সহযোগে ঘুম এই যে দুর্বল, উত্তেজনাহীন বঙ্গ জীবন, তাই তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হতো যদি ভাগ্যক্রমে গড়ের মাঠে জামাতুল্লা খালাসী 'ম্যাচিস' চাইতে না আসত। সেই 'পুনর্জন্ম' লাভ তাহলে সুশীলের ঘটত না যার পর সে তার দেশ ও ধর্মসূত্রের পূর্বপুরুষদের বলবীর্যের নিদর্শনের মুখোমুখি হয়েছে এবং আকাঙ্ক্ষা করেছে হিন্দুভারতের আরেক পুনর্জন্মের। প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশের নিদর্শনের মুখোমুখি হয়ে বিস্মিত হয় সুশীল বারবার। নাগকেশরের উপস্থিতি দেখে তার মনে হয়, "এখানে কোনো ভারতীয় উপনিবেশের অস্তিত্ব ছিল পুরাকালে।"[৬৮] প্রস্তর-বেদীর ওপর এক হাতে বরাভয়, অন্য হাতে ডমরু, আর গলায় অক্ষমালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তি সুশীল ও সনৎকে আপ্লুত করে এই ভাবনা থেকে যে, "এই দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুধর্মের বাণী বহন করে এনেছিল একদিন এদেশে।"[৬৯] সেই নির্জন দ্বীপে প্রাচীন হিন্দু সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে হিন্দু-পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে তার মনে হয়েছে, "বীর তারা, দুর্বল হাতে অসি ও বর্শা ধরে নি, ধনুকে জ্যা রোপণ করে নি— সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে— এই অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল মহাসাগর— হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিগ্বিজয় করে নটরাজ শিবের পাষাণ-দেউল তুলেছে সপ্তসমুদ্র-পারে।"[৭০] সনৎকে সে জানিয়েছে, "এসব না দেখলে ভারতবর্ষের গৌরব কিছু বুঝতাম না।"[৭১] লক্ষণীয়, ভারতবর্ষের গৌরব বলতে দুটি ধারণা ধরা পরে সুশীলের চেতনায়—

এক, হিন্দু-ভারত— যেখানে হিন্দু বলবীর্যের প্রকাশই ভারতীয় বলবীর্যের প্রকাশের চিহ্নক।

দুই, উপনিবেশ স্থাপন— যেখানে নিজের ভূখণ্ডের বাইরে গিয়ে অন্যত্র নিজেদের সাম্রাজ্য, ধর্ম তথা সংস্কৃতিকে স্থাপন করার মধ্যেই গৌরব।

প্রাচীন হিন্দু সাম্রাজ্যের গরিমা লুপ্ত হবার পরেই হীনবল হয়ে পড়েছে হিন্দুধর্ম— এমনটাই মনে করেন বিভূতিভূষণ। সেইসময় জুড়ে প্রথমে মুসলমান শাসন ও পরবর্তীতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভারতবর্ষে। হিন্দু ধর্মের পুনর্জন্মই যেখানে 'হীরামানিক জ্বলে'র স্বপ্নময় আকাঙ্ক্ষা, সেখানে তার পরবর্তীকালের ইউরোপকেন্দ্রিকতাকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হলে দুর্বল হয়ে পড়ত হিন্দু-উপনিবেশের স্মৃতিচারণ ও আকাঙ্ক্ষার প্রকল্প। অথচ এই প্রবল ইউরোপকে অস্বীকার করতে চাওয়ার ফাঁক দিয়ে ইউরোপও কী ঢুকে পড়ে না আরেকরকম করে? 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের যুদ্ধকুশলী অতীত বলতে হিন্দুদের যুদ্ধপটু ইতিহাসের উদাহরণই খুঁজে আনেন এবং মুসলমানদের হাতে পরাস্ত হবার কলঙ্কের পাশাপাশি মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও হিন্দু-বীরত্বের যেসব নজির লিপিবদ্ধ করে গেছেন তার উল্লেখ করেন, এবং সেইসঙ্গে জানিয়ে দেন হিন্দুর মঙ্গল মাত্রেই তার আকাঙ্ক্ষা। অন্য ধর্ম সম্পর্কেও তাঁর মত স্পষ্ট,

> হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব।[৭২]

পরজাতি-পীড়নে এমন উগ্র নন বিভূতিভূষণ। 'হীরামানিক জ্বলে'তেই তিনি রেখেছেন তার সাক্ষ্য। জামাতুল্লার বয়ান থেকে আমরা জানতে পারি, ম্যানিলাতে অসুস্থ নটরাজনের কাছ থেকে

সে যখন পদ্মরাগমণি ও তারওপরের সীলমোহর গ্রহণ করে তখন প্রথম দেখায় তেলেঙ্গি-হিন্দু নটরাজন তাকে বলে,

> ভারতের লোক তুমি! মুসলমান? তা কী? এতদূর বিদেশে তুমি শুধু ভারতের লোক, যে দেশের মাটিতে আমার জন্ম, সেই একই দেশের মাটিতে তোমারও জন্ম। এখানে তুমি আমার ভাই।[৭৩]

পরবর্তীতে নটরাজনের স্ত্রীকে জামাতুল্লাও মায়ের সম্মান দিয়েছে যদিও, কিন্তু নটরাজনের কথার মধ্যেও লুকিয়ে আছে, ভারতবর্ষের মাটি থেকে দূরে 'এতদূর বিদেশে' বলেই হিন্দু নটরাজন ও মুসলমান জামাতুল্লা 'এখানে' দেশসূত্রে ভাই। নয়তো কাছাকাছি পাশাপাশি থাকা হিন্দু ও মুসলমানের ছোঁয়াছুঁয়ি যে বাঁচিয়ে চলতে হবে সে ব্যাপারেও সজাগ লেখক। দ্বীপে পৌঁছেও ইয়ার হোসেনের দল এবং জামাতুল্লার রান্না আলাদা হতো, সুশীল ও সনৎ-এর রান্না হতো আলাদা করে। ভেদাভেদের সংস্কারের মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠা সুশীল, তার বড়ো হয়ে ওঠা ও জীবন যাপনের অসাড়তা নিয়ে সজাগ এবং হিন্দুধর্মের ক্রমদুর্বলতা সম্পর্কে ব্যথাতুর হলেও বিভেদমূলক সংস্কারগুলো নিয়ে চিন্তিত নয় আদৌ। সুশীলের চিন্তাস্রোতের মাধ্যমে লেখক বলেন, হিন্দুধর্মের অক্ষম উত্তরসূরিরা স্মৃতিশাস্ত্রের বুলি আউড়ে বলে গিয়েছে, "সমুদ্রে যেও না, গেলে জাতটি একেবারে যাবে, হিন্দুত্ব একেবারে লোপ পাবে, তারা ছিল গৌরবময় যুগের বীর পূর্বপুরুষদের অযোগ্য বংশধর, তাদের স্নায়ু দুর্বল, মন দুর্বল, দৃষ্টি ক্ষীণ, কল্পনা স্থবির"।[৭৪] সুশীলের মনে হয় 'তারা হিন্দু নয়— হিন্দুর কঙ্কাল'।[৭৫] হিন্দুদের যোদ্ধাহিসেবে, দখলদার হিসেবে দুর্বলতার কথাই তার মাথায় ঘোরে। পরধর্মভেদ নিয়ে সুশীলকে ভাবিত হতে দেখা যায় না।

'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে।"[৭৬] সেই নবলব্ধ শিক্ষার মধ্যে দুটি শিক্ষাকেই প্রবন্ধে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র– 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা' এবং 'জাতিপ্রতিষ্ঠা'।[৭৭] এই জাতিপ্রতিষ্ঠা বলতে যে হিন্দুজাতিরই প্রতিষ্ঠা নিয়ে উদগ্রীব বঙ্কিমচন্দ্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই জাতিপ্রতিষ্ঠায় হিন্দু ছাড়া অন্যজাতিদের যে জায়গা নেই তা যেমন স্পষ্ট করেন বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি বাধা রাখেননা সেখানে শাসক ইংরেজদের দেদার প্রভুত্বে। প্রাচীন ভারতের হিন্দু-বীরত্বের নিদর্শনের সামনে দাঁড়িয়ে সুশীলের যে বর্তমানকে নস্যাৎ করতে চাওয়া, সেখানেও আছে হিন্দু-গৌরবে গরীয়ান ভবিষ্যতেরই আকাঙ্ক্ষা। আবার প্রাচীন হিন্দুধর্মের চিহ্ন তিন মুখওলা শিবমূর্তিকে ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরের উপনিবেশে স্থাপিত থাকতে দেখে আপ্লুত সুশীলের প্রার্থনা, "হে দেব, তোমার যে ভক্তগণ তোমাকে এখানে বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা আজ নেই– তাদের অযোগ্য বংশধরকে তুমি সেই শৌর্য ও সাহস ভিক্ষা দাও, তাদের বীরপুরুষদের বংশধর করে দাও, হে রুদ্রভৈরব।"[৭৮] হিন্দু-ভারতের শক্তিময় উত্থানই প্রার্থনা করে সুশীল, যে উত্থানের মাধ্যমে ধর্ম ও সাম্রাজ্য উভয়ই ছড়িয়ে পড়বে নিজভূমি থেকে আরও দূরে। ঠিক যেভাবে ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। এশিয়া কিংবা আফ্রিকায় ইউরোপীয় শক্তি যখন গিয়ে পৌঁছেছিল, তাদের এক হাতে যেমন ছিল অস্ত্র, অন্য হাতে ছিল বাইবেল। একদিকে ছিল ধর্মীয় প্রচার, অন্যদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার, যা একে অন্যের পরিপূরক হয়েছে। সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে অনুন্নতকে উন্নত করে তোলার ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্বের কথা ঘোষণা করেছিল ইংরেজরা। লোলুপ সাম্রাজ্যবিস্তার প্রচ্ছদ পেয়েছিল ধর্মীয় পুণ্যকর্মের। ইউরোপের প্রতি প্রাথমিক অস্বীকৃতি থাকলেও ইউরোপীয় যুক্তির ধাঁচাকেই স্বীকৃতি দিয়ে ফেলেছে 'হীরামানিক জ্বলে'।

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোত পরিচালিত হয়েছিল হিন্দুরাজনীতির মাধ্যমেই। ‘হিন্দু মেলা’ ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ যেমন থেকেছে হিন্দুদের হাতেই, তেমনই হিন্দু ছাড়া অপরাপর ধর্মের মানুষ এই আন্দোলন থেকে নিজেদের বিযুক্ত অনুভব করেছে। হিন্দু মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১–১৮৬৯) মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে বোঝানোর জন্য বলেন, এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য হল বছর শেষে হিন্দুজাতিকে একত্র করা, যার মাধ্যমে মহৎ কর্ম সাধন, উৎসাহ বৃদ্ধি এবং দেশের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হবে। দেশের প্রতি অনুরাগের কথা বললেও সে দেশের ধারণায় আসলে যে কেবল হিন্দুধর্মাবলম্বীরাই আছে তা তার পরবর্তী কথা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়, “যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।”[৭৯] ‘স্বদেশানুরাগ’ যে আসলে এখানে হিন্দু-অনুরাগেরই নামান্তর তা প্রত্যক্ষতই ধরা থাকে। এই মেলায় দেশীয় শিল্পসম্ভার যেমন প্রদর্শিত হতো তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম, মল্ল যুদ্ধ, নৌকা বাইচের মতো শারীরিক শক্তি প্রদর্শনের স্থান হিসেবেও মেলাকে বিবেচনা করা হয়েছিল। চতুর্থ অধিবেশন (১৮৭০) উপলক্ষ্যে *অমৃতবাজার* পত্রিকায় পরামর্শস্বরূপ বলা হয়েছিল, “আমাদের দেশীয়গণের বুদ্ধির উৎকর্ষ অনেক হইতেছে। এ সঙ্গে শারীরিক বলবীর্য্যের, ব্যায়াম ও শস্ত্র শিক্ষা প্রভৃতির নিতান্ত অভাব এবং এই অভাবের নিমিত্ত আমাদের এত হীনতা। যদি কেহ দেশের মঙ্গল চান, তবে যাহাতে এরূপ হয় সেইরূপ একটি উদ্যোগ করুন।”[৮০] পঞ্চম অধিবেশন (১৮৭১) উপলক্ষ্যেও *অমৃতবাজার* পত্রিকায় ২ মার্চ, ১৮৭১ এ বলা হয়, “আমাদের দেশীয়েরা যেন মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ভুলেন না। শিল্পবিদ্যা উন্নতির নিমিত্ত মেলা নহে, শারীরিক বল, মাংসপেশী সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত।”[৮১] হিন্দু জাতির বলবীর্য পুনরায় ফিরিয়ে আনার এই আগ্রহ

বাঙালি হিন্দুর জাতীয়তাবাদী ধারণার সঙ্গে মিলেমিশে ছিল। সুশীলের ভাবনার মধ্যেও সেই হিন্দু-জাতীয়তাবাদের প্রভাব আমরা লক্ষ করেছি। তৎকালীন দুর্বল শরীর, ভীরু বাঙালি হিন্দুর বিপরীতে কায়িক শক্তিতে ও সাহসে বলীয়ান এক প্রবল হিন্দুজাতির নিদর্শন দেখে সুশীল মুগ্ধই শুধু নয়, আগামীতে আবার ভারতবর্ষ ওরফে হিন্দু জাতি কবে বীর্যবান হয়ে উঠে বিশ্বের দরবারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে সেই আশায় উন্মুখ।

হিন্দুধর্মমুখী হওয়া যেমন একদিকে 'হীরামানিক জ্বলে' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে তেমনি অপর জনজাতিদের সম্পর্কে একরকম নেতিবাচকতা ফুটে ওঠে উপন্যাসের অবয়বে। মুসলমান খালাসি জামাতুল্লা সুশীলের যত প্রিয় মানুষই হোক না কেন, যতোই তার আবির্ভাবের ফলে সুশীলের সামনে প্রাচীন হিন্দু সাম্রাজ্য দর্শনের সুযোগ ঘটে যাক না কেন, জামাতুল্লার অবস্থান সর্বদাই সুশীলের তুলনায় নীচে থেকে গেছে। পরিচিতির যে চিহ্নকগুলোতে সুশীল ও জামাতুল্লা আলাদা, সেই চিহ্নকগুলির হেরফেরই তাদের অবস্থানকে উঁচুতে এবং নীচুতে পাঠিয়েছে—

এক, শিক্ষা— জামাতুল্লা নিজেই বারবার সুশীলের শিক্ষিত অবস্থানটি নিয়ে বন্দনামুখর। সুশীলের মুখে সুমাত্রা ও বোর্নিওর নাম শুনে অভিভূত জামাতুল্লা বলে, "ওঃ বাবুজি, আপনি বহুৎ পড়ালিখা আদমি! এই নাম কতকাল শুনিনি, জানেন?"[৮২] জামাতুল্লার শিক্ষাহীনতা সম্পর্কে সুশীলও সচেতন সর্বদাই। মনে মনে জামাতুল্লার প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশকালীনও সুশীলের মনে হয়, "এই খালাসীটা হয়ত লেখাপড়া শেখে নি, হয়ত মার্জিত নয়— কিন্তু এ সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে এসেছে"।[৮৩]

দুই, শ্রেণি— খালাসি জামাতুল্লা, কোনক্রমে দিনযাপন করা জামাতুল্লার তুলনায়, জমিদার বাড়ির ছেলে সুশীলের শ্রেণিগত অবস্থান যে উঁচুতে হবে সে তো স্বাভাবিক। তবে লক্ষণীয়, শুরু

থেকেই তারা দুজনেই এই শ্রেণিগত উঁচু-নীচু অবস্থানটিকে অটুট রাখতে বাড়তি করে সচেষ্ট। পড়তি জমিদারির আর্থিক সঙ্কট নিয়ে চিন্তিত সুশীল নিজেও জানত, তার বাড়িতে টাকার অভাব কতোটা। তাই কলকাতায় হাত খরচের টাকা ফুরিয়ে এলেও সে বাড়িতে হাত পাততে চায় না, “বাবার কাছে সে চাইবে না— নগদ টাকার সেখানে বড় টানাটানি, সে জানে। একটা কিছু না করে এবার বাড়ী ফিরবার ইচ্ছে নেই তার”;[৮৪] কিন্তু জামাতুল্লার কাছে অভিযানের ইচ্ছা প্রকাশের সময় সে নিজেকে টাকাকড়ির প্রয়োজনমুক্ত বলেই দাবি করে— “ভগবানের আশীর্বাদে আমার ঘরে খাবার ভাবনা নেই।”[৮৫] শ্রেণিগতভাবে নীচু অবস্থানে থাকা জামাতুল্লা তাতে আপ্লুতই হয়, “আপনি রইস্ আদমি— মানুষ দেখেই চিনতে পারি। নইলে আপনাকে এত বিশ্বাস করতাম না। বড় ঘরানা আপনারা, আপনাদের নজর হবে বড়।”[৮৬] শ্রেণি অবস্থানের কারণেই উচ্চ শ্রেণির প্রতি জামাতুল্লার এই আনুগত্য অটুট থাকে উপন্যাস জুড়েই। আর অভিযানের অর্থভার যেহেতু সুশীলই বহন করে, ফলে এই শ্রেণিগত উঁচু অবস্থানে ফাটল ধরার কোনো সম্ভাবনাও থাকে না।

তিন, ধর্ম— প্রাচীন হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতি বিমুগ্ধ সুশীল যে তার ধর্মের প্রতি আস্থাশীল সে কথা বলাই বাহুল্য। জামাতুল্লার সঙ্গে রান্নার ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলা ছাড়া, ধর্মের কারণে জামাতুল্লাকে হেয় কিংবা অবজ্ঞা করতে যদিও দেখা যায় না সুশীলকে, তবু ধর্মের এক পার্থক্যের চেহারা আরেকভাবে ফুটে ওঠে উপন্যাসে। প্রাচীন হিন্দু সাম্রাজ্যের নিদর্শন ও পদ্মরাগমণি জামাতুল্লার কাছে থাকলেও তার আসল মালিক বলে সাব্যস্ত হয় নটরাজন নামের তেলেঙ্গি হিন্দু। জামাতুল্লা তার প্রাপ্তিস্বীকার অকপটে জানালেও, বারবার নটরাজনের স্ত্রীকে জামাতুল্লা ঠকিয়ে ফেলছে বলে বোঝানোর চেষ্টা করে সুশীল। যদিও নটরাজনও জানিয়েছিল, “এই ম্যাপখানা এবং ব্যাগের মধ্যে যা যা আছে— তা আমি সৎপথে থেকে হস্তগত করিনি।”[৮৭] এইসব কিছুই সে

পেয়েছিল এক মালয় ব্যক্তির থেকে, যার সাথে সে সুলু সমুদ্রে দস্যুতা করত। তবু হিন্দু সাম্রাজ্যের চিহ্ন পদ্মরাগমণির মালিকানা হিন্দু নটরাজনের ওপরেই বর্তায়, মালয় বন্ধুর পরিবারের কাছে সে তা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা না করলেও। অথচ মুসলমান জামাতুল্লার ওপর দায় বর্তায় নটরাজনের পরিবারকে তা সঁপে দেওয়ার।

শুধু জামাতুল্লাই নয়, অন্যান্য জনজাতির যে যে মানুষদের নৈকট্যে এসেছে সুশীলরা নেতিমুক্ত হয়নি তারা কেউই। ইয়ার হোসেন, যে নাকি ভারতীয় কিংবা মালয় কোনোটাই নয়, কোন দেশ থেকে এসেছে তা সুশীল জানে না, তার সম্পর্কে সুশীলের দৃষ্টিভঙ্গি, ওপর ওপর ভদ্রলোক হলেও সে দুর্দান্ত দস্যু, "মুহূর্তের মনোমালিন্যের ফলে যারা বন্ধুর বুকে অতর্কিতে কিরীচ বসিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করে না— এই সেই জাতীয় লোক।"[৮৮] ইয়ার হোসেনের মুখেও সে ধারণার পক্ষে যুক্তি মিলে যায়, "ভালমানষির দিন চলে গিয়েছে জানবেন। নিষ্ঠুর হতে হবে, নির্মম হতে হবে— তবে মানুষের অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে পারবেন।"[৮৯] ইয়ারহোসেনের দলের লোকজন সম্পর্কেও সুশীলের ভীতির মনোভাব বজায় থাকে; যাদের পরিচয় সিঙ্গাপুরে চুরি ডাকাতি রাহাজানি করা, ইয়ার হোসেনের হাতের লোক এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বী। আবার গোটা সিঙ্গাপুর সম্পর্কেই জামাতুল্লা তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, "সিঙ্গাপুর ভয়ানক জায়গা— এখানে দিন-দুপুরে মানুষের বুকে ছুরি বসায়—"।[৯০] গুপ্তধনের হদিশ না মিললে ক্ষতিকরার হুমকিও বারবার ইয়ারহোসেন দিয়ে যায় সুশীলদের। আবার চীনে সারেঙের প্রসঙ্গে এই ইয়ার হোসেনের বক্তব্যই গ্রহণ করে নেয় সুশীল, যে চীনারা মানুষ হিসেবে বিশেষ ভালো নয়। ইয়ার হোসেন, তার দলবল, গুপ্ত সম্প্রদায়, সিঙ্গাপুর সব মিলিয়ে এক রোমাঞ্চের আবহ যেমন নির্মাণ করেছেন বিভূতিভূষণ, পাশাপাশি সেই রোমাঞ্চের আবহে না-হিন্দু জনজাতিরা নেতিবাচক অবস্থানেই পৌঁছে গিয়েছে ঘটনাচক্রে। অথচ দেখা যায় ইয়ার হোসেনের গুপ্তধনের তিন ভাগের

একভাগ দাবিকে মেনে নিলেও, একই অভিযানে বেরিয়ে সুশীলরাই গুপ্তধনের হদিশ শেষ অবধি লুকিয়ে রাখে ইয়ার হোসেনের থেকে। মোট সম্পদ যখন সত্তর হাজার টাকা হয় তখন ফিরে আসার পর ইয়ার হোসেনকে তারা 'ফাঁকি না দিয়ে' পাঠায় দশ হাজার টাকা। সেটাই নাকি লেখকের মতে 'ন্যায্য প্রাপ্য'।[৯১] অঙ্কের হিসেবে যা চুক্তিমাফিক ন্যায্য নয়, তিনভাগের একভাগ নয় যা, তা ন্যায্য করে তোলা হয় ইয়ারহোসেনের প্রতি নেতির মনোভাব থেকেই। আর গণিতের নিয়মে প্রাচীন হিন্দু সাম্রাজ্যের গুপ্তধনের অধিকাংশটা থেকে যায় নটরাজনের স্ত্রী, সুশীল এবং সনতের মায়ের কাছে। হিন্দু উত্তরাধিকারীর কাছেই।

হিন্দু জাতির শারীরিক বলবীর্যের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই উপন্যাসে ওতোপ্রোতো জড়িয়ে থাকে হিন্দু-পুরুষের ধারণা। বলবীর্য এবং পুরুষত্ব একই বলে ধরে নেওয়া হয় বলেই যতবার সাহসের কথা আসে, যতবার আসে শক্তিমত্তার বয়ান, ততবারই পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ঘোষণা করতে থাকে সুশীল ও সনৎরা। প্রকৃত পুরুষ কে, এই প্রশ্নে বারবার জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় উপন্যাসের চরিত্রদের। বিদেশে যাওয়ার প্রসঙ্গে সনৎকে সুশীল বাড়ির জন্য মনখারাপ করবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সনৎ বলে, “আমি পুরুষ মানুষ না দাদা? ও কথাই ওঠে না!”[৯২] জামাতুল্লার কাছে তার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে শুনতে সুশীলের মনে হয়, “বেরিয়ে পড়তে হবে সেই লুকোনো রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে— পুরুষ যদি হও!”[৯৩] বলবান ও সাহসী হয়ে ওঠার গুণগুলি এভাবে আরোপিত হতে থাকে কেবল পুরুষেরই ওপর। সাহস নামক বৈশিষ্ট্যটি আসলে সাহসীর নয়, পুরুষের। এভাবে স্পষ্ট কতগুলি লিঙ্গভেদের মাধ্যমে পুরুষত্বের বিশেষ চেহারা তৈরি হতে থাকে উপন্যাসে। কেবল একবারই এই লিঙ্গ নির্ধারিত খাপের বিরুদ্ধাচারণ করতে দেখা যায় সুশীলকে। সুশীল ও সনৎ ফটো তোলা ও ছবি আঁকার কাজে ব্যস্ত শুনে ইয়ার হোসেন সেগুলিকে ‘মেয়েলী কাজ’ বলে তাচ্ছিল্য করলে সুশীল জানায়,

"যারা এই নগর গড়েছিল, পুতুল তৈরি করেছিল, পাথরে ছবি এঁকেছিল– তারা পুরুষ মানুষ ছিল জামাতুল্লা। ইয়ার হোসেনের চেয়ে অনেক বড় পুরুষ ছিল– বলে দিও তাকে।"[৯৪] বিপদে অগ্রসর হওয়া, সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া– এগুলি সবই আসলে পুরুষেরই বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেও সৃষ্টি নয়, ধ্বংসই যে পৌরুষের লক্ষণ এই ধারণার বিপরীতে স্বর তোলার চেষ্টা করেছেন বিভূতিভূষণ। ধ্বংসপ্রবণ পৌরুষকেই কেন গৌরবান্বিত করা হয়েছে বরাবর সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে সিমোন দ্য বোভেয়ারের (১৯২৯–১৯৮০) *দ্বিতীয় লিঙ্গ* (*The Second Sex*) গ্রন্থের (১৯৪৯) দিকে। বোভেয়ার বলার চেষ্টা করেছেন, আদিম যাযাবর জীবনে যেহেতু জমি কিংবা সম্পত্তির স্থায়িত্ব ছিল না ফলে উত্তরাধিকারীর জন্য সংরক্ষণের প্রশ্নটিও আসত না। তাই সন্তান তখন কোনো মূল্যবান সম্পদ ছিল না। ফলে জন্মদানকারী নারীরও ছিল না সৃষ্টির গৌরব। জন্মদান তার কাছে কেবলই এক জৈবিক নিয়তি। বরং মাতৃত্বের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে গৃহকর্মের পরিশ্রম নারীর ওপরেই ন্যস্ত হওয়ায় তার গণ্ডি সীমাবদ্ধ হয়েছে। অন্যদিকে পুরুষের কাজ হয় বাইরের জগতের ঝুঁকির মধ্যে। বোভেয়ার বলেন, "আদিম মানুষের কর্মের অন্য একটি মাত্রা ছিল, যা তাকে দিয়েছে পরম গৌরব। অধিকাংশ সময় এটা ছিল বিপজ্জনক।"[৯৫] শিকারি বন্য জন্তুর সঙ্গে লড়াই করায় জীবনের ঝুঁকি নিত। যোদ্ধা জীবন বাজি রেখে নিজের গোষ্ঠীর মর্যাদা বৃদ্ধি করত। কিন্তু নারী যুদ্ধ কিংবা তার সমতুল্য কাজ থেকে পরিত্যক্ত হয়েছিল। বোভেয়ারের মতে, "জীবন সৃষ্টি করে নয়, জীবন বিপন্ন করেই পুরুষ উন্নীত হয় পশুর ঊর্ধ্বে। এই কারণেই মানব প্রজাতিতে সেই লিঙ্গকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, যে জন্ম দেয় না হত্যা করে।"[৯৬] উপনিবেশ স্থাপন, যুদ্ধ জয়ের মতো কাজগুলি পৌরুষ-চিহ্ন নিয়ে গৌরবান্বিত হয়ে ওঠার এই দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়ার ফল আমরা সুশীল-সনৎ-ইয়ার হোসেনদের বক্তব্যেও দেখতে পাচ্ছি। তবু তথাকথিত 'অপৌরুষেয়'

কাজকেও বিভূতিভূষণ পুরুষত্বের গৌরব বলে দেখাতে চেয়েছেন। খাপ ভাঙার চেষ্টা করেছেন কিছুটা।

সুশীল কিংবা 'চাঁদের পাহাড়'-এর শঙ্কর কেউই যদিও নিছক অর্থের প্রয়োজনে ছুটে যায়নি অ্যাডভেঞ্চারে, তবু প্রতি ক্ষেত্রেই তাদের তাড়িত করেছে ধনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। এবং প্রতি ক্ষেত্রেই বিভূতিভূষণ সতর্ক করে দিয়েছেন প্রকৃতিই গোপনে পাহারা দিয়ে চলেছে তার ধনভাণ্ডার। 'চাঁদের পাহাড়'-এ বুনিপ যেমন সেই হীরের খনির রহস্যময় প্রহরী, 'হীরামানিক জ্বলে'তেও ধনভাণ্ডারের আসল পাহারাদার স্বয়ং ভারত মহাসাগর। বাস্তবের দুনিয়া আর গুপ্তধনের দুনিয়ার মধ্যে এই বিভাজিকা কেন বজায় রাখেন লেখক তার উত্তর যেন 'হীরামানিক জ্বলে'তেই দিয়ে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ—

> বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বেলা দশটা থেকে বিকেল ছ-টা এস্তেক কলম পিষে সাঁইত্রিশ টাকা ন-আনা রোজগার করতে হয় সারা মাসে। সেই হল রূঢ় বাস্তব পৃথিবী— মানুষকে ঘা দিয়ে শক্ত করে দেয়। আর এখানে কী, না— হাতের আঁজলা ভরে যত ইচ্ছে সোনা নিয়ে যাও, হীরে নিয়ে যাও— এ আলাদা জগৎ— পৃথিবীর অর্থনৈতিক আইন-কানুনের বাইরে।[৯৭]

এই দুই জগৎ মিলেমিশে গেলে চলতে পারবে না দুনিয়ার তাবৎ অঙ্ক। যাবতীয় নিয়ম কানুন। তাই লেখকের সতর্কবার্তা—

> এ দিন বাতিল হয়ে গিয়েছে, এ সমাজ বাতিল হয়ে গিয়েছে— একে অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে দিনের আলোয় তুলে বিংশ শতাব্দীর জগতে আর অর্থনৈতিক বিভ্রাট ঘটিও না।[৯৮]

মহাসমুদ্র সে বিভ্রাট ঘটাতে দেয় না ‘হীরামানিক জ্বলে’তে। প্রকৃতি বজায় রাখে ভারসাম্য। গুপ্তধনের সন্ধান শেষে বিভূতিভূষণের নায়করা, শঙ্কর হোক কিংবা সুশীল অর্থ পায় সামান্যই। অভিজ্ঞতা অর্জন করে অনেকখানি। স্থানিক সরণ, বিপদের ঝুঁকি এবং অজানা অভিজ্ঞতা লাভ — অভিযানের মূল শর্তগুলি পালন করতে করতে এগোয় বিভূতিভূষণের অভিযাত্রীরা।

মরণের ডঙ্কা বাজে:

'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসটি *মৌচাক* পত্রিকায় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ থেকে ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫ জানুয়ারি ১৯৪০ সালে। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০–১৯৯৯) জানিয়েছেন,

> এই গ্রন্থে চীনের প্রতি তদানীন্তন জাপানের যে আগ্রাসী আক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে চীনের ওপর ভারতীয় জনচিত্তের পূর্ণ সহানুভূতি। এদেশ থেকে একটি মেডিকেল মিশনও গিয়েছিলো চীনে। ডাঃ কোর্টনিস ছিলেন সেই মিশনের অধিনায়ক। তাঁর জীবন নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, কিন্তু তার আগেই বাংলাসাহিত্যে লেখক তাঁর ‘বিমল’কে উপস্থাপিত করেছেন।[৯৯]

বিমল ও সুরেশ্বরের চীন-অভিযান ও নতুন অভিজ্ঞতা লাভেরই কাহিনি ‘মরণের ডঙ্কা বাজে’।

‘চাঁদের পাহাড়’-এর শঙ্কর কিংবা ‘হীরামানিক জ্বলে’র সুশীল যেমন অর্থের প্রয়োজনে নয়, অজানা জীবন ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার খোঁজেই বেরিয়ে পড়েছিল অভিযানে, ‘মরণের ডঙ্কা বাজে’ উপন্যাসের সুরেশ্বর কিংবা বিমল সম্পর্কে কিন্তু সে কথা খাটে না। চীন-জাপান দ্বিতীয় যুদ্ধের (১৯৩৭) প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসটির প্রধান দুই চরিত্রই সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল অর্থের প্রয়োজনে। সুরেশ্বর ওষুধের ক্যানভাসার হিসেবে, এবং বিমল ডাক্তার

হিসেবে। বি.এসসি. পাস করা সুরেশ্বরের আর্থিক অনটনের কথা বলতে গিয়ে লেখক জানান, "তার বাবা সম্প্রতি পেনসেন নিয়ে বাড়ী এসে বসেছেন, খুব সামান্যই পেনসন— সে আয়ে সংসার চালানো কায়ক্লেশে হয়; কিন্তু তাও পাড়াগাঁয়ে। শহরে সে আয়ে চলে না।"[১০১] অথচ সুরেশ্বরের গ্রাম তখন ভগ্নপ্রায়, জরাজীর্ণ—

> বেজায় ম্যালেরিয়ায় দেশটা উচ্ছন্ন গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে অত্যন্ত বনজঙ্গল, পোড়ো বাড়ীর ইঁট স্তূপাকার হয়ে পথে যাতায়াত বন্ধ করেচে, সন্ধ্যার পর সুরেশের পাড়ায় আলো জ্বলে না।[১০১]

নিরাশার আলোহীনতায় ডুবে থাকা, অর্থনৈতিকভাবে ভগ্নপ্রায় গ্রাম থেকে সুরেশ্বরকে বাধ্যতই উঠে আসতে হয় শহরে। টিউশনি অবলম্বন করে বাঁচার চেষ্টা করতে করতে, চাকরির সন্ধান পায় সুদূর সিঙ্গাপুরে। তাই বাধ্যতই তাকে বিদেশে যেতে হয়। প্রথম চাকরি ও প্রথম বিদেশ যাওয়ার জন্য একাধারে আনন্দ ও বিষাদ মেশানো অনুভূতিই সঙ্গ নেয় তার। নিছকই বাধ্য হয়েই যে সুরেশ্বরের বিদেশযাত্রা, সেকথা স্পষ্ট করে দেন লেখক— "একদল মানুষ আছে, যারা অজানা দূর বিদেশে নতুন নতুন বিপদের সামনে পড়বার সুযোগ পেলে নেচে ওঠে— সুরেশ্বর ঠিক সে দলের নয়। সে নিতান্তই ঘরকুণো ও নিরীহ ধরণের মানুষ—"।[১০২] বিমলের সিঙ্গাপুর গমনের উদ্দেশ্যও আলাদা কিছু নয়। সুরেশ্বরের তুলনায় আর্থিক অবস্থা ভালো হলেও বিমলও ডাক্তারি করে জীবিকা নির্বাহ করার জন্যই যাচ্ছে সিঙ্গাপুরে— "তারপর বিমল সেখানে একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে গেটের গায়ে নাম-খোদাই পেতলের পাত বসিয়ে শান্ত ও সুবোধ বালকের মত ডাক্তারী আরম্ভ করে দেবে— এই ছিল তার মতলব।"[১০৩] ঘটনাচক্রে তাদের অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়তে হয়, প্রাক-প্রস্তুতি না রেখেই। "তারা জানতো না যে নিরুপদ্রব, শান্তভাবে ডাক্তারী ও ওষুধের ক্যানভাসারি করতে তারা যাচ্ছে না— তাদের অদৃষ্ট তাদের

দুজনকে একসঙ্গে গেঁথে নিয়ে চলেছে এক বিপদসঙ্কুল পথযাত্রায় এবং তাদের দুজনের জীবনের এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার দিকে।"[১০৪] এই ধরনের ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়া অ্যাডভেঞ্চারকে Doyne Farmaer 'accident'-এর মাধ্যমে ঘটা অ্যাডভেঞ্চার বলে চিহ্নিত করেছিলেন তার 'The evolution of adventure in literature and life' প্রবন্ধে। এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "Being at the wrong place at the wrong time'.[১০৫] নিশ্চিন্ত ক্যানভাসার কিংবা ডাক্তারের জীবন কাটানোই যাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদের ঘটনাচক্রে পৌঁছে যেতে হল যুদ্ধগ্রস্ত চীনে। তাদের এই বিপদের মধ্যে পৌঁছানোকে নিয়তি নির্দিষ্ট করতেই পিনাং বন্দরে চীনা দেবতার মূর্ত্তি দর্শনের অভিজ্ঞতাটিকে উল্লেখ করেছেন লেখক। মূর্ত্তিটি দেখে সুরেশ্বরের মনে হয়েছে, "কোন চীনা দেবতার মূর্ত্তি, ভ্রূকুটি-কুটিল, কঠিন, রুক্ষ মুখ। হাতে অস্ত্র, দাঁড়াবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত আক্রোশপূর্ণ। সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্বংস করতে উদ্যত।"[১০৬] সেই রাতে অন্যমনস্ক ও গম্ভীর হয়ে থাকা সুরেশ্বরকে বলতে দেখা যায়, "আমার মনে হচ্ছে কি জানো বিমল? আমরা যেন এই দেবতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছি। সব সময় সব জায়গায় যেতে নেই। আমরা সন্ধ্যাবেলা ঐ চীনে মন্দিরে গিয়ে ভাল কাজ করিনি।"[১০৭] উৎকণ্ঠার আবহ নির্মাণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়তি-নির্দিষ্ট, অনিচ্ছায় জড়িয়ে পড়া বিপদের দিকেও লেখক ইঙ্গিত দিয়ে রাখেন।

অপরিচিত আ-চিন যখন গোপনে সুরেশ্বর ও বিমলকে সিঙ্গাপুরে বোটানিকাল গার্ডেনে দেখা করতে অনুরোধ জানায়, তখন কৌতূহলী হলেও বেপরোয়া কিংবা সাহসী কোনোটাই হবার ইচ্ছা তাদের ছিল না। অবশেষে 'বোটানিক্যাল গার্ডেন তো আর নির্জন মরুভূমি নয়, সেখানে কত লোক বেড়ায় নিশ্চয়ই'[১০৮] এই যুক্তিতে তারা গিয়ে পৌঁছায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সেখানে অবশ্য বিপন্ন চীনদেশের হয়ে আ-চিনের ভারতের সাহায্য চাওয়া এবং বুদ্ধের দেশের লোক

হিসেবে তাদের মন্ত্রশিষ্যদের দেশ চীনে সহায়তার আমন্ত্রণ জাননো সুরেশ্বর ও বিমলকে উৎসাহিত করে নিজেদের নিরুপদ্রব পরিকল্পনাকে সরিয়ে রেখে রক্তক্লান্ত চীনে বিপদের মধ্যে ছুটে যেতে। এই সময়েই সুরেশ্বরকে বলতে দেখা যায়, "চল যাই। এখন আমাদের বয়স কম, দেশবিদেশে যাবার তো এই সময়। একটা বড় যুদ্ধের সময় মেডিক্যাল ইউনিটে থাকলে ডাক্তার হিসাবে তোমারও অনেক জ্ঞান হবে। চীনদেশটাও দেখা হয়ে যাবে পরের পয়সায়।"[১০৯] কিছুটা বেড়ানোর আগ্রহ এবং কিছুটা চিকিৎসাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষাতেই তারা চীনে যেতে আগ্রহী হয়। এভাবে বিপদের মধ্যে ঢুকে পড়ায় যার ফলে মাঝে মাঝে আক্ষেপ করতেও দেখা গেছে তাদের।

চীন দেশে পৌঁছানোর পর তাদের এই মানসিকতার বদল ঘটে। চীনের মধ্যে তারা ভারতবর্ষের মতোই দুর্ভাগ্য-পীড়িত দেশকে শনাক্ত করে ব্যথিত হয়। প্রথম দেখাতেই ভৌগোলিকভাবেও চীন ও ভারতের মিল চোখে পড়ে তাদের— "এই চীন দেশ! যদি ঢেউ-খেলানো ছাদ-আঁটা চীনা বাড়ী না থাকতো, তবে চীন দেশের প্রথম দৃশ্যটা বাংলা দেশের সাধারণ দৃশ্য থেকে পৃথক করে নেওয়া হঠাৎ যেতো না।"[১১০] চীনা গ্রামে গিয়েও বিমলের মনে হয়েছে "এ ঠিক যেন বৈদ্যবাটীর চড়ার চাষী-কৈবর্ত্তদের গাঁ-খানা।"[১১১] তবে চীনের সঙ্গে তারা প্রকৃতই একাত্মতা বোধ করে চীনের দারিদ্র্যকে উপলব্ধি করে— "হতভাগ্য মহা চীন, হতভাগ্য ভারতবর্ষ! দুজনেই দরিদ্র, কেউ খেতে পায় না,— গুরু শিষ্য দুজনের অবস্থাই সমান।"[১১২] বিমল মনে মনে স্থির করে এক হতভাগ্য দেশের প্রতিনিধি হিসেবে আরেক হতভাগ্য দেশের জন্য সে যথাসাধ্য সাহায্য করবে, মৃত্যুপণ করেও। কারণ তার মনে হয়, "মানুষ যখন দুঃখকষ্ট পায়, সবদেশে সর্ব্বকালে তারা এক। চীন, ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আবিসিনিয়া, স্পেন, মেক্সিকো, এদের মধ্যে দেশের সীমা এখানে মুছে গিয়েছে।"[১১৩] এই আন্তর্জাতিকতার মনোভাব বিভূতিভূষণের অন্যান্য

উপন্যাসে এমনকি বাংলা অভিযান সাহিত্যেও কমই দেখা যায়। ভারতবর্ষের পরাধীনতা ও দারিদ্র্য সম্পর্কে সজাগ উপন্যাসের নায়করা। সুরেশ্বরের চেয়ে বিমলই যদিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে উপন্যাসে, তারই অভিজ্ঞতা ও ভাবনার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় বেশি, তবে কোন ক্ষেত্রেই সুরেশ্বরের সঙ্গে তার ভাবনার সংঘাত বাধে না। ফলে আমরা ধরে নিতে পারি, চীনের দুরবস্থা, যুদ্ধবিধ্বস্ত বীভৎসতা দেখে চীনের প্রতি মমত্ব বোধ করেছে দুজনেই। চীনের মানুষজন সম্পর্কেও তারা আন্তরিক হয়ে ওঠে— "বিমলের ভারী ভাল লাগল এই চীনেপাড়ায় জীবনস্রোত। এক জায়গায় একটা বুড়ী বসে ভিক্ষে করচে— টাকা-পয়সার বদলে সে পেয়েছে ভাত তরকারী, ওর মুখে এমন একটি উদার ভালোবাসার ভাব, চোখে সন্তোষ ও তৃপ্তির দৃষ্টি, বোধ হয় আশাতীত ভাত তরকারী পেয়েছে বলে এত খুশী হয়ে উঠেছে মনে মনে। প্রাচ্য-ভূখণ্ডের দারিদ্র্য ও সহজ সরল সন্তোষের ছবি যেন এই বৃদ্ধা ভিখারিণীর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করছে।"[১১৪] জাপান বোমা ফেলে যাওয়ার পর সেই ভিখারিণীকেই মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তারা এই ধ্বংসের নির্মমতাকে অন্তরে উপলব্ধি করে। প্রোফেসর লি তাদের জানায় "আপনারা বিদেশি। আমাদের দেশকে সাহায্য করতে এসেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের এখনও কিছুই দেখেননি, দেখলে দয়া হবে। এত গরীব দেশ আর এমন হতভাগ্য—"[১১৫] বারবার হতভাগ্য চীন এবং ভারতবর্ষকে পাশাপাশি রাখতে চেয়েই লেখক অ্যালিসের মুখ দিয়ে বলান, "আর একটা দেশ আছে প্রোফেসর লি। ভারতবর্ষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় পড়ে আছে। ছেলেবেলা থেকে দুস্থ ভারতবর্ষের কথা শুনলে কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়।"[১১৬]

ভারতবর্ষের প্রতিনিধি সুরেশ্বর ও বিমল চীনের দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে আবিষ্কার করেছিল আরেক ভারতবর্ষকেই। পরাধীন ভারতবর্ষেরই অনুকৃতি হয়ে উঠেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনদেশ। দুইদেশের ওপর থাবা বসানো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদুটি আলাদা হলেও সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক পীড়ন ও

নিষ্ঠুরতার চিহ্নগুলি দুই দেশের ওপরেই ছাপ ফেলেছে। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের *জাপানে পারস্যে*। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "দেখলুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে এক দিকে নিরাপদ হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেছে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজম্, সে নিজের চারি দিকে মথিত করে তুলছে বিদ্বেষ।"[১১৭] প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে জাপান তার বলবীর্যের গরিমায় যে হিংস্রতা নিয়ে চলেছে তার সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ— "কী করে মিলতে হয় জাপান তা শিখল না, কী করে মারতে হয় য়ুরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতেই সে হাত পাকিয়ে নিলে। এই মার মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একদিন এসে ছোবল মারবে তারই বুকে।"[১১৮] ইউরোপ ও জাপানকে সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষায় গুরু ও শিষ্য বলে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর ইউরোপ ও জাপানের হাতে যথাক্রমে লাঞ্ছিত দুই দেশ, যন্ত্রণায় কাতর দুই দেশ ভারত ও চীনকে বিভূতিভূষণ গুরু ও শিষ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। কেবলমাত্র গৌতমবুদ্ধের জন্মসূত্রেই ভারতবর্ষ এই গুরুর পদে আসীন হয়নি। যন্ত্রণা ও দুঃখভোগের মাধ্যমেই এখানে তৈরি হয়েছে নৈকট্য। "গুরু শিষ্য দুজনের অবস্থাই সমান।"[১১৯] সে কারণেই জেনারেল চু-টে (১৮৮৬–১৯৭৬) মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনে কিংবা জহরলাল নেহেরুর কাছে তিনি সাহায্যের আবেদন জানাতে চান শুনে আপ্লুত হয়ে ওঠে সুরেশ্বর ও বিমল। এই আবেদনের প্রসঙ্গ বিভূতিভূষণের মনগড়া নয়। পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে চীনকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা সম্ভব না হলেও, জহরলাল নেহেরু অন্য পন্থা অবলম্বন করেন। ডাক্তার মদন মোহন লাল অটলের (১৮৮–১৯৫৮) নেতৃত্বে তিনি চীনে একটি ডাক্তারি দল পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ৩০ জুন, ১৯৩৮ সাহায্যের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানানো হয় ও ৯ জুলাইয়ের মধ্যে বাইশ হাজার টাকা অর্থ সংগৃহীত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ওষুধপত্র ও যন্ত্রপাতি সাহায্যের জন্য আসতে থাকে।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য একটি কমিটি নির্বাচিত হয়। কমিটি দ্বারা নির্বাচিত পাঁচজন ডাক্তার মদন মোহন লাল অটলের নেতৃত্বে চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে তারা প্রথমে হ্যাংকাও ও তারপরে ইউনানে যান। ইউনানে তারা তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা মাও সে তুং (১৮৯৩–১৯৭৬) দ্বারা আপ্যায়িত হন। চার বছর এই ডাক্তারি দল সেখানে যুদ্ধে আহত মানুষদের শুশ্রূষা করে। তারপর বাকিরা ফিরে এলেও দ্বারকানাথ সান্তারাম কোটনিস (১৯১০—১৯৪২) ১৯৪২ সালে চীনেই দেহত্যাগ করেন। চীনে এখনও তার নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতবর্ষ থেকে চীনে দুজন কলকাতাবাসী সহ পাঁচজনের এই ডাক্তারি দল পাঠানো সেইসময় সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল যথেষ্টই বিশেষত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ১৯৩৮ সালের সাত, আট ও নয় জুলাইকে চীনের জন্য অর্থসংগ্রহ দিবস হিসেবে ঘোষণা করায়, বিষয়টি চর্চিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যেও।[১২০] বিভূতিভূষণ যখন ‘মরণের ডঙ্কা বাজে’ লিখছেন, তার অল্প কিছুকাল আগেই ডাক্তারি দল চীনে গিয়েছে। সাহসী সেই ডাক্তার দলের অ্যাডভেঞ্চার, যা আসলে বিপন্ন মানুষের শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়েছিল, তাই এখানে কাহিনির রূপ পেয়েছে। তাই উপন্যাসে চীনের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাশা করতে দেখা গেলেও চীনের সেনাদল থেকে সাধারণ মানুষ তথা অসহায় শিশু প্রত্যেকের প্রতিই দরদ দেখা যায় বিমল-সুরেশ্বরদের।

এই দরদের বিপরীতে দেখা যায় যুদ্ধের হিংস্রতা এবং যুদ্ধধ্বস্ত মানুষের অসহায়তার বিবরণ। সাংহাই শহরে জাপানি যুদ্ধ জাহাজ থেকে বোমা বর্ষণের বীভৎসতা বর্ণনা করতে করতে লেখক বলেছেন, “পাশব বলের কাছে মানুষের কি শোচনীয় পরাজয়”।[১২১] যুদ্ধের পরিত্রাণহীন ভয়াবহতার বাস্তব রূপ ধরা পড়ে যখন সুরেশ্বর বিমলরা গাড়ির ড্রাইভারের মুখে শোনে, “কনসেশন বা রেডক্রশ কিছুই মানছে না। জাপানি বোমারু প্লেন কালও আমাদের রেডক্রশ

ভ্যানে বোমা ফেলেছে—"।[১২২] সাম্রাজ্যপ্রসার ও বীরত্বের যে নিদর্শন দেখে আপ্লুত হয়েছিল 'হীরামানিক জ্বলে'-এর সুশীল, আধুনিক কালের যুদ্ধ যে সেই বীরত্বের গরিমাকে কোথাও ধারণ করে না, তা স্পষ্টতই বোঝাতে চেয়েছেন লেখক 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসে। যেন বলবীর্য সংক্রান্ত মুগ্ধতাকে নিজেই চেয়েছেন নস্যাৎ করতে। বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হওয়া গর্তে কাদাজল মেখে শুয়ে মেশিনগানের গুলি থেকে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করছে যখন বিমলরা, লেখক জানিয়ে দিচ্ছেন সেই সময়ে—

> কোনো মুহূর্ত্তে মেশিনগানের গুলি ওর জীবলীলা, ওর সমস্ত চৈতন্যের অবসান করে দিতে পারে, সারা দুনিয়া ওর কাছে মুছে যেতে পারে এক মুহূর্ত্তে— যে কোনো মুহূর্ত্তে। কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে, চোখ বুজে ও পড়ে রইল — ওর পাশে সবাই সেই ভাবেই আছে— বীরত্ব দেখাবার অবকাশ নেই, বাহুবল বা সাহস দেখাবার অবসর নেই— খোঁয়াড়ের শুয়োরের দলের মতো ভয়ে কাদার মধ্যে ঘাড় গুঁজে থাকা— এর নাম বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ![১২৩]

আধুনিক যুদ্ধে ঘাতক আর আঘাতপ্রাপ্ত মুখোমুখি হয় না। দূর থেকে ছুটে আসা গুলি কিংবা বোমা একে অন্যের প্রাণ কেড়ে নেয়। আকাশ থেকে ঝরে পড়া আগুনে বোমার কাছে কে সৈনিক আর কে শিশু তার কোনো ভেদ নেই। পরিকল্পনা মাফিক এক বিপুল গণহত্যার আয়োজনকে তিল তিল করে বর্ণনা করেছেন লেখক গোটা উপন্যাস। এক জায়গায় লেখক বলছেন,

> তারপর যে দৃশ্যের সূচনা হোল তা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অমানুষিক। বিমলের চোখের সামনে বর্ব্বর জাপানি সৈন্যরা নিরীহ গ্রামবাসীদের টেনে টেনে ঘর থেকে বার করতে লাগলো, এবং বিনা দোষে

বেওনেটের কিংবা বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে তার মধ্যে সাত-আটজনকে একদম মেরে ফেললে। ছুতো এই যে, তারা নাকি বাধা দিয়েছিল।[১২৪]

যুদ্ধের কারণে দেশের ভেতরের বিশৃঙ্খলা, সাধারণ মানুষ, গ্রামীণ কৃষক, অসহায় চীনা শিশুদের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মরা কিংবা আগুনে পুড়ে মরার দৃশ্যের সামনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে লেখক যেন বোঝাতে চেয়েছেন কেন যুদ্ধ আসলে অপরাধ, কেন বাতিলযোগ্য। যুদ্ধের মারণাস্ত্র নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দেখা যায় উপন্যাসেই, যখন মার্কিন পুলিশম্যান বলে, তাদের মার্কিন নৌবহরের উড়োজাহাজে আজকাল আরও ভালো বোমা তৈরী হচ্ছে– তখন এই তথাকথিত আরও ভালো বোমার পরিণতি কী হতে পারে তা ভেবে পাঠককে বিচলিত হতে হয়। পাশাপাশি লেখক তরুণ পাঠকদের বুঝিয়ে দেন ধ্বংস করার ক্ষমতার মাপকাঠিই কিভাবে হয়ে উঠছে প্রযুক্তির উন্নতির মাপকাঠি, সভ্যতার মাপকাঠি। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৯০) তার *যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র* (১৯৪০) গ্রন্থে জানিয়েছিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিমানহানার প্রকোপ বেশি থাকায় সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণ বিপন্ন হয়েছিল বেশি। কারণ, স্থল ও জলপথে শত্রুপক্ষকে বাঁধা ধরা পথে এসে আক্রমণ করতে হয়, সেক্ষেত্রে শত্রুর গতিবিধি অনেকাংশে জানা সম্ভব; কিন্তু আকাশপথে শত্রুর গতিবিধির ওপর নজরদারি করা শক্ত। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন, বিমানযুদ্ধে প্রধানত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে শিল্পকেন্দ্র, বন্দর ও নগরগুলোকে। বিপক্ষকে পরাজিত করতে হলে তার রসদের সংস্থান যেহেতু বন্ধ করা প্রয়োজন, তাই শ্রমিকরা যাতে কারখানায়, রেলওয়ে এলাকায়, বন্দরে কিংবা বাজারে কাজ না করতে পারে, তাই এইসব অঞ্চলেই বিমান থেকে গোলাবর্ষণ করে শত্রুরা। এছাড়া বিদ্যুৎসরবরাহ বন্ধ করার জন্য বিদ্যুতের কারখানাগুলো, তেলের গুদাম, জলসরবরাহ ব্যবস্থাও বিমান আক্রমণের অন্যতম

লক্ষ্যবস্তু হয়, জানাবেন দিগিন্দ্রচন্দ্র।[১২৫] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাকলগ্নে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। বিমান আক্রমণের ভয়াবহ দাপটে চীন বিধ্বস্ত হচ্ছিল কীভাবে তার বর্ণনা লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন বিস্তারিত বিবরণে। এমনকি বিমান থেকে শহরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার জন্য ছোঁড়া আগুনে-বোমারও বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। অ্যালুমিনিয়াম আর ইলেক্ট্রনের খোলের ভেতর অ্যালুমিনিয়াম পাউডার আর আয়রন অক্সাইড দিয়ে কীভাবে সেই বোমা বানানো হয় তাও জানিয়েছেন। আর বিমলের মনে হয়েছে, "এই টিউবের মধ্যে সুপ্ত অগ্নিদেব এখুনি জেগে উঠে এই এত বড় সাংহাই শহরটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে, তারই আয়োজন চলছে।"[১২৬] দিগিন্দ্রচন্দ্র জানাচ্ছেন, বিমান আক্রমণে কেবল ঘরবাড়িই নয়; আগুনে বোমার বর্ষণে এক একটা বিরাট শহরেও দাবানল লেগে যায়। তিনি জানাচ্ছেন, এই আগুনে বোমাগুলি প্রতিপক্ষ এসে শহরের ওপর অজস্র ফেলে যেত। "বোমাগুলি এতই মারাত্মক যে লোহা এবং ইঁট পাথরে পর্য্যন্ত উহা আগুন ধরাইয়া দেয়। সাধারণতঃ যে-সকল বাড়ী আগুনে পোড়ে না বলিয়া বলা হয়, ঐ বোমা পড়িলে সেইগুলিতে পর্য্যন্ত আগুন ধরে। দমকলের সাধ্য নাই উহা নিভাইতে পারে।"[১২৭] 'মরণের ডঙ্কা বাজে'তে বিমলদেরও অভিজ্ঞতা ছিল, "এ আগুন নিবানো যায় না।"[১২৮] যুদ্ধের বীভৎসতার কোনো কাল্পনিক ছবি আঁকেননি বিভূতিভূষণ। বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন।

যুদ্ধের এই বীভৎসতার বিপরীতেই লেখক স্থাপন করতে চেয়েছেন সুরেশ্বর, বিমল, অ্যালিস, মিনি, প্রফেসর লি দের। ধ্বংসোন্মত্ত চীনের প্রাঙ্গণে যারা মানুষের সেবায় নিয়োজিত। অ্যালিস ও মিনি সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছে চীনের এই সংকটের দিনে নার্স হিসেবে সেখানকার মানুষদের সেবা করতে। প্রফেসর লী যুদ্ধের সময়ের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করতে এসে যুদ্ধপীড়িত মানুষদের সেবায় তৎপর হয়ে পড়েছেন তার ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে। এই আলাদা আলাদা দেশ

থেকে আসা মানুষগুলির পরস্পরের প্রতি সম্মান ও আন্তরিকতা এবং অসহায় মানুষদের অক্লান্ত সেবা করে যাওয়া যেন এই বীভৎসতার মধ্যেও মানবিকতার আলো জ্বেলে রাখে। চৈনিক প্রফেসর লী এবং আমেরিকান নার্স অ্যালিসের সম্পর্ক হয়ে যায় পিতা ও কন্যার মতো। একদিকে দেশের সীমানা তথা বাজার বৃদ্ধির জন্য চলে যুদ্ধের মারণযোগ্য অন্যদিকে কিছু মানুষের ভালোবাসাবাসি ও বন্ধুত্বে মুছে যায় দেশের সীমারেখা— এই দৃষ্টিভঙ্গিই যেন প্রতিফলিত 'মরণের ডঙ্কা বাজে'তে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিই আরও প্রসারিত হয় যখন জাপানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার পর বিমল ডাক্তার হিসেবে সেই আক্রমণকারী জাপানি সৈন্যদের মধ্যে যারা আহত তাদেরও শুশ্রূষা করে। বিমলের মনোভাবকেই যেন প্রকাশ করেন লেখক, "সব মানুষের দুঃখই সমান। দুঃখপীড়িত মানুষের জাত নেই— তারা চীনা নয়, জাপানিও নয়।"[১২৯]

সাধারণত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে ব্যক্তির বিপদসীমা অতিক্রম করে ঝুঁকিপূর্ণ পথে এগিয়ে যাওয়ার বর্ণনা থাকলেও 'মরণের ডঙ্কা বাজে'তে একটি বিপদগ্রস্ত জাতির অজস্র মানুষের মৃত্যুর বীভৎসতার মধ্যে বেঁচে থাকার কাহিনি বলা হয়েছে। নতুন অভিজ্ঞতা লাভের কাহিনি বললেও সে অভিজ্ঞতা নিছকই ব্যক্তিগত হয়ে থাকেনি। এদিক দিয়ে অন্যান্য অভিযান কাহিনির তুলনায় 'মরণের ডঙ্কা বাজে'-এর অবস্থান কিছু আলাদা। তেমনই বিভূতিভূষণ 'মরণের ডঙ্কা বাজে'তে চিহ্ন রেখেছেন পুরুষ ও নারীর প্রেমের, সচরাচর বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য তথা অভিযান কাহিনিতে যা দেখতে পাওয়া যায় না। যতোই অভিযান কাহিনিতে থাকুক বিপদ ও ভয়ংকরতার অনুপুঙ্খ বর্ণনা, যতোই থাকুক হিংস্রতা ও হত্যার রমরমা, নারী-পুরুষের প্রেম বিষয়ে কিশোর মন যেন কৌতূহলী হয়ে না ওঠে সেদিকে সর্বদাই সজাগ থাকেন লেখক। অভিযান কাহিনিতে বিরল নারী চরিত্ররা যদিও বা উপস্থিত থাকে কোথাও সেখানে প্রেমের

কোনো লক্ষণ প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। এমনকি বিদেশি উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত বাংলা অভিযান কাহিনিগুলিতেও সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয় প্রেমের সামান্যতম আভাস। এখানে কিন্তু যুদ্ধের রণরক্ত সফলতার মধ্যে বিমল ও এ্যালিসের প্রেমের ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন বিভূতিভূষণ। অ্যালিসের প্রতি বিমলের প্রথম মুগ্ধতা তৈরি হয় ভারতবর্ষের প্রতি অ্যালিসের দরদের কথা জানতে পেরে। সেই মুগ্ধতা ব্যক্তিগত খুশিতে পরিণত হয় কনশেসনে বোমা পড়ার পর অস্থির এ্যালিস বিমলকে খুঁজতে এলে — "বিমল খুব খুশী না হয়ে পারলে না, তার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে এ্যালিসের এত আগ্রহদৃষ্টি দেখে। সেই রাত্রে বোমা পড়েছে শুনে এ্যালিস্ সকলের আগে এসেছে তাকে দেখতে, সে কেমন আছে!"[১৩০] এ্যালিসের প্রতি বিমলের প্রেমের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে আর্ত মানুষের প্রতি এ্যালিসের মরমী মনোভাবের পরিচয়— "আর্ত্ত বালকটির শয়নশিয়রে এ্যালিসকে যেন করুণাময়ী দেবীর মতো দেখাচ্ছে, বিমল সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। এ্যালিসের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠলো।"[১৩১] এ্যালিসের উদার হৃদয়বৃত্তির পরিচয়ের পাশাপাশি পরাধীন ভারতবর্ষের আরও পরাধীন নারীদের তুলনায় তার স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেও মুগ্ধ হয়েছে বিমল— "স্বাধীন দেশের মেয়ে বটে। সংস্কারের পুঁটুলি নয়।"[১৩২] এ্যালিসরা অপহৃত হওয়ার পর তাদের খুঁজে বার করার জন্য বিমলের মরিয়া চেষ্টা, বারবার এ্যালিসের কথা মনে পড়ার মাধ্যমে এ্যালিসের প্রতি বিমলের প্রেম প্রকাশ পেতে থেকেছে— "এ্যালিসের সেই ভঙ্গিটা তার মুখের কথা মনে পড়তেই বিমলের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।"[১৩৩] চীনের পীড়িত মানুষদের সেবা করতে করতে, বিপদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুঝতে যুঝতে বিমল ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে 'সে আর এ্যালিসকে ছেড়ে কখনো থাকতে পারবে না।'[১৩৪] তবে কেবলমাত্র বিমল ও এ্যালিসের প্রেমই নয়, হত্যা-মৃত্যু-বিচ্ছেদের আবহে দাঁড়িয়ে বিভিন্নভাবে প্রেম-সম্পর্কের জয় ঘোষণার চেষ্টা করেছেন

লেখক। মিনি ও সুরেশ্বরের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠা প্রেমের ইঙ্গিতও রেখেছেন লেখক, "তুমুল হৈ-চৈ, আর্ত্তনাদ, কলরব ও পুলিশের হুইসলের মাঝে এ্যালিসের হাত ধরলে বিমল, মিনির হাত ধরলে সুরেশ্বর, কিন্তু পালাবার পথ নেই।"[১৩৫] এরপর সুরেশ্বর সম্পর্কে মিনির উদ্বিগ্নতার কথা শোনা গিয়েছে এ্যালিসের মুখেও। আবার উপন্যাসের শেষে হ্যানকাউ শহরের উপকণ্ঠে ফা-চিন মন্দিরে এক নব দম্পতির প্রেমময় মুহূর্তের সাক্ষী হতে দেখা যায় বিমলদের। জানা যায়, ছেলেটির যুদ্ধে ডাক পড়েছে, যাওয়ার আগে মেয়েটিকে বিয়ে করেছে সে। চীনদেশের সম্ভ্রান্ত সমাজে যে বিধবা বিবাহের প্রচলন নেই, এবং আধুনিক যুদ্ধে যে কোন মুহূর্তে ছেলেটির প্রাণ চলে যেতে পারে জেনেও মেয়েটি তাকে নিঃসংকোচে বিয়ে করেছে। বিদায়ের আগের সময়টুকুকে প্রেম পূর্ণ করে রাখতে চায় তারা। বিমলের মনে হয়েছে, "যুদ্ধ বর্ব্বরের ব্যাবসায়। অথচ এই হাসি, এই আনন্দ, তরুণ দম্পতীর কত আশা, উৎসাহ!"[১৩৬] আসলে ধ্বংসই যে শেষ কথা নয়, হত্যা আর মৃত্যুর বীভৎসতা পেরিয়েও যে মানুষ ঠিকই বাঁচিয়ে রাখবে তার মানবত্ব এই আশাটুকু কিশোর পাঠক যাতে বিস্মৃত না হয় তার জন্যই এই প্রেমের আয়োজন উপন্যাসে। যুদ্ধের বাস্তবধর্মী ভয়াবহ বর্ণনাকে একদিকে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক, সে বর্ণনা কল্পনাপ্রবণ নয়, যুদ্ধের জার্নালের মতোই বাস্তবধর্মী। কাল্পনিক কাহিনির অনুরূপ যে তা নয় সেকথা বিমলের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জানিয়ে দিয়েছেন লেখক— "আসলে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিমলের কিন্তু মনে হচ্ছিল না যে এটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র। বইয়ে পড়া বা কল্পনায় দেখা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।"[১৩৭] ফলে ধ্বংসের বর্ণনাগুলিও পাঠক মনে বাস্তবতার ছোঁয়া এনেছে। নিষ্ঠুর, হিংস্র বাস্তব যেমন আলোড়িত করেছে কিশোর মনকে, তেমনি কিশোর সাহিত্যে অপ্রচলিত প্রেমের নজির রেখে নিরাশ ও নেতিবাচক হয়ে পড়া থেকে কিশোর

পাঠককে বিরত করতে চেয়েছেন লেখক। লেখকের কথাতেই— "ওদের হাসি ও আনন্দ যেন দানবীয় শক্তির ওপর,— মৃত্যুর ওপর,— মানুষের জয়লাভ।"[১৩৮]

প্রেম থেকেই একরকম রক্ষাকারী মনোভাব তৈরি হতে দেখা গিয়েছে বিমলের মনে। পুরুষ যে সে আসলে রক্ষাকর্তা নারীর, এই পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে কিন্তু রেহাই পায়নি 'মরণের ডঙ্কা বাজে'-এর নায়করা। সঙ্গে মেয়েরা আছে বলে বারবার বাড়তি সতর্ক হতে দেখা যায় বিমল-সুরেশ্বরদের। হোক না সে মেয়েরা দূরদেশ থেকে একলা এসে যুদ্ধের মাঝে ঝাঁপিয়া পড়া ব্যক্তিত্বময়ী, তবু মেয়েই তো তারা, দ্বিতীয় লিঙ্গ। কনশেসনে ফেরার তাগাদা দিতে গিয়ে বিমল বলে, "জাপানি বোমা তো আছেই, তা ছাড়া তার চেয়েও খারাপ চীনা দস্যুদের উপদ্রব। সঙ্গে মেয়েরা—"।[১৩৯] আবার রিকশাওয়ালার অভিসন্ধি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বিমলকে পুনরায় বলতে দেখা যায়— "আমরা তো একেবারে নিরস্ত্র। সঙ্গে মেয়েরা রয়েছে—"।[১৪০] আবার এ্যালিস ও মিনি অপহৃত হওয়ার পর বিমলের মনে হয়েছে— "কি ভুলই করেছে অত রাত্রে অজানা রাস্তায় অজানা চীনে রিকশাওয়ালার গাড়ীতে চড়ে,— সঙ্গে যখন মেয়েরা রয়েছে!"[১৪১] বারবার এই সঙ্গে মেয়েদের থাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা যেন মেয়েদের উপস্থিতিকে বাড়তি দায়িত্বে পরিণত করে, আর মেয়েদের বানিয়ে তোলে অতিরিক্ত বোঝা। অথচ খেয়াল রাখা প্রয়োজন, এ্যালিস মিনিদের অপহৃত হওয়ার অনেক আগেই, চীনে আসার পথেই ডাকাতদের হাতে অসহায়ভাবে বন্দী হয়েছিল সুরেশ্বর ও বিমল। তবু পুরুষের তুলনায় নারীর দুর্বলতার কথাই ধ্বনিত হয় বিমলের এই বারংবার মেয়েদের উপস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করায়।

এ্যালিস-মিনিদের কর্মতৎপরতা ও উদারমানসিকতার পরিচয় তৈরি করেছিল মেয়েদের সম্পর্কে বিমল-সুরেশ্বরদের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলার সুযোগ। যদিও দীর্ঘকালের সংস্কার মুছে ফেলার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। চীনদেশে গিয়ে কিন্তু মমতাময়ী এ্যালিস-মিনিদেরই শুধু দেখেনি

বিমল-সুরেশ্বররা। নারীর মমতাময়ী রূপের পাশে তেজদৃপ্ত রূপটিও তারা দেখতে পেয়েছে চীনা নাইনথ-রুট আর্মির নারী বাহিনীর মাধ্যমে, যাদের পরাক্রমের কাছে জাপানি সৈন্যদের পিছু হঠতেও দেখেছে বিমল। বিমলের মনে হয়েছে, "বহু শতাব্দীর জড়তা দূর করে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী— রণক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা, কঠোরতার মধ্যে। দেশের দুর্দ্দিনে দেশমাতৃকার সেবাযজ্ঞে তারা আজ মস্ত বড় হোতা— মিথ্যে জড়তা, মিথ্যে লজ্জা-সঙ্কোচ দূর করে ফেলেছে টেনে।"[১৪২] এ অভিজ্ঞতা বিমলকে ঋদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই, তবু যোদ্ধা নারী ও যোদ্ধা পুরুষকে সে একই আসনে রাখেনি তারপরেও। তাই যুদ্ধে মৃত নারী সৈন্যদের দেখে তার মানসিক অবস্থা বোঝাতে লেখক বলেন, "পুরুষদের এরকম অবস্থায় দেখলে সহ্য করা হয় তো যায়— কিন্তু এই ধরণের নারীবলির দৃশ্যটা বিমলের কাছে অতি করুণ ও অসহনীয় হয়ে উঠলো।"[১৪৩] এভাবে মেয়েদের সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও পুরাতন সংস্কার উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বজর্জর অবস্থাতেই দেখা যায় বিমলকে। নতুন ও পুরাতন ধারণার এই সংঘাত বিমলদের চীন অভিযানকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে, পাশাপাশি 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসটিকেও।

মিসমিদের কবচ:

'মিসমিদের কবচ' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালের এপ্রিলে। পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে কোথাও এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। উপন্যাসটি অভিযানকেন্দ্রিক নয়। মূলত এটি গোয়েন্দাকাহিনি। তবু বিভূতিভূষণের অভিযান কাহিনি আলোচনায় এই উপন্যাসটির একটি নির্দিষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির গ্রন্থ পরিচয় দেওয়ার সময় লিখেছেন, "আসলে এটি ঠিক থ্রিলার নয়, এর আবেদন অন্য জায়গায়। এবং সেখানেই 'মিসমিদের কবচ'-এর মাহাত্ম্য। আততায়ী তার কুকর্মের শাস্তিস্বরূপ 'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর' প্রাপ্তির পর, যে আত্ম-উদঘাটন করেছিলেন, গল্পটির ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেয়েছে

সেইখানে। লোভে পড়ে অথবা কৌতূহলে আক্রান্ত হয়ে পূর্বভারতের প্রান্তস্থিত মিসমিদের একটি ‘কবচ’ সে লুকিয়ে নিয়ে আসে, এবং তারপরে ঐ বিচিত্র কবচেরই প্রভাবে সে ক্রমশ অপরাধপ্রবণ মানুষে পরিণত হয়। এই প্রভাবিত অপরাধ-প্রবণতা, তাকে যেন খোলসের মতো ঢেকে রেখেছিল, যার ভিতরে সে ছটফট করেছিল, তবু মুক্তি পায়নি। এই অন্তর্বেদনাই এই কাহিনির প্রাণ।”[১৪৪] শচীন্দ্রনাথ কাহিনির যে অংশটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন সেই অংশটিতেই আছে অজানা পরিবেশে পৌঁছে নতুন অভিজ্ঞতা লাভের অনুষঙ্গ এবং তৎসম্পর্কিত নৈতিকতার ধারণা। অংশটি আলোচনার দাবি রাখে তাই।

শ্যামপুর গ্রামে গাঙ্গুলি মশাইয়ের খুনের তদন্ত করতে গিয়ে কথক এক কাঠের পাত তথা কবচের সন্ধান পান। কথকের গোয়েন্দা-বিদ্যার শিক্ষাগুরু মিঃ সোমের থেকে কথক জানতে পারেন বস্তুটি আসামের মিসমি জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকা একরকম রক্ষাকবচ, যার গায়ে দেবতার প্রতীক রূপে নক্ষত্র ও উপাসনাকারী মানুষের প্রতীক রূপে পশু আঁকা আছে। তদন্ত শেষে কথক জানকীবাবুকে খুনী হিসেবে ধরতে পারেন। খুনী জানকীবাবু ওই কবচটি ফেলে গিয়েছিলেন, এবং ওটির সন্ধানেই তিনি শ্যামপুর গ্রামে ফিরে নানাভাবে ওটিকে কথকের থেকে হস্তগত করতে চেষ্টা করেন। মূলত ওই কবচটির মাধ্যমেই হত্যাকারী জানকীবাবু ধরা পড়েন ও তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

জানকীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কথক জানতে পারেন, জানকীবাবু নিজের অপরাধপ্রবণতার জন্য ওই কবচটিকেই দায়ী করেন। জানকীবাবুর ভাষায়, “ওই কবচ আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করেচে!”[১৪৫] জানতে পারা যায় ওই কবচ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, সদিয়া অঞ্চলে ব্যাবসা করার সময়। পরশুরামপুর তীর্থের পাশের ঘন জঙ্গলে যখন তিনি ইজারা নিয়ে ব্যাবসা করছেন তখন একবার জঙ্গলে মিসমিদের অপদেবতার এক বিগ্রহ দেখতে পান তিনি।

ভীষণদর্শন সেই মূর্তির ছবি তুলতে চাইলে কুলিরা তাকে বারণ করে। কুলিরা জানায়, “এরা জবর জাত— সরকারকে পর্যন্ত মানে না। ওদের দেবতাকে অপমান করলে গাঁ-সুদ্ধ তীর-ধনুক নিয়ে এসে হাজির হয়ে আমাদের সবগুলোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলবে। ওরা দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না, কারো তোয়াক্কা রাখে না— ওদের দেবতার ফটো খিঁচবার দরকার নেই।”[১৪৬] কুলিদের কথায় উপজাতির মানুষদের সম্পর্কে একরকম ভীতির মনোভাব যেমন প্রকাশ পায়, পাশাপাশি স্বাধীনতাপ্রিয়, ব্রিটিশ সরকারের প্রতিস্পর্ধী এক অবস্থানেও খুঁজে পাওয়া যায় মিসমিদের। সেইসময় ছবি না তুললেও কিসের এক দুর্নিবার আকর্ষণে তিনি সন্ধ্যায় আবার সেই মূর্তির কাছে যান, বিপদসঙ্কুল অরণ্যের সন্ধ্যাকালীন ভীতিকে অগ্রাহ্য করে। সেখানে বলিপ্রদত্ত শিশুর ছিন্ন দেহাবশেষ দেখে শিউরে উঠলেও আবার পরদিন সেখানে যান তিনি। কারণহীন এই বারবার ছুটে যাওয়া সম্পর্কে জানকীবাবুর অভিমত, ‘রক্তপিপাসু বর্বর দেবতার শক্তিই’[১৪৭] তাকে বুঝি অনিষ্টের পরিকল্পনায় সেখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। নরবলি দেওয়া হয় যে দেবতার উদ্দেশ্যে সেই নিষ্ঠুর দেবতার ধরন ভালো করে দেখার জন্যই তিনি কাছ থেকে মূর্তিটি দেখতে যান ও দেবমূর্তির গলায় ঝুলতে দেখা কবচটি হস্তগত করেন। কবচটি হস্তগত করার কারণ হিসেবে জানকীবাবু জানিয়েছিলেন, “ভাবলাম একটা নিদর্শন নিয়ে যাব এদেশের জঙ্গলের দেবতার, আমাদের দেশের পাঁচজনের কাছে দেখাব। নরবলি খায় যে দেবতা, তার সম্বন্ধে যখন বৈঠকখানায় জাঁকিয়ে বসে গল্প করব, তখন সঙ্গে সঙ্গে এখানাও বার করে দেখাব।”[১৪৮] অর্থাৎ অ্যাডভেঞ্চারলব্ধ অভিজ্ঞতার স্মারক হিসেবেই তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কবচটিকে; কিন্তু তার সাথেই নিয়ে এসেছিলেন অমঙ্গল। জানকীবাবুর ভেতরের লোভ লালসাকে বাড়িয়ে তুলে তাকে শঠতার আশ্রয় নিতে বাধ্য করে শেষে মানুষ খুন অবধি করালো এই কবচ— এমনটাই বিশ্বাস জানকীবাবুর। যে রাত্রে জানকীবাবু গাঙ্গুলিমশাইকে খুন

করেন সেইরাত্রেই কবচটি তার থেকে হারিয়ে যায়। লালসার ভারমুক্ত হন জানকীবাবু। জানকীবাবুর মনে হয়েছে, “নিজের কাজ করেই কবচ সরে পড়লো সে-রাত্রেই। আমার সর্বনাশ করে ওর প্রতিহিংসা পূর্ণ হ’ল বোধহয়— কে বলবে বলুন!”[১৪৯]

গোটা বিষয়টিকেই লেখক কবচের প্রতিহিংসা বলে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল এ প্রতিহিংসা কিসের বিরুদ্ধে? মুনাফার জন্য, পাটের ব্যাবসা করতে অরণ্য ধ্বংস করতে আসা ‘সভ্য’ মানুষের প্রতিনিধি জানকীবাবু অরণ্য-মানুষের সংস্কৃতিকে স্থানচ্যুত করে বৈঠকখানার শোভাবর্ধনের জিনিসে পরিণত করবেন— এর বিরুদ্ধেই কি আসলে প্রতিহিংসার প্লট নির্মাণ করছেন না লেখক? তথাকথিত সভ্যতার হাতে বারেবারে শোষিত হতে থাকা আদিম জনজাতিদেরই প্রতিশোধ নয় কি কবচকৃত এ অমঙ্গল? ইতিহাসের এক দীর্ঘ বঞ্চনা, যা ‘সভ্য’ মানুষদের হাত দিয়ে বারবার লুঠ করিয়েছে ‘অসভ্য’ আদিম জনজাতিদের সম্পদ ও সংস্কৃতি, আর লুঠ করে করে তথাকথিত উন্নতির চূড়ায় উঠেছে সভ্য মানুষদের যাপন, তারই কি প্রতিফলন ঘটে না জানকীবাবুর লুকিয়ে অরণ্য-অপদেবতার থেকে মিসমিদের কবচ সরিয়ে আনার মাধ্যমে? খেয়াল করা দরকার, এই কবচের দ্বারা সংঘটিত অমঙ্গলের স্বরূপটিকে। কবচটি জানকীবাবুর হাতে পৌঁছানোর মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে জানকীবাবুর লোভ ও লালসা। জালিয়াতি, পাওনাদারের টাকা মেরে দেওয়ার ফন্দি থেকে শেষ অবধি খুন ও খুনের দায়ে ধরা পড়া, সব সেই লালসা থেকেই ঘটেছে। জানকীবাবুর মতে, “এ প্রবৃত্তি জাগাবার মূলে ওই কবচ খানা!”[১৫০] ‘অসভ্য’কে শোষণ করতে করতে মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে ‘সভ্য’-এর যে লালসা, একদিন সেই মুনাফার পাহাড়ের তলায় লালসাই তাকে ধ্বংস করবে, এই ইঙ্গিত যেন কবচের অমঙ্গল করার ধরনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। লালসার জন্য হস্তগত করা কবচ জানকীবাবুর লালসাকেই বাড়িয়ে দিয়েছে তাই। সেই লালসার জন্যই শেষ পর্যন্ত শাস্তি পেতে

হয়েছে তাকে। কবচ তথা আদিম অপদেবতা তথা আদিম জনজাতির এটাই প্রতিশোধ যেন। জানকীবাবু জানিয়েছেন, “মিসমিদের অনেকে এ রকম কবচ গলায় ধারণ করে, সেটাও দেখেচি কিন্তু তারপরে। শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবার সময় বিশেষ ক’রে এ-কবচ তারা পরবেই!”[১৫১] কেবল যুদ্ধসাজের উপকরণ যা, তাই যেন এখানে হয়ে উঠেছে মিসমিদের যুদ্ধাস্ত্র। ব্যবহৃত হয়েছে ‘সভ্য’ বা ‘উন্নত’ জাতির অন্যের সম্পদ হরণের বিরুদ্ধে।

এভাবে সামগ্রিক অর্থে অভিযান কাহিনি না হয়েও ‘মিসমিদের কবচ’-এর যেখানে রয়েছে চেনা পটভূমির বাইরে স্থানিক সরণ এবং অন্য এক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মুখোমুখি হওয়া, সেই অংশই হয়ে থেকেছে উপন্যাসের মূল চালক। সেখানেই ঘটেছে বিভূতিভূষণের অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ।

বিভূতিভূষণের ‘চাঁদের পাহাড়’ উপন্যাসের নায়ক নিয়েছিল যে পক্ষ, ‘মিসমিদের কবচ’-এ বিভূতিভূষণ নিজেই যেন নিয়ে নিচ্ছেন তার বিপরীত অবস্থান। আদিম জনজাতির প্রতি শঙ্কর-আলভারেজদের বিরূপ মানসিকতার পরিচয় আমরা আলোচনা করেছি আগেই। অরণ্যসম্পদকে অরণ্য থেকে স্থানচ্যুত করতে, ‘সভ্য’দের প্রতিনিধি হিসেবেই তাদের অভিযান, ইউরোপীয় সভ্যতার নৈতিকতাকে সঙ্গে নিয়েই। আর ‘মিসমিদের কবচ’-এ সেই সভ্যের লোভের বিরুদ্ধেই প্রতিহিংসার প্লট নির্মাণ করছেন লেখক। ১৯৩৫-৩৬ সালে লেখা ‘চাঁদের পাহাড়’ আর ১৯৪২ সালের ‘মিসমিদের কবচ’ এর মধ্যবর্তী সময়ে বিভূতিভূষণ ক্রমাগত ভেঙেছেন নিজেকে। এই ভাঙা-গড়ার কথা তাঁর দিনলিপিমূলক গ্রন্থ *তৃণাঙ্কুর* (১৯৩৯)–এ তিনি প্রকাশ করেছেন,

“সাধনা ভিন্ন উচ্চ Outlook কি করে develop করে? খানিকটা মাত্র আমার করেচে— আরও চাই— আরও অনেক চাই।

১৯২৫ সালের, কি ১৯৩২ সালের আমি, আর বর্তমান আমি কি এক? অনেক বেড়েচি— সেটা বেশ বুঝতে পারি— এই দুঃখে, খাটুনি, কম মাইনে, ছেলে-পড়ানোর মধ্যে দিয়েও বেড়ে উঠচি। মানুষ কখন কি ভাবে কোন্ অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে— তা কেউ জানে না।"[১৫২]

এই পরিবর্তনের গতি, এই নিজেকে ক্রমাগত ভেঙে চলাই তাকে 'চাঁদের পাহাড়'-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরিয়ে এনে 'আরণ্যক' উপন্যাস (১৯৩৯) কিংবা 'অভিযাত্রিক' ভ্রমণকাহিনি (১৯৪১) লিখতে সক্ষম করে তোলে। সভ্যের ইতিহাস মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে যাদের থেকে, তাদের কাছে পৌঁছানোর মধ্যে খুঁজে পান বিকল্প অভিযানের ধারণা।

নির্দেশিকা ও টীকা

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-১*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ-৩৯৯

২. ঐ

৩. ঐ, পৃ-৪০৫

৪. ঐ, পৃ-৪১০

৫. ঐ, পৃ-৪১২

৬. ঐ, পৃ-৪২২

৭. ঐ, পৃ-৪০০

৮. ঐ

৯. ঐ, পৃ-৪১৫

১০. ঐ, পৃ-৪৩১

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস*, কারিগর, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-২৫৫

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-১*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪০৫

১৩. ঐ

১৪. ঐ, পৃ-৪২৩

১৫. ঐ

১৬. ঐ, পৃ-৪২৪

১৭. ঐ, পৃ-৪৩২

১৮. ঐ, পৃ-৪২৯

১৯. ঐ, পৃ-৪০৩

২০. ঐ, পৃ-৪১৫

২১. ঐ, ৪২৫

২২. ঐ

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস*, কারিগর, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-১৩২

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-১*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪২৭

২৫. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, *খগেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী*, ভারতী সাহিত্য প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ-১৪৭

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-১*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪১৩

২৭. ঐ, পৃ-৪২৩

২৮. ঐ, পৃ-৪২৪

২৯. ঐ, পৃ-৪২৫

৩০. ঐ, পৃ-৪২৬

৩১. ঐ, পৃ-৪৩৮

৩২. ঐ, পৃ-৪২৭

৩৩. ঐ, পৃ-৪৩৬

৩৪. ঐ, পৃ-৪৩২

৩৫. ঐ, পৃ-৪৩৬

৩৬. ঐ, পৃ-৪৪২

৩৭. ঐ, পৃ-৪৪৩

৩৮. ঐ, পৃ-৪৪৬

৩৯. ঐ, পৃ-৪৬০

৪০. ঐ, পৃ-৪৫৪

৪১. ঐ, পৃ-৪২৫

৪২. ঐ, পৃ-৪৬০

৪৩. ঐ, পৃ-৪৫১

৪৪. ঐ, পৃ-৪৫২

৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-৪*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪৫২

৪৬. ঐ, পৃ-৪৫১

৪৭. ঐ, পৃ-৪৫২

৪৮. ঐ, পৃ-৪৫৩

৪৯. ঐ

৫০. ঐ, পৃ-৪৫৪

৫১. ঐ, পৃ-৪৫৫

৫২. ঐ, পৃ-৪৮৯

৫৩. ঐ, পৃ-৪৫৬

৫৪. ঐ, পৃ-৪৬০

৫৫. ঐ, পৃ-৪৬০

৫৬. ঐ

৫৭. ঐ, পৃ-৪৬৫

৫৮. ঐ, পৃ-৪৮৭

৫৯. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, 'ভারত কলঙ্ক', *বঙ্কিম রচনাবলী- দ্বিতীয় খণ্ড*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৩৪

৬০. ঐ

৬১. ঐ

৬২. ঐ, পৃ-২৩৬

৬৩. ঐ

৬৪. ঐ

৬৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-৪*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪৬৬

৬৬. ঐ

৬৭. ঐ, পৃ-৪৬৯

৬৮. ঐ, পৃ-৪৮৯

৬৯. ঐ

৭০. ঐ, পৃ-৪৯৪

৭১. ঐ

৭২. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, 'ভারত কলঙ্ক', *বঙ্কিম রচনাবলী- দ্বিতীয় খণ্ড,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৩৯

৭৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-৪,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪৬১

৭৪. ঐ, পৃ-৪৯৪

৭৫. ঐ

৭৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, 'ভারত কলঙ্ক', *বঙ্কিম রচনাবলী- দ্বিতীয় খণ্ড,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৬৬ বঙ্গাব্‌দ, পৃ-২৪০

৭৭. ঐ, পৃ-২৪১

৭৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-৪,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪৯২

৭৯. বাগল যোগেশচন্দ্র এবং মুখোপাধ্যায় শুভেন্দুশেখর, *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত,* তালপাতা, কলকাতা, ২০০০, পৃ-২৭

৮০. ঐ, পৃ-৩৬

৮১. ঐ, পৃ-৩৯

৮২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-৪,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪৫৯

৮৩. ঐ, পৃ-৪৬০

৮৪. ঐ, পৃ-৪৫৪

৮৫. ঐ, পৃ-৪৬৯

৮৬. ঐ

৮৭. ঐ, পৃ-৪৬১

৮৮. ঐ, পৃ-৪৭১

৮৯. ঐ, পৃ-৪৭২

৯০. ঐ, পৃ-৪৭৩

৯১. ঐ, পৃ-৫১০

৯২. ঐ, পৃ-৪৬৭

৯৩. ঐ, পৃ-৪৬০

৯৪. ঐ, পৃ-৪৯৮

৯৫. বোভেয়ার, সিমোন দ্য, *দ্বিতীয় লিঙ্গ,* সিংহ কঙ্কর (অনু.), র‍্যাডিকাল, কলকাতা, ২০১১, পৃ-৬২

৯৬. ঐ, পৃ-৬৩

৯৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-৪,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-৫০৮

৯৮. ঐ, পৃ-৫০৮

৯৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-২,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ-৬২৩

১০০. ঐ, পৃ-৩৩৫

১০১. ঐ

১০২. ঐ

১০৩. ঐ, পৃ-৩৩৭

১০৪. ঐ

১০৫. Farmer, Doyen, *The evolution of adventure in literature and life,* https://www.santafe.edu/~jdf/papers/adventure4.pdf, page: 4, last seen 29 June, 2022

১০৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-২,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ-৩৩৯

১০৭. ঐ

১০৮. ঐ, পৃ-৩৪১

১০৯. ঐ, পৃ-৩৪২

১১০. ঐ, পৃ-৩৪৮

১১১. ঐ, পৃ-৩৪৯

১১২. ঐ

১১৩. ঐ

১১৪. ঐ, পৃ-৩৫৬

১১৫. ঐ, পৃ-৩৫৮

১১৬. ঐ, পৃ-৩৫৯

১১৭. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'জাপানে পারস্যে', *রবীন্দ্র রচনাবলী-দ্বাদশ খণ্ড*, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ-৪৪৮

১১৮. ঐ

১১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-২*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ-৩৪৯

১২০. আব্বাস, খাজা আহম্মদ, *ফেরে নাই শুধু একজন*, সরকার, শ্রীনেপালশঙ্কর (অনু.), জিজ্ঞাসা, কলকাতা, মাঘ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, দ্রষ্টব্য পৃ-১-২১

১২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-২*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ-৩৬০

১২২. ঐ

১২৩. ঐ, পৃ-৩৭২

১২৪. ঐ, পৃ-৩৮২

১২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র, *যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র*, তৃতীয় সংস্করণ, মিত্র এণ্ড ঘোষ, কলকাতা, ১৯৪৪, পৃ-১২

১২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-২*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ-৩৭৪

১২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র, *যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র*, তৃতীয় সংস্করণ, মিত্র এণ্ড ঘোষ, কলকাতা, ১৯৪৪, পৃ-১৩

১২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-২*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ-৩৭৪

১২৯. ঐ, পৃ-৩৮০

১৩০. ঐ, পৃ-৩৬০

১৩১. ঐ, পৃ-৩৬১

১৩২. ঐ, পৃ-৩৫৪

১৩৩. ঐ, পৃ-৩৭২

১৩৪. ঐ, পৃ-৩৯৪

১৩৫. ঐ, পৃ-৩৫৭

১৩৬. ঐ, পৃ-৩৯৮

১৩৭. ঐ, পৃ-৩৮১

১৩৮. ঐ, পৃ-৩৯৯

১৩৯. ঐ, পৃ-৩৬৫

১৪০. ঐ

১৪১. ঐ, পৃ-৩৬৮

১৪২. ঐ, পৃ-৩৮৬

১৪৩. ঐ, পৃ-৩৮৭

১৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-৪,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, পৃ-৬৪৬

১৪৫. ঐ, পৃ-৫৪৬

১৪৬. ঐ, পৃ-৫৪৭

১৪৭. ঐ, পৃ-৫৪৭

১৪৮. ঐ, পৃ-৫৪৮

১৪৯. ঐ

১৫০. ঐ

১৫১. ঐ

১৫২. ঐ, পৃ-২৫৪

পঞ্চম অধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র: বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নৈতিকতা ও অভিযানের ভিন্ন বয়ান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পেরিয়ে এসে পৃথিবী যখন প্রস্তুত হচ্ছে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের জন্য, রাজনৈতিক সেই দ্বন্দ্ব-জটিল সময়ে যখন অস্থির ভারত তথা বাংলার পট, সেইসময় বাংলা কিশোর সাহিত্যে কল্প-বিজ্ঞানের আসর জমাতে শুরু করছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি আমদানি করেছেন বলে যেমন প্রখ্যাত হয়ে আছেন তিনি, পাশাপাশি কিশোর সাহিত্যে সেই কল্পবিজ্ঞানকে আশ্রয় করেই তিনি গড়ে তুলছেন নতুনতর আঙ্গিকের অভিযান-উপন্যাস। আবার কল্পবিজ্ঞানের পাশাপাশি ইতিহাসও অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠবে তাঁর অভিযান-উপন্যাসের বিষয়। তাঁর এই অভিযান-উপন্যাসগুলির মধ্যে মামাবাবু-সিরিজ কিংবা ঘনাদা সিরিজ যেমন রয়েছে তেমনই 'পাতালে পাঁচ বছর', 'ময়দানবের দ্বীপ', 'শুক্রে যারা গিয়েছিল', 'মনুদ্বাদশ', 'সূর্য যেখানে নীল'-এর মতো স্বতন্ত্র কল্পবিজ্ঞান কেন্দ্রিক উপন্যাসও কম নেই। কল্পবিজ্ঞানের পরিকল্পনা বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাত ধরেই সম্ভব হয়েছে। মামাবাবু বা ঘনাদার মতো অভিনব চরিত্র ফুটিয়ে তোলা যেমন বাংলা অভিযান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনই এসব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, তার সমাজ ও ইতিহাস সচেতন যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণী কলম অভিযানকে দেখার ধরনে এনে দিয়েছে পরিবর্তন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাত ধরে কীভাবে অভিযান সাহিত্য হয়ে উঠল ঔপনিবেশিক-বোধ ও বিশ্বরাজনীতির বিশ্লেষণ ও সমালোচনা, কীভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি জড়িয়ে রইল সেই বাঁকবদলের সঙ্গে, উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করব আমরা।

মামাবাবু সিরিজ:

বিশ শতকের তিনের দশকের প্রথম দিকে *মৌচাক* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'কুহকের দেশে' প্রকাশিত হতে থাকে।[১] মামাবাবু সিরিজের পথ চলার শুরু সেখান থেকেই। এরপর ১৯৪৮

সালে সিগনেট প্রেস থেকে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচ্ছদসহ প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় উপন্যাস 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস'। এরপর দীর্ঘকাল মামাবাবু সিরিজের কোনো গল্প পাঠকের সামনে আসেনি। মামাবুর কাহিনি আবার প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। 'মামাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'আবার সেই মেয়েটি', 'অতলের গুপ্তধন' তিনটি ছোট কাহিনি একত্র করে *মামাবাবু ফিরেছেন* গ্রন্থটি প্রকাশ করে 'আলফা-বিটা' নামে একটি প্রকাশনা। এরপর ১৯৭২ সালে শৈব্যা পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত হয় পরবর্তী উপন্যাস 'খুনে পাহাড়', যা ১৯৮৩ সালে বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত *মামাবাবু কাহিনি সমগ্র*-তে 'পাহাড়ের নাম করালী' বলে সংকলিত হয়েছে। এরপর ১৯৮৯ সালে মুক্তপত্র পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত *ঘনাদা ও দুই দোসর মামাবাবু ও পরাশর* গ্রন্থে সন্ধান মেলে 'পরচুলা সাহেব ও মামাবাবু' নামে আরেকটি গল্পের। অর্থাৎ মোট তিনটি উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় মামাবাবু সিরিজে। গল্পের সংখ্যা চার।

স্বল্প সংখ্যক এই মামাবাবু সিরিজের উপন্যাসগুলিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র সচেতন চেষ্টা চালাচ্ছেন অ্যাডভেঞ্চার নায়কের দীর্ঘকালীন উপনিবেশ-নির্মিত কাঠামোকে ভেঙে ফেলার। কী সেই কাঠামো যা এতদিন ধরে তৈরি হতে থেকেছে ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলির বয়ানের মাধ্যমে? মার্গারে হোরিয়ান বলবেন,

> The hero is white, and his story inscribes the dominance of white power and white culture. In those versions of the myth which belong to the last four hundred years or so, the period of European expansion and colonialism, white superiority is frequently an explicit theme.[২]

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের আধিপত্য যতো বিস্তৃত হতে থেকেছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে, ততোই শক্তপোক্ত হতে থেকেছে এই ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বজাধারী নায়কের আর্কেটাইপ। বাংলা

অভিযান সাহিত্যের নায়কদের চামড়ার রঙ সাদা না হলেও, মতাদর্শে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় নায়কদেরই অনুসারী, তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। মার্গারে হোরিয়ান আরও জানাবেন, কেবল মাত্র জাতিগত পরিচয়েই নয়, আর্থ-সামাজিক অবস্থানেও নায়ক তার নিজের জাতির লোকদের ওপর আধিপত্য করার মতো জায়গায় থাকবে। উচ্চবর্গীয় মানুষের প্রতিনিধি হতে সে বাধ্য।[৩] যদি উচ্চবর্গের অবস্থান কোথাও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত নাও থাকে, তাহলেও ভদ্রতায়, ব্যবহারে, এবং নৈতিকতায় সে যে সমাজের উচ্চ অংশে গৃহীত হওয়ারই যোগ্য ভদ্রলোক বা 'gentleman' তা বোঝানো থাকে স্পষ্টতই।[৪] বয়সের দিক দিয়েও নায়ক সাধারণত হয়ে থাকে তরুণ যুবা। অনেক শিশু সাহিত্যে আবার তাকে দেখা যায় কিশোর কিংবা আরও কম বয়সী হতে। বয়স্ক নায়কদের উপস্থিতি থাকেও যদি কোথাও, সেখানে তার অভিযান ঘটে গিয়ে থাকে আরও আগে। কম বয়সের অ্যাডভেঞ্চারের স্মৃতিচারণেই সেখানে ব্যস্ত থাকে বয়স্ক-নায়ক। অর্থাৎ চামড়ার রঙে কিংবা মতাদর্শে ইউরোপীয় আধিপত্যের প্রতিনিধি, উচ্চবর্গের চিহ্নক তরুণ-যুবা অভিযান-নায়করাই অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্য জুড়ে রাজত্ব করে এসেছে দীর্ঘকাল। শক্তি, মেধা, সাহস, বিচক্ষণতা, নৈতিক অবস্থানে সেই নায়করা সাধারণ মানুষের থেকে এগিয়ে— এই স্থির প্রত্যয় দর্শানোর জন্য নায়কের পেশীসুলভ দেহগঠন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিখচিত চেহারা, নিয়মানুবর্তী ও সদা উদ্যোগী মানসিকতাকে আলাদা করে চিনিয়ে দিয়েছেন লেখকরা।

'মামাবাবু সিরিজ'-এ প্রেমেন্দ্র মিত্র কিন্তু হেঁটেছেন অন্য পথে। মামাবাবু অর্থাৎ মিঃ রায়ের চেহারা ও স্বভাব সাধারণ আর-পাঁচটা বাঙালির থেকে আলাদাই নয় এমনিতে। এমনকি গোটা সিরিজে মামাবাবুর কোনো নামই ব্যবহার করেননি লেখক। পদবী বাচক 'মিঃ রায়' এবং

সম্পর্ক বাচক 'মামাবাবু' শব্দেই চিহ্নিত হয়েছেন তিনি। 'কুহকের দেশে' উপন্যাসে কথক মামাবাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

> মামাবাবু দেখতে নাদুস-নুদুস নিরীহ চেহারার লোক। কথায় বার্তায়, আচারে ব্যবহারে, কোথাও তাঁর এমন কোনো লক্ষণ নেই যার দ্বারা মনে হতে পারে যে, তিনি অসাধারণ কিছু করতে পারেন। চেহারা ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মনে হয় যে, সাধারণ কলেজের প্রফেসর বা অফিসের বড়বাবু হলেই বুঝি তাঁকে মানাত।[৫]

মামাবাবু সম্পর্কে বরাবর লোকের ধারণা ছিল তিনি আরামের চাকরিই করবেন, কিন্তু আকস্মিক ভাবেই তিনি গেলেন মাইনিং পড়তে। তারপর প্রস্পেক্টর হয়ে বর্মার জঙ্গলে চলে গেলেন। তবু বিদেশ ঘুরেও ভেতো-বাঙালির আয়েসী চেহারাই বজায় রইল মামাবাবুর। কথক জানাচ্ছে, "তাঁকে দেখলে সবারই মনে বুঝি একটু আগলাবার প্রবৃত্তি হয়— অসহায় ছেলেমানুষকে যেমন আগলে রাখতে হয় তেমনি।"[৬] ফলে নায়কোচিত দেখনদারির থেকে তিনি ঘোর আলাদা। অভিযান-নায়ক হওয়ার চেহারা যেমন তার নয়, বয়সও তার পেরিয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি অভ্যাসের দিক দিয়েও তিনি নিয়মানুবর্তী ও কঠিন কাজের উপযুক্ত নয় বলেই মনে হয়। মিচিনায় যাওয়ার পর কথকের অভিজ্ঞতা —

> অভ্যেস অনেকগুলি তিনি খুব খারাপ করে ফেলেছেন— প্রায় নিষ্কর্মা বাঙালী জমিদারের মতই। দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়ে তোফা একটি ঘুম না দিলে তাঁর চলে না, রাত্রে রোজ আধঘন্টা চাকরকে দিয়ে ভালো করে পা টেপানো তাঁর চাই। এ ছাড়া খাওয়া-দাওয়ার বাবুয়ানির ত কথাই নেই।[৭]

এমন লোকের পক্ষে অভিযান যে সম্ভব নয়, পাঠকের মনে সে ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। কথক সেই ধারণাকেই উস্কে দিয়ে বলে, "দিন কতক একটু জ্বলে উঠেই তিনি আবার নিভে

গেছেন।”[৮] দেশ ছেড়ে বর্মার জঙ্গলে চাকরি নিয়ে দূরে থেকে যাওয়ায় যে জ্বলে ওঠার রেশ, তাতেও যে বাড়তি কোনো অভিযাত্রীসুলভ সম্ভাবনা নেই তাও সতর্ক করে দিয়েছে কথক— “তিনি যে বাংলা দেশে ফেরেননি, তার কারণ বোধ হয় এই যে, এক জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যাওয়ার পরিশ্রম ও হাঙ্গামাটুকুও তিনি আর পোহাতে রাজী নন।”[৯] আবার কথককে অবাক করে দিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়ার পরেও প্রাথমিকভাবে মামাবাবুর এই অলসতা একইরকম থেকেছে বলে মনে হয়েছে কথকের। কথকের ভাষায়, “মামাবাবুর কিন্তু কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। মিচিনার পাকা বাড়িতে যেন শুয়েছেন এমনিভাবে তিনি বিছানায় পড়েই নাক ডাকাতে শুরু করলেন।”[১০]

কেবলমাত্র ‘কুহকের দেশে’তেই নয়, ‘ড্রাগনের নিঃশ্বাস’ উপন্যাসেও মামাবাবুর এই অ-নায়কোচিত চেহারা ও না-অ্যাডভেঞ্চারিস্ট স্বভাবের বর্ণনা একইরকম ভাবে উপস্থিত—

> এমন গেঁতো আলসে লোক বাঙালীর ভিতরও দুটি আছে কি না সন্দেহ। কোনরকমে নিখিল-ভারত-নিদ্রা-প্রতিযোগিতায় একটা ব্যবস্থা করলে মামাবাবু আর সকলকে অনায়াসে যে সাতরাত্রি পেছনে ফেলে যেতে পারবেন, এ-বিষয়ে আমি বাজী ধরতে পারি।[১১]

শুধু তাই নয়, কুহকের দেশে অভিযান সাঙ্গ করে চাকরিতে অবসর নিয়ে মিচিনা থেকে ফিরে আসার পর পেনশনভোগী, আরও খানিক বয়স্ক হয়ে যাওয়া মামাবাবু যে আহার-নিদ্রার অপর্যাপ্ত সুযোগে আরও মোটাসোটা হয়েছেন সে খবরও কথক আমাদের দিয়ে রাখে। অভিযান-নায়ক মামাবাবুর জীবন যাপন সম্পর্কে কথকের মনোভাব— “মামাবাবুর ভেতর চিরকাল একটা আরামপ্রিয় নিষ্কর্মা জমিদারী মনোভাব লুকিয়ে ছিল বলে আমার ধারণা।”[১২]

সচেতনভাবেই লেখক এক না-নায়ক অভিযাত্রী গড়ার প্রকল্প বেছে নিয়েছেন। উপন্যাসগুলির ঘটনাক্রম এগোতে থাকলেই আমরা বুঝতে পারি যে মামাবাবু এতটাই আরামপ্রিয়, এলোমেলো, তথাকথিত শারীরিক সুস্বাস্থ্য নেই যার, সেই মামাবাবুকেই প্রয়োজনের সময় দেখা যায় শরীরী সক্ষমতায় শত্রুকে অনায়াসে পর্যদুস্ত করতে। মামাবাবুর বেখেয়ালি এলোমেলো কাজকর্ম আসলে যে পরিকল্পনার অভাব নয়, বরং কথকের অজানা সুদূর ও গোপন পরিকল্পনারই অংশ সময়ে সময়ে তা জানতে পারা যায় উপন্যাসগুলিতে। তাহলে শেষপর্যন্ত অভিযান-নায়কের ভূমিকাই নিতে দেখা যাবে যে মামাবাবুকে, তাকে এরকম অ-নায়ক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে চাইছেন কেন লেখক? কেবলই পাঠকের মনে চমক সৃষ্টি করার জন্য? নাকি গূঢ় কোনো তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে চান লেখক?

অভিযান কাহিনিতে নায়কের মধ্যে দিয়েই সঞ্চারিত হয় বিচারধারা। নায়কের বিশ্বদৃষ্টিই অনুসরণীয় হয়ে উঠে প্রভাবিত করে পাঠককে। সমাজ সম্পর্কে, অন্যান্য জনজাতি তথা অপর সম্পর্কে, ঈপ্সিত লক্ষ্য সম্পর্কে নায়কের নৈতিক অবস্থান এমন এক মানদণ্ড তৈরি করে, যা সামনে রেখে পাঠকের বিচারবোধও সেই পথে ধাবিত হয়। কঠিন প্রতিবন্ধকতাগুলি জয় করতে করতে যখন এগোতে থাকে নায়ক, দ্বিধাগ্রস্ত পাঠকও তখন নায়কের সেই উত্তীর্ণ হওয়াতে মানসিকভাবে সামিল থাকে। নায়কের থেকে পাওয়া সাহস ও উৎসাহ নিয়েই পাঠকের এই কাহিনির মধ্যে অভিযাত্রা, নায়কের দেখানো পথেই। ফলে নায়কের নীতিগত অবস্থানটির সঙ্গেও পাঠক নিজেকে জড়িয়ে নেয়। মাঝে মাঝে কিছু বাঁকাচোরা প্রশ্ন তৈরি হলেও ইউরোপীয় নীতি-ধারণার সঙ্গে একাত্ম, অপর সম্পর্কে ঘৃণা-অনুকম্পা-অবহেলার ধারণা মিশ্রিত নীতিজ্ঞানই মূলত আরোপিত হয়ে আসছিল বাংলা অভিযান নায়কদের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডে। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময় থেকে ফ্যাসিবাদের উত্থান যখন জাতিগত ঘৃণার কদর্য ও ভয়াবহ রূপ সামনে

নিয়ে আসতে শুরু করল আর গত বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় জাতিগত হানাহানির পরিণাম কতোটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা একাংশের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন জাতি-বিরোধের বিপরীতে পর-জাতি-সহনশীল মনোভাবও ক্রমশ জায়গা করে নিতে আরম্ভ করল সাহিত্যে। সাম্রাজ্যবাদের পরিণাম বিশ্বজুড়ে কেমন সর্বগ্রাসী ধ্বংস নিয়ে আসতে পারে তা দেখার ফলে উপনিবেশ সম্পর্কে, ক্ষুদ্র ও আদিম জনগোষ্ঠীর স্বাধিকার সম্পর্কে সহানুভূতিশীল মনোভাবও বৃদ্ধি পেতে থাকল। মামাবাবু সিরিজে সেই পরিবর্তিত নৈতিক অবস্থানই নায়কের মাধ্যমে সঞ্চারিত করতে চাইবেন লেখক।

মামাবাবুর চেহারা ও স্বভাবের না-নায়কসুলভ স্বাতন্ত্র্য কথক মিঃ সেনকে যেমন অবাক করেছে বারবার, তেমনি অবাক করেছে অন্য জাতি বা বর্গের মানুষ সম্পর্কে মামাবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি। কাহিনির বুনটের মধ্যেই লেখক তৈরি করেছেন সেই ভিন্নদৃষ্টি। নায়কের অবস্থান সহজে চিহ্নিত করতে পারা যায়, কাকে সে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করছে তার মাধ্যমে। ‘কুহকের দেশে’ উপন্যাসে আমরা দেখি অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকেই বাঘের ডাক, কম্পাস চুরি যাওয়া, চীনা কুলির হত্যা প্রতিক্ষেত্রেই কথকের সন্দেহ গিয়ে পড়ে চীনা কুলিদের সর্দার লি-সিনের ওপর। এই সন্দেহ আরো জোরালো হয় লি-সিনের হাতে মায়া বাদুড়ের চিহ্নওলা উল্কি দেখে, যে মায়াবাদুড়দের থেকে মামাবাবু ভয়-দেখানো উড়ো চিঠি পেয়েছিলেন। পরে অন্ধকারে ছায়ামূর্তির পায়ের জুতোর সঙ্গে লি-সিনের জুতোর মিল পেয়ে কথকের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। সেই ধারণা সঙ্গে নিয়ে দেখতে থাকে বলে লি-সিনের সমস্ত আচরণই কথকের কাছে সন্দেহজনক লাগে। মামাবাবুর কাছ থেকে সমর্থন না পেলেও কথকের সেই ধারণা টলেনি। সেই সন্দেহের মাত্রা এতটাই তীব্র ছিল এবং নিজের অবস্থান সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত ছিল কথক যে পর্বত গুহায়, যেখানে মামাবাবুর গোপন আস্তানা, সেখানে সাহায্য করতে চাওয়া লি-

সিনকে প্রকৃত শত্রু লাও-চেনের সঙ্গে মিলে আক্রমণ করতে ও বেঁধে রেখে আসতেও দ্বিধা করে না কথক। কথকের এই স্থির প্রত্যয় তৈরি হওয়ার পিছনে কেবল কিছু ঘটনাক্রমই কি দায়ী ছিল? চীনা কুলি-সর্দারের সামাজিক ও শ্রেণিগত অবস্থানও কি কথকের মনে তার সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাকে বদ্ধমূল করে তোলেনি? ইউরোপীয় অভিযান-সাহিত্যে যেমন দেখা গিয়েছে সাদা মানুষের নৈতিকতাই উৎকৃষ্ট আর খারাপ যা কিছু তা না-সাদাদেরই মজ্জাগত; বাংলা অভিযান-সাহিত্যে সেই চিরাচরিত সাদাদের জায়গা নিয়েছে সমাজের উচ্চবর্গ, আর খারাপ-অপরাধী কিংবা অদূরদর্শী, হঠকারী, ভুলচুক করা লোকের জায়গায় বসেছে শ্রেণি ও জাতিগত নিম্নবর্গের মানুষ। সেই প্রচলিত ধারণাকে বহন করেই কথকের লি-সিন সম্পর্কে সন্দেহ ও ভীতি তৈরি হয়েছে। মামাবাবু তথা নায়কের বিপরীত অবস্থান যেন কথকের এই নীতিগত ভ্রান্তিকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কথক লি-সিন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে মামাবাবু বলেন, "হতে পারত, যদি লি-সিনকে আমি না জানতাম ভালো করে। এরকম বিশ্বাসী লোক খুব কম পাওয়া যায়। লি-সিন আমার সঙ্গে আগেও অনেক জায়গায় গিয়েছে।"[১৩] এখানেও মনে হতে পারে নেহাতই পরিচিত বলে মামাবাবু লি-সিনকে অপরাধী ভাবছেন না, নয়তো কুলি-সর্দার লি-সিনের অপরাধী হওয়ার যাবতীয় যোগ্যতা তার শ্রেণিদ্বারা নির্ধারিতই হয়ে আছে বুঝি। উপন্যাসের শেষে গিয়ে কিন্তু আমরা জানতে পারি এই পরিচয় কেবল ব্যক্তিগত লি-সিনকে জানাবোঝায় সীমাবদ্ধ নয়। লি-সিনের জাতিগত ইতিহাস ও সেই ইতিহাসের প্রতি লি-সিনের দায়বদ্ধতায় মামাবাবুর আস্থাই মামাবাবুকে নিশ্চিন্ত করেছে। ইউনানের মুসু জাতির লোক লি-সিন, যে মুসুরা এককালে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করলেও, পরে তাদের স্বাধীনতা লোপ পায়। মায়া বাদুড় মুসুদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে নিবেদিত প্রাণ এক গুপ্ত দল। বিশ্বাসঘাতক সর্দার লাও-চেন, যে কিনা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মামাবাবুদেরও আক্রমণ ও

হত্যার ষড়যন্ত্র করবে, বিপক্ষের কাছে নিজের লোকদের ধরিয়ে দিয়েছিল। অধিকাংশ স্বাধীনতা যোদ্ধা মায়া বাদুড়দের যার ফলে প্রাণ দিতে হয়। লি-সিন পলাতক এক মায়া বাদুড় অর্থাৎ এক স্বাধীনতা যোদ্ধা, যে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে উন্মুখ। মুসু জাতির বিশ্বাসঘাতক লাও-চেনকে উপন্যাসে শত্রু হিসেবে নির্দেশ করে এবং স্বাধীনতাকামী লি-সেনকে বন্ধু হিসেবে সাব্যস্ত করে প্রেমেন্দ্র মিত্র রাজনৈতিক এক নীতিগত অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তুলেছেন উপন্যাসে।

মামাবাবুর শারীরিক স্বাতন্ত্র্য আর সিরিজের নৈতিক পৃথক অবস্থান হাত ধরাধরি করে চলেছে। অপর সম্পর্কে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গিতে এনেছে বাঁক। আলেয়া দারুদের হাতে বন্দী হবার পর কথককে যখন সর্বসমক্ষে আনা হয় তখন ভয়ার্ত কথকের উপলব্ধি লেখকের কৌশলে হয়ে ওঠে অপর-জনজাতি সম্পর্কে এতদিন প্রচলিত নেতি-ধারণার সমালোচনা—

> রক্তাক্ত যুপকাষ্ঠ বা খড়্গ নয়, উত্তপ্ত তেলের কড়াইও নয়! সাধারণত যেসব জিনিস অসভ্য জাতিদের পৈশাচিক ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকে বলে আমরা মনে করি, সে সব কিছুই সেখানে নেই। বেদীর ওপর একটি গর্তের ভেতর মশালটি পোঁতা। একটি কলসী জল ছাড়া বেদীর ওপর আর কোনো জিনিসই নেই। শুধু বেদীর পেছনে খাড়া পাহাড় আর বেদীর ওপর দারুদের সেই রঙমাখা দৈত্যের উপস্থিতি ছাড়া ভয় করবার আমি আর কিছু দেখতে পেলাম না।[১৪]

একটু পরে দেখা যাবে দৈত্যাকার সেই দারুও আসলে ছদ্মবেশী মামাবাবু। আসলে আদিম জনজাতি সম্পর্কে যে ভীতিকর মনোভাব বাসা বেঁধে থেকেছে অভিযান-সাহিত্যের দেহতে তারই বিকল্প ছবি যেন নির্মাণ করতে চেয়েছেন লেখক। সেইজন্যই আলেয়া দারুদের সঙ্গে কখনো লড়াই করতে কিংবা তাদের হত্যা করতে দেখা যায় না মামাবাবুকে। আলেয়া দারুদের

হাত থেকে পালিয়ে আসাটাও ঘটে মামাবাবুর বুদ্ধিতে, কারো প্রাণহানি না করেই। এই পালিয়ে আসার সময় ভৃত্য মংপোকে ফেলে যেতে রাজি থাকেন না মামাবাবু।

বিপদের সময়ে মামাবাবুর বীরত্ব ও সাহস, কায়িক ও বৌদ্ধিক শক্তির প্রাচুর্য দেখা গেলেও লেখক স্মরণ করিয়ে দেন মামাবাবুর না-নায়ক অবস্থান কিন্তু ঘটনাস্রোতে হারিয়ে যায়নি। সচেতন ভাবেই বিকল্প অভিযানের ধরন নির্মাণ করছেন লেখক, তাই অভিযান-নায়কের না-নায়ক রূপটি বজায় রাখার দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন চেষ্টা দেখতে পাব আমরা। উপন্যাসের শেষে দ্রুত হার্টজ কেল্লা পৌঁছানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও কথকের মনে হয়,

> আমরা যাও বা তাড়াতাড়ি করছিলাম, মামাবাবুর কুঁড়েমিতে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। এত পরিশ্রম করার ক্ষমতা, এত উৎসাহ যাঁর মধ্যে এতদিন দেখেছি তিনি যেন আর এক লোক হয়ে গেছেন। এরই মধ্যে মনে হচ্ছে যেন মিচিনার বাড়িতে দুপুরের দিবানিদ্রাটির জন্যে তাঁর প্রাণ আইঢাই করছে। আমাদের কাজ যে কত জরুরী তা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন।[১৫]

যদিও তাড়াহুড়ো না করার কারণ, বুদ্ধিবলে মামাবাবুর আগেই সঙ্কটমোচন করে রাখা, তবু তার কুঁড়েমিতে প্রত্যাবর্তনের বাড়তি উল্লেখটুকু, বিকল্প অভিযান-নায়ক-নির্মাণ প্রকল্পের অংশ বলেই দেখা যেতে পারে।

‘ড্রাগনের নিঃশ্বাস’ উপন্যাসেও এই নীতিগত অবস্থান সুস্পষ্ট থেকেছে। প্রাথমিক না-নায়ক রূপে মামাবাবুকে উপস্থাপনের পরে, মামাবাবুর গোপন অ্যাডভেঞ্চারিস্ট রূপ ফুটে উঠেছে অভিযানকালে:

> মামাবাবু যেন অন্য মানুষ! ওই আয়েসী দেহে এত শক্তি ও সহিষ্ণুতা কোথায় যে লুকিয়ে ছিল কে জানে! কোথায় গেছে তাঁর ঘুম আর বিশ্রাম আর খাওয়া দাওয়া! শুধু এগিয়ে চল আর এগিয়ে চল।[১৬]

এই শক্তি-সামর্থ্যের বর্ণনা দিতে গিয়েও লেখক সচেতনভাবেই নির্মাণ করেছেন শ্বেতাঙ্গ ডিকসনকে পর্যদুস্ত করার প্লট। কথকের বর্ণনায়—

> সেই সঙ্গে মামাবাবুর সেই বিশাল দেহ বিদ্যুতের মত আমার সামনে দিয়ে যেন ছিটকে গেল মনে হল। তারপর একটা সজোরে পতনের শব্দ। খানিকটা ধস্তাধস্তি। তার পরেই দেখা গেল, সেই বিশালাকায় শ্বেতাঙ্গকে মেঝেতে চিত করে ফেলে, মামাবাবু তার বুকের ওপর চেপে বসে বলছেন— "শীগগির দড়ি দিয়ে বাঁধ।"[১৭]

তথাকথিত শ্বেতাঙ্গ পৌরুষের বিরুদ্ধে বাঙালি মামাবাবুর অনায়াস জয়লাভ প্রথা-ভাঙা এক উপনিবেশবিরোধী মনোভাবকে উস্কে দেয়। তবে ঘটে-যাওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিরিখে ফ্যাসিস্ট ও গণতান্ত্রিক শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী। ইতালি-জার্মানির সঙ্গে এশিয়ার জাপানও ছিল ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তির অন্তর্গত। শ্বেতাঙ্গ-বিরোধিতার সূত্রে ফ্যাসিবাদী জাপানকে সমর্থন জানাতে চাননি লেখক। তাই লুয়ং-এর উপত্যকাকে ড্রাগনের ভয় দেখানোর মাধ্যমে জনশূন্য করে সেখানে যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করতে ও গড় নির্মাণের ষড়যন্ত্র করতে দেখা গিয়েছে জাপানি হিরোতাকেই। সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মামাবাবু সাহায্য করেছে ফরাসি গুপ্তচর ডিকসনকে। যদিও ড্রাগনের রহস্যভেদ ছাড়া বাকি আন্তর্জাতিক ঝগড়ায় সরাসরি জড়াননি উপনিবেশবাসী মামাবাবু। ফ্যাসিস্ট শক্তি জাপানের যুদ্ধায়োজনের বিরুদ্ধেই নিজের অবস্থান রেখেছেন তিনি, ডিকসনকে পালাতে সাহায্য করেছেন ও তার মাধ্যমে হিরোতাদের গোপন ষড়যন্ত্র সর্বসমক্ষে এনেছেন। কারণ জাপান গোপন কেল্লা গড়ে তুলে সায়াম, ইন্দো-চায়না ও

বর্মার ওপর কর্তৃত্ব করার পরিকল্পনা করছিল। মামাবাবু প্রত্যক্ষত কোথাও এই গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস করেননি বা জাপানের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় সাহায্য করেননি। উপনিবেশের বাঙালি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। জাপান-জার্মানিকে সমর্থন করলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আঘাত হানা যায় বটে, কিন্তু তাতে ফ্যাসিবাদের হাত শক্তিশালী হয়। আবার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ তথা মিত্রশক্তিকে সাহায্য করা মানে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ তথা ভারতের পরাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেলা। ফলে চেতনাগতভাবে ফ্যাসিবাদ বিরোধী অবস্থান এবং প্রত্যক্ষত মিত্রশক্তি বনাম জাপান যুদ্ধের অংশ না হওয়া— রাজনৈতিকভাবে এই অবস্থানই শ্রেয় স্থির করেছেন লেখক।

কেবল রাজনৈতিক সমর্থনের প্রশ্নেই নয়, যে নৈতিকতা পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান লেখক, সেখানেও শক্তিশালী জাপানের যুদ্ধন্মোত্ততা ও অন্যায় চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যাবে কথককে। ১৯৩৭ সালের ৭ জুলাই জাপান চীন আক্রমণ করে। প্রাথমিক দ্রুত সাফল্যের পর জাপান বাধা পেয়েছিল সাংহাইতে। ডিসেম্বরে সাংহাইয়ের পতন হয়। নানকিংও দখল করে জাপানিরা। নানকিং-এ জাপানিদের অত্যাচার নিন্দিত হয়েছিল গোটা বিশ্বজুড়ে। জাপানের রণোন্মত্ততা ও সাধারণ চীনাদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিরোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কথক বলেছে, "কি অধিকারে আরেকটা জাতির স্বাধীনতা তুমি কেড়ে নিতে চাও?"[১৮] যদিও সাম্রাজ্যলোলুপ জাপানি নীতির বিরোধিতা করলেও, জাপানি মাত্রেই যে হিংস্র নয়, সে কথাও উল্লেখ করতে ভোলেন না লেখক। তাই কথককে গভীর সংবেদনার সঙ্গে বলতে শোনা যায়, "জ্ঞাপানিদের সবাই যে সাম্রাজ্যলোলুপতায় অন্ধ নয়, তা আমি জানি। জ্ঞাপানি জঙ্গীনেতাদের এই আচরণে জাপানের অনেকেই মনে মনে দুঃখিত।"[১৯] রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী নীতি নিয়ে চললেই সে দেশের সমস্ত নাগরিক সাম্রাজ্যবাদী হয় না, জাতিগতভাবে কেউ নিষ্ঠুর ও

হিংস্রও হয় না তাই। একটি জাতির সকল মানুষকে একই ঘৃণার চোখে দেখায়, আসলে লুকিয়ে আছে ফ্যাসিবাদেরই দর্শন, এমনকি সেই জাতির গায়ে সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্কচিহ্ন লেগে থাকলেও। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রে নিপীড়িত সাধারণ মানুষ আসলে একই বন্ধনীতে বসানোর যোগ্য নয়, বরং বিপরীত শোষক-শোষিত অবস্থানদুটিই বজায় থাকে তাদের। এই বিশ্বাস রাখেন বলেই আন্তর্জাতিক মানবতার ধারণাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন লেখক।

শুধু তাই নয় যে জাতিগত শুদ্ধতার ধারণায়, বিশুদ্ধ রক্তের জয়গানে মুখর ফ্যাসিবাদী দর্শন, তার বিপরীতে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণের বর্ণনা সাগ্রহে জানিয়ে যেতে থাকেন লেখক—

> অছথামা, আসলে অশ্বথামা শব্দের অপভ্রংশ। এখানকার বড় বড় সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকদের চেহারা একেবারে মোঙ্গলীয় হয়েও নামের ভেতর এই রকম প্রাচীন হিন্দু সংস্পর্শের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।[২০]

আবার আদিবাসী মানুষদের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রতি মর্যাদাবান হতেও উৎসাহিত করেন লেখক। 'পাহাড়ের নাম করালী' উপন্যাসে আমরা দেখি লোধমা অঞ্চলে শ্রীমহান্তীর অনুরোধে মামাবাবু ও কথক মিঃ সেন বেড়াতে গেলে কথক একদিন 'এঞ্জা পাহাড়ে' ওঠবার চেষ্টা করে। এক আদিবাসী তাকে সেখানে উঠতে বাধা দেয়। মিঃ নাগাপ্পা কথককে বুঝিয়ে দেন এই এঞ্জা পাহাড় আদিবাসীদের কাছে পবিত্র। পরবের বিশেষ দিন ছাড়া এ পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ। আদিবাসীদের এই বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়েই কথক সেই পাহাড়ে ওঠা থেকে বিরত থাকে। শুধু তাই নয়, দূরবীনে প্যান্ট-শার্ট পরা বহিরাগত কোনো সভ্য মানুষকে এঞ্জা পাহাড়ে উঠতে দেখে কথকের মনে হয়, "ওঠাটা ত হালকা খেয়াল বলা যায় না, রীতিমত অন্যায় গোঁয়ার্তুমি।"[২১] কেবলমাত্র ক্ষ্যাপা হাতির গুজব ছড়িয়ে পড়েছে বলেই এঞ্জা পাহাড়ে ওঠা 'অন্যায় গোঁয়ার্তুমি' নয়। 'অন্যায়'-এর ধারণার সঙ্গে লোধমা অঞ্চলের ভূমিজ মানুষের সংস্কৃতিকে অবমাননা করার

বিরোধিতাও স্পষ্ট। অপর সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি যে বদলাতে থেকেছে অভিযান কাহিনিতে, কথকের এই মনোভাব সেই সাক্ষ্য বহন করে।

উপনিবেশের শাসক-শাসিত সম্পর্ক নিয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধে গোটা বিশ্বজুড়েই ঘনিয়ে উঠেছিল অসন্তোষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানি পরাজিত হলেও অন্যদিকে ব্রিটিশ কর্তৃত্বও আর বিশ্বরাজনীতির চালকের আসনে থাকেনি। উপনিবেশগুলিতে গড়ে উঠেছে লাগাতার স্বাধীনতার লড়াই। স্বাধীনতামুখী সেই সময়কালে শাসক-শাসিত সম্পর্ক কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় রাজনীতির বিষয় হয়েই থাকেনি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও। সামাজিক ক্ষেত্রগুলির শোষণ, অর্থনৈতিক স্তর অনুযায়ী উচ্চ-নীচ ভেদ সমস্ত ক্ষেত্রেই উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। ‘পাহাড়ের নাম করালী’ উপন্যাসের কথনকাল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়। উপন্যাসে বলা হয়েছে, “মামাবাবু মিচিনা ছেড়ে আসার পর গঙ্গা আর মহানদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বর্মা আলাদা হয়েছে, দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে।”[২২] স্বাধীনতা-উত্তর সেই সময়কালেও বাঙালির ব্রিটিশ অনুকরণ, ও সেই অনুকরণ নিয়ে শ্লাঘাবোধ যেমন কমেনি, ঠিক তেমনই ব্রিটিশ স্তরায়ন ব্যবস্থা মতোই নিম্ন-পদস্থ কর্মচারীকে হেনস্তা করার দস্তুরও বজায় থেকেছে। এই ঔপনিবেশিক আচ্ছন্নতার (colonial hangover) সমালোচনা করতে দেখব আমরা কথককে। ‘সরকার সাহেব’-এর পরিচয় দিতে গিয়ে কথক জানায়—

> কাজ কতদূর কি করছেন জানি না, তবে পোষাক-আশাকে আর চালচলনে সত্যিই বঙ্কুবাবু যা বলছেন তাই— দাঁতে পাইপ চাপা, গ্যাডম্যাড করে ইংরাজী বলা পাক্কা সাহেব।
>
> এই সাহেবী ভড়ং-এর জন্যে তাঁকে গোড়াতেই একটু লক্ষ করেছি।[২৩]

শুধু সাজপোশাক আর চলন-বলনের সাহেবিয়ানাই নয়, অধস্তন বঙ্কুবাবুকে তিনি ঔপনিবেশিক-রীতিতেই অপমান করতে থাকেন, যা কথকের মনে সরকার-সাহেবের প্রতি তিক্ততাই নিয়ে এসেছে—

> আর সবাই বঙ্কুবাবুকে নাচিয়ে একটু নির্দোষ হাসি তামাসাই করে, কিন্তু সরকার সাহেব যা করেন তা আমার অন্ততঃ বেশ একটু নিষ্ঠুরই মনে হয়েছে।[২৪]

কথক নিজেকে শাসক সরকার-সাহেবের পক্ষে না রেখে শোষিত বঙ্কুবাবুর পক্ষেই দাঁড় করিয়েছেন। তখনও বঙ্কুবাবু ও সরকার-সাহেবের প্রকৃত পরিচয়, তাদের অর্থলিপ্সু চোরাকারবারি রূপ, এবং বঙ্কুবাবুই যে ছদ্মবেশী আসল অপরাধী, সরকার-সাহেব তার সহকারী মাত্র, তা জানা ছিল না কথকের। তাই সরকার সাহেবের ওপর বঙ্কুবাবুর জ্বলন্ত স্বরে ধমক দেওয়া শুনতে পেয়ে কথক যেমন অবাক হয়েছে, তেমনি খুশিও হয়েছে। তার মনে হয়েছে, "আজীবন অন্যায় জুলুম সয়ে সয়ে বঙ্কুবাবুও তা হলে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন, অসহ্য খোঁচানিতে নিরীহ পোকা যেমন রুখে দাঁড়ায়!"[২৫] ক্ষমতার কাঠামোকে পাল্টে দেখার এক অন্তর্লীন আগ্রহ লেখক এখানে সঞ্চারিত করেন, বঙ্কুবাবুর প্রতি সহানুভূতি নির্মাণের মাধ্যমে।

কেবল নায়কের চেহারা কিংবা নৈতিকতার ক্ষেত্রেই পার্থক্য সৃষ্টি করেননি লেখক, অভিযানের কারণ কিংবা অভিযানের সূত্রপাতের ক্ষেত্রেও লেখক বিকল্প নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক অর্থে অ্যাডভেঞ্চার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যহীন হয় না কখনো। উদ্দেশ্যের যে ধরনগুলি আমরা অধিকাংশ বাংলা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলিতে দেখতে পাব, তা গুপ্তধনের সন্ধান কিংবা নতুন কোনো ভৌগোলিক স্থানের খোঁজ। কখনো বা অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়াও চোখে পড়বে আমাদের। অভিযানের এই ধরনগুলি ইউরোপীয়

অ্যাডভেঞ্চারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকেই অনুসরণ করে এগিয়েছে। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে কাঁচামাল ও সস্তার শ্রমিকের জোগানের জন্য প্রয়োজনীয় উপনিবেশ খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিল ইউরোপীয় নৌ-বহর। দখল করেছিল অন্যদেশের সম্পদ ও ভূখণ্ড। সেই পর-সম্পদ ও পর-ভূখণ্ড দখলের নিষ্ঠুর ইতিবৃত্ত গৌরবজনক ও ন্যায়সিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করে গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। বাংলা গুপ্তধনের সন্ধানে অভিযান কিংবা অজানা দেশে পৌঁছানোর অভিযান সেই ইউরোপীয় মতাদর্শের ছাঁদেই গড়ে উঠেছে; কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ-ধ্বস্ত সময়ে সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রতার বিরুদ্ধে, ফ্যাসিস্ট দখলদারির বিরুদ্ধে যখন গড়ে উঠছে জনমত, প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন অভিযান উপন্যাসের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও আনছেন অভিনবত্ব। নতুন ভূখণ্ডে দখলদারির অভিযান-কাহিনি যখন লিখবেন তিনি, তাতেও নির্মাণ করবেন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচারণেরই গল্প। সেকথায় পরে আসব আমরা।

মামাবাবু সিরিজের উপন্যাসগুলিতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযানের কারণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। সেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আবার কোনো যুদ্ধের উপাদেয় অস্ত্র-প্রযুক্তিকে উন্নত করার জন্যও নয়। সেখানে নেই কোনো সাম্রাজ্যবাদী ভাবনার অনুবর্তন। বরং অভিযানগুলি সেই যুদ্ধের সম্ভাবনাকে খারিজ করতেই সাহায্য করেছে— 'কুহকের দেশে'তে ইউনান ও বর্মার যুদ্ধের সম্ভাবনাকে, ও 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস'-এ জাপানের দ্বারা সায়াম, বার্মা ও ইন্দো-চায়নার সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনাকে। অভিযানের উদ্দেশ্যগুলি বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা নির্ভর। 'কুহকের দেশে'তে মামাবাবু ও কথক বিশেষ একরকম মৌমাছির জন্মস্থান খুঁজে বার করতে ও অজানা কীট-পতঙ্গের সন্ধান করতে চীন-বর্মা-তিব্বত সীমান্তের মিলনস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে যা ইরাবতী নদীর এক প্রধান শাখার উৎপত্তিস্থল। ঘটনাচক্রে তারা 'আলেয়া-দারু'দের দেশ ও রেডিয়ামের খনির সন্ধান পেয়েছে, যদিও তা তাদের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। লাওচেন

এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলে মামাবাবু স্পষ্টতই জানিয়েছেন, "তুমি ভুল করছ লাওচেন, আমরা সত্যি পোকার সন্ধানেই বেরিয়েছিলাম। সে সন্ধান অন্য পথে গেছে শুধু তোমারই জন্যে!"[২৬] সত্যিই যে সামান্য পোকার জন্য মামাবাবুর এত আয়োজন করে অভিযান, রেডিয়ামের খনির মতো লাভজনক বিষয় নিয়ে নয় তা সহজে লাওচেন বিশ্বাস করতে পারেনি। মামাবাবু তাই আবারও বলেন, "বিশ্বাস তুমি না করতে পার, কিন্তু কম্পাস প্রভৃতি চুরি যাবার পরও আমি আলেয়া-দারুদের কথা জানতাম না।"[২৭] অভিযানের উদ্দেশ্যকে চিরাচরিত ধারণার থেকে আলাদা করতে চেয়েছেন বলেই এই বিকল্প অভিযান-উদ্দেশ্যকে বাড়তি জোর দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন লেখক। অভিযানের এই আলাদা ও অভিনব উদ্দেশ্য আর্থিক লাভ-ক্ষতির হিসেবে মূল্যহীন। অথচ নেহাতই রোমাঞ্চের জন্য নয়, যেমনটা আমরা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বিমল-কুমারদের অভিযানে দেখেছি। বিমল-কুমাররাও অভিযান অর্থের জন্য নয়, কেবল বিপদের নেশার জন্য বলেই ঘোষণা করে, কিন্তু অভিযানের উদ্দেশ্যগুলি সেই চিরায়ত ভূখণ্ড কিংবা সম্পদের আগ্রহকেই অনুসরণ করে চলে। মামাবাবুর অভিযান উদ্দেশ্যহীন রোমাঞ্চ-প্রীতি থেকে তৈরি নয়, বরং মুনাফাহীন অথচ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য, মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য আয়োজিত। এই বিকল্প অভিযানের অভিনবত্ব সম্পর্কে লেখক শুরুতেই আমাদের সচেতন করে দেন কথকের বয়ানের মাধ্যমে—

> সমস্ত ব্যাপারটাকে সামান্য পোকা-শিকারের অভিযান ভাবতে আমার ভারী মজা লাগছিল; আগে লোকে দুর্গম বিপদসঙ্কুল দেশে যেত দামী ধনরত্নের খোঁজে। এখন সামান্য পোকা সংগ্রহ করবার জন্যে মানুষ তার চেয়েও বিপদসঙ্কুল দেশে প্রাণ হাতে নিয়ে যায়।[২৮]

'ড্রাগনের নিঃশ্বাস' উপন্যাসেও মামাবাবু সায়ামের লুয়ং উপত্যকায় যান এক জাতের পরিযায়ী হাঁস প্রতিবছর শীতের সময় সেই উপত্যকায় এলেও আচমকা সেখানে আসা বন্ধ করে দিয়েছে কেন, তার অনুসন্ধান করতে। জীববিজ্ঞানে উৎসাহ থেকেই মামাবাবুর এই অভিযান, তারপর ক্রমে ড্রাগনের উপদ্রবের গুজব শোনা ও শেষে জাপানের যুদ্ধায়োজনের ষড়যন্ত্র ফাঁস করার ঘটনা ঘটে। নিছক বৈজ্ঞানিক মনোভাব ছাড়া এক্ষেত্রেও আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না মামাবাবুর। 'পাহাড়ের নাম করালী' উপন্যাসে তো নিছক পূর্বপরিচিত মহান্তীর অনুরোধ রাখতেই লোধমা অঞ্চলে মহান্তীর খনিজ-অনুসন্ধান ক্ষেত্রে পৌঁছেছেন মামাবাবু। তারপর দুর্লভ খনিজ পেরিডোটাইটের চোরাচালান ঘটছে জানতে পারলে তা আটকানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। এক্ষেত্রে দুর্লভ খনিজ, যা থেকে ক্রোমিয়াম, প্ল্যাটিনাম শুধু নয়, হীরেও পাওয়া যায়, তার চোরাচালানকারীদের খুঁজে বার করার সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক জড়িয়ে থাকলেও, সেই অর্থের সঙ্গে মামাবাবুর সম্পর্ক নেই। বরং বিশেষ এক নৈতিক অবস্থানই এখানে কাজ করেছে। সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া ভারতবর্ষে তখন খনিজের সন্ধান চলছে, দেশকে স্বনির্ভর করে তোলার অভিপ্রায়ে। সেই দেশীয় সম্পদের চোরাচালানের বিরুদ্ধে নৈতিক অবস্থান নিতে দেখা যায় মামাবাবুকে। নাগাপ্পা ও মামাবাবুর কথা থেকে জানা যায়, গোপনে কিছু পেরিডোটাইট চুরি করে বেচতে পারলে যেমন লাভ হবার সম্ভাবনা, সেইসঙ্গে 'সরকারের কাছে যে সব কোম্পানি এসব খনি চালাবার অধিকার নেয় তাদের কাছে থেকেও গোপন খবর দেবার দরুন মোটা টাকা আদায় করা যেতে পারে'।[২৯] আবার অন্য কিছুর নামে খনি চালিয়ে গোপনে এই ধাতু পাচারও করতে পারে কেউ। ফলে ব্যক্তিগত আর্থিক ক্ষতি কিংবা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টায় অপরাধীর অনুসন্ধান করেননি মামাবাবু। স্বাধীন দেশের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার উদ্যোগকে সহায়তা করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

তিনটি উপন্যাসেই অভিযানের প্রণোদনা এসেছে আকস্মিকভাবে। ‘কুহকের দেশে’তে মিচিনার বাজার থেকে কিনে আনা মধুর চোঙাতে একটি দুর্লভ প্রজাতির মৌমাছি আচমকাই চোখে পড়ে মামাবাবুর। সেখান থেকেই অভিযানের সূত্রপাত। সাধারণ দিনযাপনের মধ্যেই যে এসে যেতে পারে অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ, এই ধারণাকে সিরিজ জুড়ে বহমান রাখতে চান বলেই পরবর্তী উপন্যাস ‘ড্রাগনের নিঃশ্বাস’-এ একটি শিকারের পত্রিকায় মিস্টার মরগ্যানের লেখা প্রবন্ধ থেকে লুয়ং উপত্যকায় যাযাবর হাঁসেদের ঠিক সময় উপস্থিত না থাকার খবর জেনে বিশদে জানতে উৎসাহী হন মামাবাবু। পূর্ববর্তী অভিযানের মতোই আকস্মিকতা থেকে নির্মিত হতে চলেছে এই উপন্যাস তা মামাবাবুর প্রতি কথকের কটাক্ষ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়—

> একবার মধুর চোঙার একটা মৌমাছি থেকে কুহকের দেশের অত বড় রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন বলে আপনি কি মনে করেন বারবার তাই হবে? রহস্য অমনি পথেঘাটে ছড়াছড়ি যাচ্ছে![৩০]

রহস্য ও অভিযানের সূত্রকে তবু তুচ্ছ, চোখে-না-পড়ার মতো জায়গা থেকেই তুলে এনেছেন লেখক বারবার। ‘পাহাড়ের নাম করালী’তেও সেই ধারা অব্যাহত থেকেছে, নেহাতই পরিদর্শন করতে গিয়ে রহস্যে জড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে। সাধারণের ওপর থেকে অতিচেনার পর্দা ঘুচিয়ে অসাধারণত্বকে খুঁজে নেওয়ার চোখ যাতে কিশোর পাঠকের তৈরি হয় সেই উৎসাহ দিয়ে রেখেছেন লেখক।

তিনটি উপন্যাসেই কীট-তত্ত্ব, জীব-বিজ্ঞান, খনিজ-বিজ্ঞানের বিষয়কে আধার করে তুলেছেন বিজ্ঞানে আগ্রহী লেখক। যদিও কল্পবিজ্ঞানের আওতায় আমরা সম্পূর্ণ ফেলতে পারি না উপন্যাসগুলিকে। আলেয়া দারুদের প্রসঙ্গ ছাড়া বিজ্ঞানের কল্পনার জায়গা এখানে কম।

বিজ্ঞানের অনুসন্ধানকে আসলে অভিযানের প্লট নির্মাণের অনুষঙ্গ হিসেবেই ব্যবহার করেছেন লেখক, অভিযানের উদ্দেশ্যগত বিকল্প নির্মাণের জন্যই।

কল্পবিজ্ঞান-ভিত্তিক অভিযান উপন্যাস:

১৯৭৪ সালে শারদীয় *বেতারজগৎ*-এ পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬) লেখেন, একবার কথা প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র নাকি বলেছিলেন,

> আমি একটি সিনথেটিক অটোমেটন, আমি বিজ্ঞানমুখী বাই বার্থ, কবি বাই অ্যাকসিডেন্ট এবং গল্প লেখক বাই প্রফেসন।[৩১]

প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন অভিযান কাহিনি লিখছেন বিজ্ঞানের প্রতি এই আন্তরিক টানের ফলেই তখন অনেক ক্ষেত্রে কল্পবিজ্ঞান হয়ে উঠেছে তার ভিত্তি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিযান উপন্যাসের অনেকগুলিতেই কল্পবিজ্ঞানের প্রভাব এতটাই বেশি যে তাকে অভিযান-কেন্দ্রিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস বলা হবে নাকি কল্পবিজ্ঞান কেন্দ্রিক অভিযান উপন্যাস তাই নিয়ে সংশয় তৈরি হতে পারে। পাঠকভেদে দ্বিমত তৈরি হওয়ার পথ প্রশস্ত করে রেখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, কল্পবিজ্ঞান ও অভিযানের সমন্বয় ঘটিয়ে। ১৯৩১ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'পিঁপড়ে পুরাণ' প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কল্পবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস। *রামধনু* পত্রিকায় তা 'সেকালের কথা' নামে প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। পরে ডি.এম. লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয় 'পিঁপড়ে পুরাণ' নামে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ ও হত্যার খবরই যখন মুখ্য হয়ে উঠেছে সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে, তখন এক যুদ্ধের জার্নালই যেন লিখছেন লেখক উপন্যাসে। 'সে অনেককাল আগের কথা'[৩২] বলে উপন্যাস শুরু হলেও আসলে ভবিষ্যতের মানুষ যেন বর্তমানের মানব সমাজের কাহিনি বলছে এবং আজকের সময়ে যা সাধারণ তাকেই অসাধারণ আর চমকপ্রদ লাগছে ভবিষ্যত

মানুষের— এই ভঙ্গিতে উপন্যাসটি বর্ণিত হতে আরম্ভ করে। উপন্যাসের কথনকাল সুদূর ভবিষ্যতের কোনো একসময়, যখন বিরাট আকারের পিঁপড়েদের আক্রমণে দক্ষিণ আমেরিকা মানবশূন্য হয়ে গিয়েছে। লেখক বলছেন, "৭৮৯৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল, জানা গেছে।"[৩৩] তারপর পিঁপড়েদের পরপর তিনবার আক্রমণে কীভাবে দক্ষিণ আমেরিকার সভ্যতা ধ্বংস হল, অসংখ্য মানুষ গণহত্যায় মরল তার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। পিঁপড়ের এই বিজ্ঞানে কাল্পনিক অগ্রগতি, যুদ্ধাস্ত্রে পটু হয়ে ওঠা ও দখলদারি কীভাবে সম্ভব হল তা বলতে গিয়ে লেখক বলছেন, "মানুষ তখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে ব্যস্ত, পিঁপড়েরা কী করছে-না-করছে, তা দেখবার কথা তাদের কল্পনায়ও আসেনি।"[৩৪] এরপর পিঁপড়েদের অভ্যুত্থান, ও মানুষকে পরাজিত করবার বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন লেখক। সেসব তথ্য আলাদা আলাদা প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে বর্ণিত হয়েছে। তারপর আরেক প্রত্যক্ষদর্শী বিজ্ঞানীর বয়ানে বর্ণিত হয়েছে পিঁপড়েদের সমাজ-গঠন পদ্ধতি ও সেই বিজ্ঞানীর পিঁপড়েদের সঙ্গে দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা এবং অবশেষে মুক্তিলাভের বৃত্তান্ত। গোটা উপন্যাসে ঘটনাপরম্পরা, প্লট ও চরিত্রের বিকাশ নেই। নেই কোনো নায়ক ও তার অভিযাত্রা। সাধারণ অভিযান কাহিনির গঠনের সঙ্গে এই উপন্যাসের কোনো মিলই নেই। পিঁপড়েদের যুদ্ধাভিযানের টুকরো টুকরো বর্ণনাই এখানে ফুটিয়ে তোলেন লেখক। তবে সামগ্রিকভাবে এই বর্ণনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন, যা আসলে মজার কাহিনির প্রচ্ছদে এক রাজনৈতিক বিশ্লেষণকেই পরিবেশন করে—

এক, পিঁপড়েদের মানুষের বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহের সুযোগ পাওয়ার মূল কারণ মানুষের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা। প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়ংকর অভিঘাতের পর পারস্পরিক

হানাহানি যে মানব সভ্যতায় কোনো সুস্থ সময় নিয়ে আসতে পারে না এ বক্তব্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্বই যেন পালন করেছেন লেখক।

দুই, 'পিঁপড়ে পুরাণ' উপন্যাসে পিঁপড়েরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারে মানুষকে অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন লেখক। প্রথম যুদ্ধে মাটির তলা ফাঁপা করে দেওয়ার পর দ্বিতীয় যুদ্ধে তারা শক্তিশালী বোমা ব্যবহার করেছে। তৃতীয় যুদ্ধে তারা জলে বিষক্রিয়া ঘটিয়েছে ও আলোর সাহায্যে মানুষকে অন্ধ করেছে। এছাড়াও দৈহিক শক্তিতে অপটু সেইসব পিঁপড়েরা অসামান্য সব যন্ত্র আবিষ্কার করেছে; কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তা যুদ্ধ ও ধ্বংসের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে থেকেছে এবং অসংখ্য মানুষ ও পিঁপড়ের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই উন্নতিকে ধ্বংসের কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া, বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীকে শিউরে দিয়েছিল। প্রযুক্তি আর মারণাস্ত্রকে সমার্থক করে তোলা সেই বিজ্ঞানের উন্নতির প্রতিবাদ হয়ে উঠেছে 'পিঁপড়ে পুরাণ'।

তিন, ভবিষ্যত-পিঁপড়েদের সমাজ জীবনের এক পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, যা বাস্তবিক পিঁপড়েদের সমাজ-কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই কল্পিত। কেবল সেই কল্পিত পিঁপড়ে-সমাজে কোনো রানী-পিঁপড়ে নেই। নেই কোনো রাজাও। অর্থাৎ একনায়কতন্ত্রের ভিত্তিতে সেই পিঁপড়ে সমাজ চলে না। তবে অধিকাংশ পিঁপড়ে পরিবারহীনভাবে দাসবৃত্তি করে। তার ওপরের শ্রেণিতে থাকে পিঁপড়েদের উচ্চবর্গীয় সমাজ। "তারা অনেকটা মানুষের মতো স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পরিবার বেঁধে থাকে। যা-কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা, রাজ্য-পরিচালনা, যুদ্ধে নেতৃত্ব— তাদের দ্বারাই হয় এবং তাদেরই ছেলেপুলেদের ভেতর যাদের বুদ্ধি অল্প ও ক্ষমতা কম, তাদের ছেলেবেলা থেকেই দাস করে দেওয়া হয়।"[৩৫] এই দাসবৃত্তি যেমন বংশানুক্রমিক নয়, তেমনই তাদের মধ্যে উৎপীড়িত হওয়ার বোধও নেই। শ্রেণি-বিভাজন আছে এবং সেই বিভাজনকে মেনে নিয়ে

চলাও আছে। এই পিঁপড়ে সমাজ যেন আমাদের আধুনিক মানব-সমাজের মতোই। এমনকি তাদের সমাজ পরিচালনাও ঘটে আধুনিক পদ্ধতিতে। "অনেকটা আমাদের গণতন্ত্রের মতো।"[৩৬] সেখানে উচ্চবর্গের মেয়ে ও পুরুষ উভয়েরই অধিকার আছে রাজকার্য করার। কেবল মতভেদ কম হয় কারণ 'যার মাথা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ খোলে সে কখনও রাজনীতিতে মাথা ঘামায় না'।[৩৭] মানব সমাজের আধুনিক শ্রেণিবিভাজিত গণতন্ত্রের একটি রূপই তুলে ধরেছেন লেখক কল্পিত পিঁপড়ে সমাজে, যে সমাজ কাঠামো উন্নতি যেমন করে তেমনই ধ্বংসোন্মুখও হয়ে ওঠে, আধুনিক মানব সভ্যতার মতোই।

শ্রেণি-ভিত্তিক শোষণের প্রতিবাদ আমরা দেখি 'পাতালে পাঁচ বছর' (১৯৩৪) উপন্যাসটিতেও। কল্পবিজ্ঞান-ভিত্তিক অভিযান উপন্যাসের সার্থক নজির রূপেই সমুদ্রগর্ভের এক মানব সমাজে দুই বাঙালির পৌঁছে যাওয়ার গল্প বলেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯২৩ সাল। যদিও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রদের পরিচয় দেওয়ার জন্য লেখককে পিছোতে হয়েছে আরও দশ বছর। উপন্যাসের কথক বিনয় ও তার বন্ধু শরতের বন্ধুত্ব ও চেনা পরিসরের ঘেরাটোপ ছেড়ে অজানায় বেরিয়ে পড়ার আগ্রহ চিরায়ত বাংলা অভিযান নায়কদের মতোই। শরতের সঙ্গে কথকের আলাপের পর কথকের মনে হয়,

> সেদিন টের পেয়েছিলাম, আমারই মতো তার মনের গতি অদ্ভুত। লেখাপড়া শিখে চাকরিবাকরি করতে তার ইচ্ছা নেই। যেসব কাজ কেউ করেনি, যেসব জায়গায় কেউ যায়নি— এমনই সব কাজ করা, এমনই সব জায়গায় যাওয়া তার সাধ।[৩৮]

দেখা যায় মেধা ও বিজ্ঞানের জ্ঞান ও জানাবোঝায় শরৎ এগিয়ে, কিন্তু কায়িক শক্তিতে কথক শক্তিশালী বেশি। লেখক যেন অভিযান নায়কের একক ক্ষমতাকে দুই নায়কে বিভক্ত করে

পরিবেশন করেছেন। তার কারণটিও উপন্যাসে ক্রমশ স্পষ্ট হবে। শরতের বুদ্ধির কেরামতিতে যেমন উপন্যাসের শেষে চমক সৃষ্টি হবে, তেমনই উপন্যাসের বিরাট অংশ জুড়ে শরতের অনুপস্থিতিতে কথকের দৃষ্টিকোণের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে নৈতিক অবস্থান।

শরতের উৎসাহেই তারা জাহাজে ওয়ারলেস অপারেটরের চাকরি নিয়ে সুদূর অস্ট্রেলিয়া যাত্রা করে। তাদের কাছে এই ভিনদেশে যাওয়ার উত্তেজনাটুকুই ছিল অ্যাডভেঞ্চারের সামিল। একই সঙ্গে লেখক দেশ ছেড়ে যাওয়ার পিছুটান ও অজানাকে জানতে পাওয়ার আনন্দের অনুভূতির সমন্বয় দেখিয়েছেন তার নায়কদের মধ্যে —

> খিদিরপুর ডক থেকে জাহাজ যেদিন ছাড়ল, আমাদের সেদিনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা শক্ত। একদিকে নতুন দেশ দেখার আশা উৎসাহ, আর-একদিকে আত্মীয়স্বজনবন্ধুবান্ধব ছেড়ে যাবার গভীর দুঃখ।[৩৯]

এই দুঃখের মাত্রা বেশি হওয়ার কারণ কথক ও শরৎ বাড়ির লোকজনকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। নয়তো তাদের এই ভ্রমণ সম্ভব হতো না। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘যকের ধন’-এ আমরা বিমল-কুমারদের যেমন দেখেছি, এখানে শরৎ ও কথককেও তেমনি পারিবারিক বাধাকে অতিক্রম করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে। আবার দেশ ছাড়ার সময়ের যন্ত্রণা মনে করিয়ে দেবে ‘আবার যকের ধন’ উপন্যাসে বিমলের দেশপ্রীতির অভিব্যক্তি।

মনে হতে পারে অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের পুরাতন মডেলেরই অনুবর্তন করছেন বুঝি লেখক এখানে। আচমকা জাহাজডুবি, সমুদ্রগর্ভের জাতির হাতে শরৎ বিমলদের বন্দী হওয়া যেন সেই ঔপনিবেশিক অভিযান কাহিনিরই ছায়া বলে মনে হলেও পার্থক্য তৈরি হয়ে যায় যখন সেই সমুদ্রগর্ভবাসী মানবজাতির মধ্যেকার শ্রেণি বিভাজন চোখে পড়ে ও শাসক সাদা পোশাকের লোকদের দ্বারা শোষিত পাটকিলে পোশাকের লোকদের ওপর নির্যাতন চালাতে দেখা যায়।

লক্ষণীয় শাসক ও শাসিতের পোশাকের রঙ যথাক্রমে সাদা ও পাটকিলে। উপনিবেশ ভারতবর্ষের শাসক ও শাসিতের চামড়ার রঙেরই দ্যোতক হয়ে উঠেছে পোশাকের রঙগুলি। শ্বেতাঙ্গ শাসকদের অত্যাচারের বর্ণনা লেখক দিয়ে চলেছেন সমুদ্রগর্ভের কাল্পনিক জনজাতির গল্প লিখতে গিয়ে। শাসিত ভারতবাসীরাই যে গল্পে হয়ে উঠেছে পাটকিলে পোশাকধারী সে ইঙ্গিত লেখক আরোই স্পষ্ট করে দেন পাটকিলেদের খাদ্যের কথা বলতে গিয়ে—

> এই মাছটি তাদের রাজ্যে প্রচুর এবং তার তেল গরিব পাটকিলেদের প্রধান আহার, যেমন বাংলা দেশের লোকেদের ভাত আর হিন্দুস্তানিদের আটা।[৪০]

খাদ্যাভ্যাসের তুলনা এনে বৈচিত্র্যকে যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন লেখক, পাশাপাশি সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্লীন সাদৃশ্যটুকুকেই মুখ্য করে তুলেছেন তার বয়ানে।

কেবল বর্ণবৈষম্য নয়, শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণি শোষণের ইঙ্গিতও দিয়ে রাখেন লেখক। সাদা ও পাটকিলেদের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে পাটকিলেদের সর্দারের বয়ানে লেখক জানান, একদা দ্বীপবাসী সাদা ও পাটকিলেরা দ্বীপ ডুবতে থাকলে পাহাড় খনন করে তার ভেতরে বাস করতে শুরু করে। পাহাড় ক্রমে সমুদ্রগর্ভস্থ হয়। সেই ফোঁপরা পাহাড়ে বাস করতে করতে লোকসংখ্যা বেশি হলে খাদ্যের টানে একটু একটু করে সমুদ্রে জলের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে থাকে পাটকিলেরা। ক্রমে জলের ভেতর শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা তাদের বাড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকায় অভিযোজিত হয় তারা; কিন্তু ক্ষমতা কুক্ষিগত হয় সাদাদের হাতে। নিলাঙ অর্থাৎ সেই ফোঁপরা পাহাড়ের “বড়লোকদের অবিচারে তাদের ক্ষতিই হয়।”[৪১] জলের রাজ্যের যাবতীয় কাজ পাটকিলেরাই করে। “দূর দুর্গম বিপদসংকুল জলজ জঙ্গলের মাঝে তারাই খনির ভেতর থেকে তেল তোলে, নিলাঙের নকল হাওয়ার কারখানায় তারাই কাজ করে।”[৪২] অথচ

বদলে তারা শুধুই অপমান, অবজ্ঞা আর নির্যাতনই পায়। লেখক জানিয়ে দেন, "সাদা-পোশাক উচ্চবর্ণের প্রতীক— পাটকিলে-পোশাকিদের তা পরা পর্যন্ত বারণ।"[৪৩] শ্রেণি-বৈষম্যময় সমাজের মালিক-শ্রমিক সম্পর্কটি সাদা-পাটকিলে রূপকে ফুটে ওঠে যথাযথভাবে।

সাদারা পাটকিলেদের গণহত্যায় লিপ্ত হলে কথক বিনয়ের মনে হয়েছে,

> সমুদ্রের তলায় এই সাদা ও পাটকিলে পোশাকের মানুষদের কারও সঙ্গেই আমার কোনও সম্বন্ধ নেই এবং এরা উভয়ে একই দেশের ও একই জাতের লোক, তাদের দু-দলই আমার কাছে সমান হবার কথা। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন শুধু পাটকিলে লোকদেরই আত্মীয় হয়ে গেছি। তাদের জন্যই আমার তখন দুঃখ হচ্ছিল।[৪৪]

উপনিবেশের বাসিন্দা, সাধারণ ঘরের ছেলে বিনয় আসলে তার শ্রেণি অবস্থান ও উপনিবেশের যন্ত্রণা থেকেই পক্ষ নিয়েছে আক্রান্তের। তার বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে পাটকিলেদের সঙ্গে। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো পাটকিলেরা ক্রমে জোটবদ্ধ হচ্ছে ও সাদাদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি নিলাঙ দখল করতে চলেছে জেনে উৎসাহী বিনয় তাদের দলে যোগ দেয়, বিপ্লবী কর্মকান্ডের অংশীদার হয়। ধরা পড়ার পর নিলাঙের দেবতা হিসেবে ছদ্মবেশী শরৎকে দেখার পর বিনয় নিজের মুক্তি লাভেই সন্তুষ্ট থাকেনি, পাটকিলে সঙ্গীদের মুক্তিরও চেষ্টা করেছে। "নারা আমার কত বড় বন্ধু তাকে বুঝিয়ে আমি বললাম, "সে আর সর্দার এখানে বন্দি হয়েছে। তাদের কোনও ক্ষতি যাতে না হয় তাও করতে হবে।"[৪৫] আবার দেবতা সেজে থাকা শরতের বক্তব্যে দেখা যায় যুযুধান সাদা ও পাটকিলেদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা। দেবতা হিসেবে গণ্য হওয়ায় সাদাদের সর্বাধিনায়ক হওয়ার যে সুযোগ শরৎ পেয়েছে তা কাজে লাগিয়ে শরৎ ঠিক করে,

> সাদা ও পাটকিলেরা দুই ভাই। এদের পরস্পরের ভেতর বিরোধ যাতে না থাকে— কেউ যাতে কারও ওপর অবিচার, অন্যায় না করতে পারে তার ব্যবস্থা নিলাঙের দেবতা ছাড়া কে করবে? কালকের বিচারসভায় আমি পাটকিলে ও সাদাদের ভেদ দূর করে সমস্ত পাটকিলেদের মুক্তি দেব।[৪৬]

শোষিতের পক্ষ নেওয়ার এই অবস্থানই প্রেমেন্দ্র মিত্রের নায়কদের ইউরোপীয় ঘরানার অভিযান নায়কদের থেকে আলাদা করে তুলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ উল্লেখও আমরা পাই যখন ১৯২৩ সালে জাহাজে যাওয়াকালীন মি. বেনসনের কাছে জার্মানি ও ইংল্যান্ডের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের যুদ্ধ ও তার ফলে অস্ট্রেলিয়া থেকে গম বোঝাই জাহাজ আটলান্টিক দিয়ে না পাঠিয়ে ভারত মহাসাগর দিয়ে ভারতবর্ষ হয়ে পাঠানোর খবর বিনয়-শরৎরা শোনে। কীভাবে উপনিবেশের কাঁচমাল রপ্তানি হয়ে যেত তার ইঙ্গিতও যেমন এখানে মেলে, তেমনি বিশ্বযুদ্ধের সময় নতুন নতুন যাত্রাপথ ও অনাবিষ্কৃত পৃথিবী কীভাবে জানা চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়ছিল তাও স্পষ্ট হয়ে যায়।

বিশ শতকে বিজ্ঞান উন্নতি করছিল প্রবল দ্রুতিতে। অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা সে বিজ্ঞানের বাড়বাড়ন্তে তাক লেগে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল বিজ্ঞানের এই প্রবল অগ্রগতি মানুষের স্বার্থে ব্যবহৃত হবে নাকি বিরুদ্ধে? বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় চালকের আসনে যে থাকে তার দর্শনই নিয়ন্ত্রণ করে বিজ্ঞানের অভিমুখ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পার হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতা, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও বিজ্ঞানকে মানব সভ্যতার ধ্বংসে ব্যবহার করা দেখে শিহরিত মানুষের মনে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রতি ছিদ্রহীন শ্রদ্ধা জন্মায়নি। বিজ্ঞানের প্রতি বিস্ময়

নিয়েও প্রেমেন্দ্র মিত্র সন্দেহসহ তাকিয়েছেন তার প্রয়োগের রাজনীতির দিকে। 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' (১৯৩৪) ও 'ময়দানবের দ্বীপ' (১৯৪৯) উপন্যাসদুটিতে অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্দেহ ও সমালোচনার সতর্ক দৃষ্টি রয়ে গিয়েছে। 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' উপন্যাসটি ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৬৪ সালে নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'শুক্রে যারা গিয়েছিল' হয়। উপন্যাসটির রচনাকালে হিটলারের জার্মানি একদিকে বিজ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠছে মারণাস্ত্রে, অন্যদিকে প্রবল জাতিবিদ্বেষ ও অন্ধ জাতীয়তাবাদে হয়ে উঠছে জর্জর। উপন্যাসের খল নায়ক ড. ব্রুল তখন জার্মানিকে প্রাকৃতিক সম্পদের জোগান দেওয়ার জন্য উপনিবেশ প্রস্তুত করতে শুক্রগ্রহে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। লেখক জানাচ্ছেন, "সমস্ত উপনিবেশগুলি প্রথম মহাযুদ্ধের পর তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার দরুন জার্মানির নানারকম কাঁচা মাল ও খনিজ জিনিস সংগ্রহের অসুবিধা হয় এ কথা সবাই জানে। কিছুদিন আগে তিনি সেই ব্যাপারের উল্লেখ করে একটি সভায় হঠাৎ গর্ব করে বলেন যে সমস্ত পৃথিবী মিলে জার্মানিকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারবে না। জার্মানিকে তিনি এমন অফুরন্ত সম্পদের সন্ধান দেবেন, এমন বিশাল রাজ্য তার হাতে তুলে দেবেন যা কোনও জাতি কল্পনাও করতে পারে না।"[৪৭] বস্তুতপক্ষে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানির হাত থেকে যাবতীয় ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল জার্মানী নগদ টাকায় ও পণ্যদ্রব্যের দ্বারা যুদ্ধের জন্য মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেবে। সেই মোট ক্ষতিপূরণের মূল্য ছিল ৬৫০ কোটি পাউন্ড। জার্মানির সমস্ত উপনিবেশ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ও জার্মানির কোন সমুদ্রতীরবর্তী ঘাঁটিও রাখা যাবে না বলে স্থির হয়েছিল। জার্মানিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা হয়েছিল ও রাষ্ট্রের সীমানা পুনরায় নির্ধারিত করা হয়েছিল।[৪৮] এই বিপুল আর্থিক ভার বহন করতে গিয়ে জার্মানি প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধুঁকতে থাকা অর্থনীতি ও জনগণের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েই সেখানে ফ্যাসিবাদের

উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। ফ্যাসিবাদের দুনিয়া জুড়ে দাপাদাপির সময় সেই পূর্বসূত্র ও বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দায় সম্পর্কে সচেতন মন্তব্য রেখেছেন লেখক।

এই ফ্যাসিবাদের দর্শনকে আয়ত্ত করেই নিজের আবিষ্কারের সুফল গোটা পৃথিবীকে না দিয়ে জার্মানিকে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন ড. ব্রুল। শুক্রগ্রহে অভিযানের পরিকল্পনাও ড. ব্রুল করেছেন বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ফ্যাসিস্ট জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি করার জন্যই। দুই বাঙালি সমর ও অজয় সেই অভিযানে জড়িয়ে পড়েছে আকস্মিক ভাবেই। লেখক জানাচ্ছেন, "তারা এমন কিছু অসাধারণ দুঃসাহসী ছেলেও নয়, আরও দশ জনের মতো বিলেত থেকে ভালো করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে গিয়ে চাকরি বা স্বাধীন ব্যবসা করাই তাদের লক্ষ্য।"[৪৯] দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। নেহাতই একটু নতুন দেশে গিয়ে সপ্তাহ দুয়েক ফূর্তি করবে বলে তারা হামবুর্গে গিয়েছিল। লেখক স্পষ্টতই জানিয়েছেন, "সমর ও অজয় যখন বিলেতের নিউকাসল্ থেকে হামবুর্গ যাত্রী একটি স্টিমারে চড়েছিল তখন তাদের অসাধারণ কোনও অভিযানের কল্পনাও ছিল না।"[৫০] তাহলে এমন না-অভিযাত্রীদের কেন্দ্রীয় চরিত্র করে তুললেন কেন লেখক? বিশ্ব রাজনীতির এই অস্থির প্রেক্ষাপটে ভারতীয়দের অবস্থান কোথায় সেটাই আরও প্রকট করে দেখাতে চেয়েছেন লেখক। হামবুর্গের হোটেলে বিদেশি গুপ্তচরের খোঁজে পুলিশের খানাতল্লাশির প্রচণ্ড বহরের মধ্যেও তাদের কেউ সন্দেহযোগ্য বলেও মনে করছে না দেখে অজয়ের মনে হয়েছে, "ভারতবাসীকে এরা সন্দেহের উপযুক্ত বলেও মনে করে না দেখছি যে!"[৫১] দুনিয়া জুড়ে তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি। উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি একে অন্যের গুপ্তচরে ছেয়ে আছে তখন; কিন্তু উপনিবেশের বাঙালি সেই যুদ্ধের স্বার্থ থেকেও দূরে, কেবলই ব্রিটিশদের প্রজা মাত্র। জাতি হিসেবে স্বীকৃতির চিহ্নটুকুও নেই তার। এই স্বীকৃতি না থাকার কারণেই সমর ও অজয়কে কৌশলে অভিযানে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন হের ভোগলে অর্থাৎ

নকল ড. ব্রুল, যে কিনা ছিল আসল ড. ব্রুলের সহকর্মী। প্রথমে প্রকৃত ড. ব্রুলের ভঙ্গিতেই ভোগেল বলেছেন,

> আমার এবং আমার দেশের কীর্তির সরিক কাউকে হতে দেব কেন? ইউরোপ আমেরিকার কাউকে নিলে আমার অধিকারে তার দেশের হয়ে অন্তত সে দাবি করতে পারত। আপনাদের বেলা সে ভয় তো নেই। আপনাদের কিছু পুরস্কার দিলেই সব হ্যাঙ্গামা চুকে যাবে।[৫২]

ভারতবর্ষের হয়ে নতুন উপনিবেশের ভাগ চাইবার জোর যে সমর-অজয়দের নেই, কারণ নিজেই তারা উপনিবেশের বাসিন্দা, তা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন ভোগেল। ভারতবাসীর তথা বাঙালির অ্যাডভেঞ্চার যে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক মডেলে হওয়াটা আদতে সম্ভব নয়, তা যে কষ্টকল্পনাই কেবল, সে ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন লেখক। সেই কষ্টকল্পনার বিদ্রূপ আরও সুচারুভাবে লেখক নির্মাণ করেছেম ঘনাদা-সিরিজে। সে কথায় আমরা পরে আসব।

আসল ড. ব্রুল যখন অজয় ও হের ভোগেলকে উড়োজাহাজ থেকে সরিয়ে দিয়ে জাহাজের কর্তৃত্ব নিয়েছে, তখন সেই ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকের মানসিকতা দেখে ঘৃণায় ভরে উঠেছে সমরের মন— "কিন্তু বৈজ্ঞানিকের এই বিকৃত রূপ দেখলে সমস্ত বিজ্ঞানের সাধনার ওপরই বুঝি অশ্রদ্ধা এসে যায়।"[৫৩] সমরের মনে হয়েছে, "মানুষের কল্যাণ, বিজ্ঞানের জয় এসব কিছুই নয়, নিজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তিই তার একমাত্র আরাধনার জিনিস।"[৫৪] বিজ্ঞান যে আসলে কল্যাণময় বা ধ্বংসাত্মক কোনোটাই নয়, বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রক মানুষের ওপরেই নির্ভর করছে তার গতিপথ, তা লেখক বুঝিয়েছেন আসল ও নকল ড. ব্রুল দুই বিজ্ঞানীর পার্থক্যের মাধ্যমে। আসল ড. ব্রুল হিংস্র ও স্বার্থপর। তিনি ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে সাহায্য করতে চান পৃথিবীকে বঞ্চিত করে। আর নকল ড. ব্রুল অর্থাৎ হের ভোগেল চান বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য আবিষ্কার ও শুক্রগ্রহের এই

অভিযান গোটা পৃথিবীর মানুষের উপকারে লাগাতে। সমর-অজয়দের তিনি তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিয়েছেন,

> শুধু একটি জাতির জন্যে নয়, সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আমি শুক্রগ্রহ জয় করতে চেয়েছিলাম। সেই জন্যেই তাঁকে বন্দি করে রেখে আমায় অন্য সহকারী খুঁজতে হয়েছে। নতুন গ্রহ জয়ের গৌরব যাতে কোনও একটি বিশেষ দেশ না দাবি করতে পারে সেই জন্যেই আপনাদের মতো পরাধীন দেশের লোককে আমি বেছে নিয়েছিলাম।[৫৫]

হের ভোগেলের এই বক্তব্যে ভারতবাসীর স্বীকৃতির সম্ভাবনাহীন অভিযাত্রী হওয়ার অবস্থান বদলে যায় না বটে, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিকতাবাদে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর উপন্যাসের শেষ দিকে আসল ডঃ ব্রুলের উন্মাদ হয়ে যাওয়া ও পরে তার মৃত্যু পোয়েটিক জাস্টিস (Poetic Justice) নির্মাণ করে।

এছাড়াও আমরা দেখতে পাই, উপন্যাসের নানা জায়গায় শিশু-কিশোরদের সহজে বিজ্ঞান বোঝানোর চেষ্টা করছেন লেখক। কল্প-বিজ্ঞানের মধ্যে কল্পনার দৌড় থাকে, তবে তা বিজ্ঞানের সত্যতার পোক্ত কাঠামোর ওপর ভর করেই গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানের এই পোক্ত কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে কল্পনার দূরপাল্লা প্রেমেন্দ্র মিত্রের আগে দেখতে পাওয়া যায়নি। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে *প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প* গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে, তার ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন,

> যথার্থ বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প শুধু অসার অলীক কল্পনা যে নয়, বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তা যে অনাগতের আশ্চর্য পূর্বাভাস দেয়, তার বহু প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে।[৫৬]

কেন এমন বিজ্ঞান-নির্ভর কল্পনার আয়োজন? ১৯৬৪ সালে 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' উপন্যাসটি যখন 'শুক্রে যারা গিয়েছিল' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়, এটির শুরুতে 'প্রকাশকের নিবেদন' নাম নিয়ে কিছু কথা প্রকাশিত হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজের লেখা বলেও সেটিকে মনে হতে পারে। অন্তত প্রেমেন্দ্র মিত্রের তত্ত্বাবধানেই যে তা লেখা হয়েছিল এ নিয়ে সন্দেহ নেই। সেখানে বলা হয়েছিল,

> হাউই-বারুদই যে ভাবীকালের মহাকাশ-বিজয় সম্ভব করে তুলবে, এই নির্ভুল দূরদৃষ্টির কৃতিত্বটুকু বাংলা ভাষায় গ্রহান্তর যাত্রা সম্বন্ধে প্রথম মৌলিক ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক এই উপন্যাসটি দাবি করতে পারে। এ ধরনের বৈজ্ঞানিক উপাখ্যান বিজ্ঞানের সত্যকার কিছু উপাদানের সঙ্গে অনেকখানি কল্পনার রঙ মেশানো থাকে। বাড়ন্ত সন্ধানী মনকে গল্পের সরসতার ভেতর দিয়ে বিজ্ঞান জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তোলাতেই এ জাতীয় রচনার সার্থকতা।[৫৭]

কিশোর মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহের জন্ম দিতে দিতে তিনি লিখেছেন এইরকম কল্প-বিজ্ঞান নির্ভর অভিযান উপন্যাসগুলি। তার মধ্যেই ধারণ করে রেখেছেন সমসময়ের রাজনৈতিক দর্শন ও নৈতিক অবস্থান।

সমসময়ের অভিজ্ঞতা ও তা থেকে নির্মিত নৈতিক অবস্থানকে বহন করেন বলেই প্রেমেন্দ্র মিত্র শিশু-কিশোর সাহিত্যেও বাস্তবের সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে চান না। বিজ্ঞানের প্রবল শক্তির দাপট আর তার ধ্বংসলীলা, যা দুই বিশ্বযুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে, এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালেও যে দাপট আর ধ্বংসের আশঙ্কা বহতা থেকেছে, তা প্রত্যক্ষ করে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবও যেমন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই জেগেছে প্রশ্ন, মানুষের এই প্রবল হিংসা আর হানাহানির আদৌ কোনো সমাপ্তি আছে কিনা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ময়দানবের দ্বীপ'

উপন্যাসে আমরা দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের এক অজানা দ্বীপে সাতাত্তর জন প্রৌঢ় বিজ্ঞানী আগ্নেয়গিরির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে রোবট-সৈন্যের এক বিশাল ফৌজ তৈরি করছে। তারা মনে করেন পৃথিবীময় বিশৃঙ্খলা, অনাচার আর দুঃখের মূল কারণ অযোগ্য, কপট, স্বার্থপর আর নির্বোধ মানুষদের ক্ষমতায় থাকা। গোটা পৃথিবীর ভার তাদের থেকে তাই ছিনিয়ে নিতে হবে। আর তার জন্য রক্তপাত ও ধ্বংস ছাড়া উপায় নেই। "মৃত্যুর ভেতর দিয়েই নতুন জীবন পেতে হবে, এই তাঁদের সিদ্ধান্ত।"[৫৮] সাধারণ হিংসাশ্রয়ী, সাম্রাজ্যলোলুপ যে তাঁরা নন, নতুন এক শান্তিসমৃদ্ধ পৃথিবীর জন্যই যে তাদের নির্লোভ ধ্বংসের আয়োজন তা বোঝাতে গিয়ে লেখক এই সাতাত্তর সাধকদের পরিচয় দিয়েছেন সন্ন্যাসীতুল্য অবস্থানের বর্ণনায়—

> এঁরা যেন আরও উঁচু কোনও এক স্তরের জীব। সাধারণত আমরা অসামান্য লোক বলতে যে ধারণা করে থাকি— এঁদের সঙ্গে সে ধারণা মেলে না। এঁদের মধ্যে বাহ্যিক আড়ম্বর নেই, কোনও চড়া, চোখ-ঝলসানো রং নেই এঁদের কথায়, চেহারায় বা আচরণে। কিন্তু তবু এঁরা যে অনেক উঁচুতে সেটুকু বুঝতে বিলম্ব হয় না।[৫৯]

অর্থাৎ, রাজনীতিবিদ দেশনায়কদের থেকে আলাদা গোত্রের মানুষ বিজ্ঞানীরা। প্রবল ধ্বংসের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে তারা আসলে পৃথিবীকে নতুন রূপদান করতে চান। সেই নতুন পৃথিবীতে নিজেদের সাড়ম্বর প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ নন তারা। তবু উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, কিন্তু পন্থা নিয়ে তাদের মধ্যে দেখা গেছে বিরোধ। সংশয় এসেছে, এত জীবন নাশ করে পৃথিবীর শান্তি আনায় শান্তির মূল্যই অতিরিক্ত বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা তাই নিয়ে। এই ধ্বংসের মাধ্যমে শান্তি নিয়ে বিতর্ক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আজও তীব্রতর হয়ে চলেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই বিতর্ককে আশ্রয় দিয়েছেন তার কিশোরপাঠ্য উপন্যাসেও।

সাতাত্তর সাধকদের হাতে বন্দী অসীম আর তাকে মুক্ত করতে যাওয়া বিজয় ও সরকারি গোয়েন্দা লোকেশবাবুও নতুন পৃথিবী প্রতিষ্ঠার এই পথ নিয়ে সন্দিগ্ধ হয়েছে। আবার উপন্যাসের শেষে, সাতাত্তর সাধকদের এই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেলে, তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে সমবেদনাও ধরা পড়েছে—

> কিন্তু সে কথা ভাবতে বসলে এখনও তাদের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—
> সাতাত্তর-সাধকদের সাধনা সত্যিই সম্পূর্ণ ভুল ছিল কি না![৬০]

উপন্যাসটিতে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতির অসীম শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা অসাধ্য সাধন করছে বলে দেখানোর পর, সেই প্রকৃতির প্রতিশোধেই ধ্বংস হতে দেখা গিয়েছে বিজ্ঞানীদের যাবতীয় আয়োজন। বিজ্ঞানের প্রবল বাড়বাড়ন্তে প্রকৃতি বশ মানতে মানতে এক সময় প্রতিশোধ নেবে, এবং মানবজাতিই যে তাতে সঙ্কটে পড়ে যাবে, এ সমালোচনাও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে রেখেছেন লেখক।

'মনু দ্বাদশ' (১৯৬৫) ও 'সূর্য যেখানে নীল' দুটি উপন্যাসই ভবিষ্যতের কাল্পনিক বৃত্তান্ত। সুদূর ভবিষ্যতে মানব জীবন কেমন হবে— এ কল্পনার দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র উপন্যাসদুটিতে ফুটে ওঠে। প্রথমটিতে ক্ষয়িত, ধ্বংসপ্রাপ্ত মানবজাতি দ্বিতীয়টিতে উন্নতির শীর্ষে উঠে যাওয়া মানব সভ্যতার কথা বর্ণিত হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই রয়েছে বিজ্ঞানের অবদান। 'মনু দ্বাদশ' উপন্যাসে পরমাণু যুদ্ধের ফল স্বরূপ মানবজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত। সামান্য তিনটি গোষ্ঠী শুধু কোনোরকমে আদিম গোষ্ঠীভুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে বেঁচে আছে। প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হওয়ায়, মানব জাতির সেই শেষ অস্তিত্বটুকুও আর থাকবে না বেশিদিন। অন্যদিকে 'সূর্য যেখানে নীল' উপন্যাসে সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে দূর নক্ষত্রপুঞ্জেও মানুষের নিত্য যাতায়াত। বিজ্ঞানের উন্নতির দুই

বিপরীত ফলাফল দুটি উপন্যাসে দেখানো হয়েছে বটে কিন্তু সত্যিই কি পরস্পর বিরোধী বক্তব্যই উপস্থিত করেছেন লেখক উপন্যাসদুটিতে?

১৯৬৫ সালে 'মনুদ্বাদশ' উপন্যাসটি লিখছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপর পরমাণু বোমাবর্ষণ হয়ে গিয়েছে বেশকিছুকাল আগে। সেখানের উত্তরপ্রজন্মের মধ্যেও দেখা দিয়েছে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার বিষাক্ত ফল। জন্ম নিয়েছে হিবাকুশা, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার ফলে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানো উত্তরপ্রজন্মের। তারপরেও পরমাণু অস্ত্রের প্রতিযোগিতা জারি থেকেছে উন্নত দেশগুলির মধ্যে। পরমাণু যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষয়িত ও বন্ধ্যা হয়ে যাওয়া ভবিষ্যত মানবজাতির কল্পনা তাই সময়-নিরপেক্ষ নয়। উপন্যাসে দেখাচ্ছেন লেখক, ধ্বংস হয়ে যাওয়া মানবজাতির শেষ অস্তিত্ব টিকে আছে প্রাভা, কাফ্রাম ও ইউসোভ তিনটি গোষ্ঠী ওপর ভর করে। সামান্য সংখ্যক মানুষ, অথচ তাদের মধ্যেই নিয়ত চলে রক্তক্ষয়ী গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পরিবারতন্ত্র নেই। শেষ যে কয়জন শিশু বড় হয়েছে তারা প্রতিপালিত হয়েছে সমষ্টির মাধ্যমে, শিবির দ্বারা। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আবার ইওসোভদের পুরুষ-নারী অনুপাতে কিছুটা সামঞ্জস্য থাকলেও প্রাভাদের মধ্যে নারী ও কাফ্রামদের মধ্যে পুরুষ বিরল। ফলে বহুগামিতা গোষ্ঠীগুলির সাধারণ লক্ষণ। ব্যক্তিগত প্রেম সম্পর্কের সেখানে মূল্য নেই। নিয়মানুবর্তী, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন তাদের। তার মধ্যেই প্রেমেন্দ্র মিত্র নিয়ে এসেছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিহ্নবহ চরিত্রদের। পরজ, দুরু, আজিব, নন্দক, শর্ভ প্রত্যেকেই ব্যক্তি হিসেবে কোনো না কোনোভাবে শিবিরের নিয়মতন্ত্রের থেকে নিজেদের ইচ্ছা ও অবস্থানকে পৃথক করেছে। লেখক বলেন, "শর্ভ ইওসোভদের এক ব্যতিক্রম, দুরু আর তার সাথীরা, এমন কী পরজও, যেমন ব্যতিক্রম প্রাভাদের। শিবিরজীবনে তারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিতে কিছুতেই পারে না।"[৬১] এই মিলিয়ে দিতে না পেরে স্বতন্ত্র অবস্থান বজায় রাখাকে বলা

হয়েছে ‘সুদূর পৌরাণিক বিকৃতি’।[৬২] এই সুদূর পৌরাণিক সময় আসলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্র সংক্রান্ত অজস্র বিতর্কের জন্মলগ্ন— বিশ শতক।

বন্ধু পরজের খোঁজে প্রাণ বাজি রেখে অন্য গোষ্ঠীদের এলাকায় অভিযান করে সাহসী বুবন, শিবিরের নীতি অমান্য করেই। দুরু, আজিব ও নন্দকও গোষ্ঠী ছেড়ে অন্যত্র বাস করে কারণ তাদের উদ্দেশ্য ও সাধনায় গোষ্ঠীর নিয়মতান্ত্রিক কাজ বাধা সৃষ্টি করে। দুরু খুঁজে ফেরে ইতিহাস, যা জানার মাধ্যমে ভবিষ্যতকে সম্ভাবনাময় করা যাবে। আজিব চায় তিনগোষ্ঠীর মিলন আর নন্দক চায় তাদের অবলুপ্তি থেকে বাঁচাতে। পরজ বহুগামিতায় অসুখী, একক নারীর প্রতি প্রেমে সে অন্য গোষ্ঠীর সেই মেয়েকে নিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে পালিয়ে যায়। শর্ভ দার্শনিক নানা আত্মজিজ্ঞাসায় মশগুল হয়ে থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধতার যে সমধর্মী ছাঁচ, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের চরিত্ররা। যে জীবনযাত্রায় এককের প্রতি প্রেম ‘কঠিন ব্যাধি’[৬৩], সেই জীবনযাত্রার বিরুদ্ধস্বর নির্মাণ করেছেন লেখক, আর পরিবর্তে বিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তাই পরজ বলেছে, “আমি হয়তো সেই প্রাচীন পুরাণবর্ণিত কালের কোনও নিস্ফল প্রক্ষেপ।”[৬৪] এক কে একান্ত করে পেতে চাওয়া সেই আগামী পৃথিবীতে গর্হিততম বাসনা। কিন্তু তবু প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে সেই রীতি বহির্ভূত পথেই হেঁটেছে পরজ। সেই প্রেম সঞ্চারিত হয়ে নিকিও হেঁটেছে একই পথে। প্রেমই হয়ে উঠেছে নিকি ও পরজের অভিযানের প্রেরণা।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন বিশ শতকের অন্যতম জোরালো দাবি, তেমনই নিয়মতান্ত্রিকতাও বিশ শতকে দাপটের সঙ্গে থেকেছে। ফ্যাসিবাদ তথা একনায়কতন্ত্র সেই নিয়মের ফাঁস জোরদার করেই হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে। ফলে সুদূর, ক্ষয়িষ্ণু ভবিষ্যতের পটভূমিতে যে দ্বন্দ্বকে উপস্থাপন করেছেন লেখক, তা আসলে বিশ শতকের বাস্তবতা থেকেই উঠে আসা।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে হত্যার মধ্য দিয়ে আরও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের শোষণ। কেবলমাত্র ফ্যাসিবাদেই নয়, ধনতন্ত্রও তার মুনাফার জন্য চেষ্টা করে পৃথক কতকগুলি ছাঁচ বা বর্গ নির্মাণ করতে। নির্মিত সেই বর্গের কোনো না কোনো একটিতে প্রত্যেক মানুষকে খাপবন্দী করার চেষ্টা চলে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লোপাট হতে থাকে। খাপ বন্দীত্বই সেই মানুষদের মনে সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতার বোধ। শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে উৎপাদন যন্ত্রে সামগ্রিকতার বোধশূন্য হয়ে লেগে থাকা ও উৎপাদিত সম্পদের অধিকারহীনতা, মেধা ও সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ ও প্রয়োগের অভাবের মধ্য দিয়ে তৈরি হতে থাকে বিচ্ছিন্নতার বোধ। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১১-১৯৯৮) জানাচ্ছেন,

> একচ্ছত্র পুঁজিবাদের যুগে বিচ্ছিন্নতা হয়ে উঠছে ব্যাপক ও গভীর। শুধু শ্রমিকশ্রেণিকে নিঃস্ব করেই আজ একচ্ছত্র পুঁজির ক্ষুধা মিটছে না। প্রায় সর্বস্তরের অধিকাংশ মানুষের স্বার্থে সে আঘাত দিতে বাধ্য হচ্ছে। নিঃস্বতা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও তদ্দরুন বিচ্ছিন্নতা জনসাধারণের প্রায় প্রতিটি স্তরেই আজ চোখে পড়ছে।[৬৫]

পুঁজিবাদ থেকে উদ্ভূত এই বিচ্ছিন্নতার পরিসরে 'মনু দ্বাদশ' রচনা করছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলিকে দেখা যায় বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হতে। শিবিরের দৈনন্দিনতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে না থাকতে পারায় সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতাই তাদের নিজস্ব বেরিয়ে পড়াকে প্রণোদিত করেছে। এখন প্রশ্ন হল, পুঁজিবাদী সমাজে উদ্ভূত বিচ্ছিন্নতাকে আদিম গোষ্ঠীভুক্ত সমাজ ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা কতটা যুক্তিসঙ্গত? দুটি দিক দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে—

এক, উৎপাদন যন্ত্র ও সম্পত্তির মালিকানার ওপর নির্ভর করে না হলেও, অনিশ্চয়তা, অভাব, সংশয়, অজ্ঞতা এবং যূথবদ্ধতার নিয়মতন্ত্র বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি করতে সক্ষম, যা উপন্যাসে সভ্যতার আদিম স্তরে পৌঁছে যাওয়া জনগোষ্ঠীগুলির চরিত্রদের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে।

দুই, যে সময়ের কথা লেখক উপন্যাসে বর্ণনা করছেন, তা মানবসভ্যতার সম্ভাবনাময় সকাল নয়, বরং ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা শেষ প্রহর। বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়া প্রজনন ক্ষমতা ক্রমশ নষ্ট করে দেওয়ায় মানবসভ্যতার শেষতম চিহ্ন গোষ্ঠী তিনটিও অবলুপ্ত হয়ে আসছে। ফলে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য শিবিরের নিয়মানুবর্তী কাজ করায় চরিত্রগুলির মনে হতাশাক্রান্ত প্রশ্ন জেগেছে। কাজগুলি থেকে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছে তারা।

এই আধুনিক বিচ্ছিন্নতার বোধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণাকে আরও দাগিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষ নিতে দেখা গেছে কাফ্রামদের নেতামাকেও, "জানি আমাদের সমাজের ইতিহাসে স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীত্যাগের এ নিদারুণ কলঙ্ক একান্ত বিরল। এ বিচ্যুতি যখন ঘটেছে তখন তার চরম শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত কাফ্রাম সমাজ ক্ষান্ত হয়নি। আজ কিন্তু এ অপরাধও ভিন্নদৃষ্টিতে দেখবার সময় এসেছে। শুধু সংঘের স্বার্থই নয়, ব্যক্তির স্বাধীনতার মূল্যও আজ আমরা যেন বুঝি।"[৬৬] কাফ্রামদের নিয়মনীতি থেকে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষ নিচ্ছেন কেন নেতামা? কারণটা নেতামা স্পষ্ট করেছেন,

> তা ছাড়া যে প্রয়োজনে এ বিধি রচিত হয়েছিল তা আজ আর নেই।
> গোষ্ঠীকে রক্ষা করার প্রশ্নই আজ অর্থহীন। সুতরাং তার নির্মম শাসন,
> স্নেহ ও সহানুভূতিতে শিথিল করবার সময় কি আসেনি?[৬৭]

আগামীর সম্ভাবনাহীন নিশ্চিত অবলুপ্তির সামনে দাঁড়িয়েই শিবিরের রীতি রেওয়াজ থেকে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছেন নেতামা।

শর্ভের বিচ্ছিন্নতার মূলে আছে মানবসভ্যতার গতিপথ নিয়েই প্রবল সমালোচনা। মানবসভ্যতার ইতিহাস মানেই প্রবল আত্মধ্বংসী রক্তপাতের ইতিহাস। এমনকি ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়েও শেষ তিনটি গোষ্ঠী একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে, দেখা যায় উপন্যাসে। শর্ভ তাই এই মানবসভ্যতার গতি থেকেই অনুভব করে বিচ্ছিন্নতা—

> সত্য মিথ্যা কল্পনায় মেশানো কত পুরাণ, কত কাহিনি, কত ইতিহাসই তো শুনলাম। অনেক কীর্তি ছিল তার, অনেক ঐশ্বর্য, অনেক ক্ষমতা, কিন্তু সে তো শুধু নিজেকে ধ্বংস করতেই চেয়েছে চিরদিন। সেই ধ্বংসই সে হোক-না। এ পরিণামে এই অরণ্যের একটা বেশি পাতাও তার দুঃখে খসে পড়বে না জেনো।[৬৮]

মানবসভ্যতার সচলতায় আস্থা হারানো শর্ভ তাই অচলতাকেই করে তুলতে চেয়েছে সার্থক। এমনকি একবার যুদ্ধ থামালেও হিংসার বিষে জর্জর মানবসভ্যতার শেষ প্রতিনিধিরা আবারও যুদ্ধেই জড়াবে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত শর্ভ বুবনকে বলেছে, "জ্বলে মরো বুবন, জ্বলে মরো। চরম অস্থিরতার পর অচলতার উদ্দেশ আপনিই পাবে।"[৬৯] এই অচলতাকে স্থায়ী করতেই পরজ-নিকির প্রেম থেকে জন্ম নেওয়া সন্তান, মানব সভ্যতার শেষ আশাকে হত্যা করতে চায় সে। তার যুক্তি—

> ওই শিশু বেঁচে থাকলে বড় হবে, মানুষ হবে। সে মানুষ হওয়া মানে তো শুধু দেহ ও মনের ক্ষুধায় ও জিজ্ঞাসায় জর্জর হওয়া, নিরাপদ নিশ্চিন্ততার জন্যে গোষ্ঠী গড়ে তারই শাসনবন্ধনে হয় জীবন্মৃত, নয় ক্ষত-বিক্ষত হওয়া, অস্তিত্বের অর্থ খুঁজতে উদভ্রান্ত হয়ে আকাশ-ধরণী এক বা একাধিক দেবতায় ভরিয়ে তুলে তাদের দীন স্তাবকতা করা।[৭০]

বেঁচে থাকা মানেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে হত্যা, বেঁচে থাকা মানেই হিংসা-দ্বেষে নির্মম রক্তক্ষয়ে যুক্ত হওয়া জেনেই সেই শিশুর বেঁচে থাকার পথ রুদ্ধ করতে চায় শর্ভ। বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২—১৯৭০) বলেছিলেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের তাড়নাসমূহের শরীরীরূপ মাত্র। সম্পত্তি হচ্ছে অধিকার-লিপ্সার শরীরীরূপ। আর বিজ্ঞান বা শিল্পকলা স্বত্বলিপ্সার প্রকাশ। অধিকার ও স্বত্ব লিপ্সা হয় আত্মরক্ষামূলক নয় তো আক্রমণাত্মক। এর উদ্দেশ্য হয় লুণ্ঠনকারীর থেকে নিজের সম্পদ রক্ষা করা, নয়তো বর্তমান অধিকারীর কাছ থেকে সম্পদ নিজের অধিকারে ছিনিয়ে নেওয়া। উভয়ক্ষেত্রেই অন্যের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব বিরাজ করে।[৭১] মৃত ঈশ্বরের পৃথিবীতে[৭২] রিসেন্টিমেন্ট (ressentiment) তথা অসূয়া কীভাবে তৈরি করে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা তা আলোচনা করেছেন ফ্রেডরিক নীৎসে (১৮৪৪—১৯০০)।[৭৩] হিংসা ও ঘৃণা যে আধুনিক পৃথিবীর কত বড় চালিকাশক্তি তা প্রমাণ করে গেছে একের পর এক বিশ্বযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, দাঙ্গা ও গণহত্যা। মানুষের মনে তা কেমন প্রবল হতাশা সঞ্চার করতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যায় শর্ভের কথায়,

> ওই শিশু এক থেকে অগণনও যদি হয় তা হলেও তার রীতি, নীতি ধর্ম সব হবে তার লোভ, হিংসা, দম্ভ দীনতার নগ্ন বীভৎসতাকে রঙিন আচ্ছাদন দেবার ছলনা।[৭৪]

সংঘমিত্রা ঘোষ 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মনুদ্বাদশ' সম্বন্ধে কয়েকটি অনুমান' (২০১০) প্রবন্ধে বলেছেন, আধুনিক উপন্যাসের মতো নয়, সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের মতো 'উল্লাস' অর্থাৎ গ্রন্থবস্তু প্রকাশক পরিচ্ছেদে উপন্যাসটি সাজিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। শেষতম উল্লাসের নাম কৈমুতিক। কৈমুতিক ন্যায়ের 'পূর্ব বাক্যার্থের দ্বারা পর বাক্যের অর্থ, প্রবর্ত্তনা বা নিবর্ত্তনা— বিষয়ে দৃঢ়ীভূত বা সমর্থিত হয়' জানিয়েছেন সংঘমিত্রা ঘোষ।[৭৫] মনুদ্বাদশের শেষ উল্লাসে শর্ভের বক্তব্যও তো

আসলে পূর্ব ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত ও দৃঢ় হয়েছে। উপন্যাসের শেষে ভাবীকালের শিশু তিমিরকন্দরের বুকে কেঁদে উঠেছে। আকুল জিজ্ঞাসা রেখে গেছেন লেখক "তার সন্ধান সত্যই কি কেউ পাবে না?"[৭৬] শুধু একটি শিশু নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, হিংসা ও রণরক্ত বিপর্যয় মুক্ত এক মানবসভ্যতার সন্ধানের কথাই বুঝি বলতে চেয়েছেন লেখক।

ভবিষ্যতের মানব সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত এক ছবি এঁকেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'সূর্য যেখানে নীল' উপন্যাসে। লেখক জানাচ্ছেন কাল্পনিক পারমাণবিক তিনশো সাঁইত্রিশ সালে পৌঁছে মানুষ বিজ্ঞানের প্রবল উন্নতির মাধ্যমে শুক্র ও মঙ্গলগ্রহে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। দূর দূরান্তে ছায়াপথ পেরিয়ে সে নতুনতর গ্রহ-উপগ্রহে গবেষণা করতে পৌঁছাচ্ছে। এবং আরও তাৎপর্যপূর্ণ, মানুষের রক্তক্ষয়ী হানাহানির সমাপ্তি ঘটেছে। লেখক জানাচ্ছেন,

> পৃথিবীর মানুষ নিজেদের মধ্যে জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করেছে অনেক। প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর অস্ত্র আবিষ্কার ও আয়ত্ত করাই ছিল তখনকার সমস্ত রাজশক্তির একান্ত কাম্য। অ্যাটমিক যুগে মানুষের সেই যন্ত্রবল চরমে পৌঁছবার পর সেই অকারণ হানাহানির যুগ শেষ হয়েছে।[৭৭]

তখন বিশ্বশাসন সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে মানবসভ্যতাকে। জাতি ধর্মের হানাহানি পেরিয়ে এক হওয়া মানব সভ্যতা দূর নক্ষত্রপুঞ্জ থেকেও সংগ্রহ করে আনছে খনিজ। জ্ঞানবিজ্ঞানের চূড়ায় পৌঁছেছে মানুষ; কিন্তু তারা অন্যান্য গ্রহে বিবর্তনের একদম নীচের স্তরের যে সামান্য জীবনের সন্ধান পাওয়া গেছে সেখানে আধিপত্য ও অস্ত্রপ্রয়োগ করে না। মানুষের অভিযানের নৈতিকতাও পাল্টেছে।

সুদূর মহাকাশে অনুসন্ধানরত অভিযাত্রী নূরন উপন্যাসে মুখোমুখি হয় এমন এক গ্রহের, যা সম্পূর্ণতই জলমগ্ন। সেখানেই সে সন্ধান পায় এমন এক জীবের যে চিন্তাপ্রবাহের মাধ্যমে অন্যের মনকে করায়ত্ত করতে পারে। আধিপত্য করতে পারে তার মনের ওপর। অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, মানসিক চিন্তাপ্রবাহকে শৃঙ্খলিত করেই এই আধিপত্য জারি রাখে সেই গ্রহান্তরের জীব। আমাদের মনে পড়তে পারে গোটা উনিশ শতক জুড়ে সাম্রাজ্যবাদীদের অন্য দেশে আধিপত্যের সঙ্গে যেমন জড়িয়ে থেকেছে অস্ত্রের দাপট, তেমনি শিক্ষাব্যবস্থা ও ধর্মের বার্তার মধ্য দিয়েও তারা আধিপত্য করেছে মানুষের চৈতন্যে। আর এখানে চিন্তাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নূরন ও তার সঙ্গিনী থীটার ইচ্ছাশক্তি লোপ করে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করেছে সেই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান গ্রহাধিপতি। কী সেই গ্রহাধিপতির লক্ষ্য? নূরন অনুভব করে, "তিনি ধ্রুব, স্থির, অচল, কিন্তু তাঁর বিপ্লব-বন্যায় মহাকাশ প্লাবিত করে দেবে অসংখ্য তাঁর অনুগত অনুপ্রাণিত সেবক বাহিনী।"[৭৮] কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারে নূরন এ আসলে মানুষের মনোজগতের ওপর কর্তৃত্ব করে এক একনায়কত্বেরই সূচনা, যেখানে অন্য সকল মানুষ তথা প্রাণীর স্বাধীন চিন্তা বলেই কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। নূরন বুঝেছে, "দেহ নয়, এ রোগ প্রাণীজগতের মানসলোকের ভেতর দিয়ে সংক্রমিত হয়ে প্রত্যেককে শুধু পরাধীন যন্ত্রবাহনই করে তোলে না— আক্রান্ত জীবগুলি সংক্রমণের বীজাধারও হয়ে ওঠে।"[৭৯] তাই সেই একনায়কের মানসিক দখলদারির বিরুদ্ধে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে গেছে নূরন। অবশেষে মুক্তি পেয়েছে কসমো-কোর-কমান্ডের সহায়তায় যাকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বশাসন সংস্থা— বহুজাতির সম্মিলিত ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এভাবেই একনায়কত্বের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের, নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন লেখক 'সূর্য যেখানে নীল' উপন্যাসটিতেও। মানবসভ্যতার অবলুপ্তি এবং মানবসভ্যতার

উৎকর্ষের দুই পৃথক চেহারার উপন্যাস হলেও লেখকের নৈতিক অবস্থান একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ‘মনু দ্বাদশ’ ও ‘সূর্য যেখানে নীল’-এ।

ঘনাদা সিরিজ:

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ। গোটা পৃথিবীকে প্রবল ধ্বংসের ও হত্যার সাক্ষী করে রেখে শেষ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৫-এর ৬ ও ৯ আগস্ট, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর বিধ্বস্ত জাপান মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে চার থেকে পাঁচ কোটি মানুষ। আর বাংলা প্রদেশ এই বিগত বছরগুলিতে সাক্ষী থেকেছে প্রবল দুর্ভিক্ষের। অমর্ত্য সেনের মতে, এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ বিরাট সংখ্যক মানুষের বাজার থেকে খাবার সংগ্রহ করার ক্ষমতা বা এনটাইটেলমেন্ট (entitlement) হারিয়ে ফেলা।[৮০] ১৯৪৫ সালেও সেই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা বাংলার মানুষ কাটিয়ে ওঠেনি। আর অন্যদিকে তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চ তোলপাড় হচ্ছে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও মতাদর্শগত তর্ক-বিতর্কে। এরই মধ্যে বাংলা প্রদেশজুড়ে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করতে করতে গ্রামাঞ্চলে প্রভাব বেড়েছে কমিউনিস্টদের। অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী অবস্থানের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও কমিউনিস্টরা পেয়েছে অভূতপূর্ব সাড়া। সুমিত সরকার জানাচ্ছেন, “ফ্যাসি-বিরোধী জনযুদ্ধের স্লোগান জনগণের (বিশেষত চাষীদের) কাছে যতই অবোধ্য হোক না কেন, বিশ্ব-ঘটনাবলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বুদ্ধিজীবীদের কাছে এর সত্যিই একটা আবেদন ছিল। আর এই সময়টাতেই কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর মার্কসবাদের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়ে।”[৮১] এই প্রখর বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে

সুদূর কাল্পনিক পটভূমিতে বাস্তবচ্যুত অভিযানের ভাবনা বিসদৃশ লাগারই কথা। অথচ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি তখন শিশু-কিশোরদের কাছে আদৃত এক সাহিত্য-বর্গ হয়ে উঠেছে।

এমন এক অভিনব কৌশলে অভিযান কাহিনি শোনালেন প্রেমেন্দ্র মিত্র যার ফলে অভিযান-কাহিনি নিজেই হয়ে উঠল বাঙালির বাস্তবতা-বর্জিত কল্পনাবিলাসের চমৎকার বিদ্রূপ। সৃষ্টি করলেন ঘনশ্যাম দাস তথা সুবিখ্যাত ঘনাদা চরিত্রটি। দেব সাহিত্য কুটিরের ১৩৫২ বঙ্গাব্দের পূজা বার্ষিকী *আলপনা*-তে প্রকাশিত হল ঘনাদা সিরিজের প্রথম গল্প 'মশা'। পাঠক পরিচিত হল এমন এক চরিত্রের সঙ্গে যিনি আসলে গলির ছোট্ট মেসে বসে অন্য মেস-সদস্যদের টাকায় ভুঁড়িভোজন করেন ও তাদের থেকেই ধারে সিগারেট খান। অসামান্য বাগ্মীতায় বিজ্ঞান ও ইতিহাস আশ্রিত নানা অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি বলেন ঘনাদা যার মূল নায়ক তিনি নিজেই। কথকের বক্তব্য, "শুধু এইটুকু মেনে নিয়েছি যে গত দুশো বছর ধরে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তিনি যাননি, হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই।"[৮২] 'মশা' গল্পেই তিনি সামান্য মশা মারার কথা থেকে সাখালীন দ্বীপে পাগল বৈজ্ঞানিক নিশিমারা কীভাবে মশার লালার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে মশাকে জৈব-অস্ত্রে পরিণত করেছিল আর কীভাবে তার হাত থেকে ঘনাদা ও তার সঙ্গী রক্ষা পায়, সে বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। লেখকের বয়ান কৌশলেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে আসলে মেস ছেড়ে বিশেষ নড়তে না চাওয়া ঘনাদার এই দূর দূরান্তের অভিযানের গল্প শোনানো আসলে ধাপ্পা ছাড়া কিছুই নয়। বাঙালির অভিযান কাহিনি ও তা নিয়ে মাতামাতি যেন আসলে একটা ধাপ্পাই, গুলবাজ ঘনাদার নিজেকে জাহির করার হাস্যকর প্রচেষ্টার মতোই তা যেন বাঙালির কষ্টকল্পিত বাস্তবতাহীন প্রয়াস— অভিযানের কাহিনি শোনাতে শোনাতে এই বিদ্রূপই নির্মাণ করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ঘনাদার এই গালগল্প শুনিয়ে নিজেকে জাহির করার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, বাহাদুরি নেওয়ার জন্য

মানুষের বাড়িয়ে বলা ও বানিয়ে বলার চল মানুষের মুখে যখন থেকে কথা ফুটেছে সেই সময় থেকেই রয়েছে। সহজ একটি উপমায় বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র,

> সেই কোন আদ্যিকালে প্রথম যে গোদা লেজ-খসা গেছো বাঁদর গাছের ডাল ছেড়ে মাটিতে নেমে একটু খাড়া হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে দু-এক পা হেঁটেই মাটিতে কেতরে পড়েছিল, সেও বোধহয় তার সঙ্গী-সাথীদের কিছু অঙ্গভঙ্গি আর কিচির-মিচির ঘোঁৎঘোঁতানি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে চার পায়ের বদলে দু পায়েই সোজা হয়ে দাঁড়ানো আর হাঁটা তার কাছে দাঁত কিড়মিড়ির মতোই সোজা। ঘনাদাকে পাবার জন্যে খুব বেশি খোঁজাখুঁজির হয়রানী তাই হয়নি। মানুষের চিরকেলে স্বভাবই নতুন কালের ধড়া-চূড়া পরে ঘনাদা হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।[৮৩]

এই বক্তব্যের নিরিখে আমরা বাংলা অভিযান সাহিত্যে ঘনাদার উপস্থিতিটি উপলব্ধি করতে পারি। বাঙালির বাস্তববর্জিত অভিযান সাহিত্যের স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে কেতরে পড়াই কী ঘনাদার বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে 'দাঁত কিড়মিড়ির মতোই সোজা' বলে মুখব্যাদান করে না? পরিস্থিতির সঙ্গ না দেওয়া বাংলা অভিযান কাহিনির বিদ্রূপ হয়েই আসলে পরিবেশিত হয়েছে ঘনাদা সিরিজ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন,

> ঘনাদা নিয়ে প্রথমে 'মশা' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। ভেবেছিলাম তাঁকে নিয়ে আর লিখব না। কিন্তু পাঠকদের কাছ থেকে এত চিঠি আসতে লাগল যে, বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির ঘনাদা আর আমি কেউ পালাতে পারলাম না।[৮৪]

পাঠকের অনুরোধেই এরপর ঘনাদার একের পর এক ধাপ্পা-কাহিনি লিখে গেছেন ঘনাদা। অধিকাংশ কাহিনিগুলিই ছোট-বড় গল্প। তবে পাশাপাশি চারটি উপন্যাসও লিখেছেন ঘনাদাকে নিয়ে— ‘সূর্য কাঁদলে সোনা’ (১৯৫৩), ‘মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা’ (১৯৭৩), ‘তেল দেবেন ঘনাদা’ (১৯৭৮), ‘মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা’ (১৯৮৬)। গল্প ও উপন্যাসগুলি মিলিয়েই তিনি নির্মাণ করে গেছেন ঘনাদার চরিত্র। প্রথম গল্পে ঘনাদার পরিচয়ের যেটুকু অস্পষ্টতা ছিল, পরবর্তী গল্পগুলিতে তা কেটে যেতে থাকবে। ষষ্ঠ গল্প ‘টুপি’তে পৌঁছে ঘনাদার মেসের ঠিকানা, বাহাত্তর নম্বর বনমালি নস্কর লেন জানতে পারবে পাঠক। তেমনই গল্প থেকে গল্পান্তরে যেতে যেতে পাঠক বুঝতে পারবে ঘনাদা এই গুল, ঢপ বা ধাপ্পা দেওয়া গল্পগুলি ফাঁদেন আসলে নিজের কিছু স্বভাবগত ভীরুতাকে বা অকর্মণ্যতাকে ঢাকতে বা অন্যদের সামনে নাজেহাল হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে। যেমন ‘পোকা’ গল্পে একটা সামান্য পোকার ভয়ে অমানুষিক চিৎকার করে দৌড়ঝাঁপ শুরু করার পর অন্যদের কাছে হাসির পাত্র যাতে না হতে হয় তার জন্যই জ্যাকব রথস্টাইন নামের এক ইহুদি বিজ্ঞানী পঙ্গপালের বাহিনী নির্মাণ করে পোকাদের মাধ্যমে কীভাবে দুর্ভিক্ষ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল ও কীভাবে তা ঘনাদা ভেস্তে দেন, সেই গল্প শুনিয়েছেন। কিংবা ‘কাঁচ’ গল্পে, বক্সিং-এর রেফারি হবার ভয়ে খাটের তলায় আশ্রয় নেওয়া ঘনাদা, সকলের সামনে অপমানিত হওয়ার থেকে বাঁচতে একটি কাঁচের টুকরো নিয়ে খাটের তলা থেকে বেরোন এবং তারপর গল্প ফাঁদেন কীভাবে এই কাঁচের টুকরোর দ্বারা বিহে উপত্যকায় আগুন ধরিয়ে তিনি নাৎসী জার্মানির প্রতিনিধিদের ইউরেনিয়াম পাওয়া তথা অ্যাটম বোমা বানানো আটকে দিয়েছিলেন। এইরকম উদাহরণের সংখ্যা অনায়াসেই আরো বাড়িয়ে চলা যায়। আসলে মিথ্যা বাগাড়ম্বরই যে করে চলেছেন ঘনাদা, সত্যকারের অভিযাত্রী যে তিনি

নন, বাঙালির অভিযান কাহিনির মতোই যে কপট তাঁর অ্যাডভেঞ্চার, তা স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক।

প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজে ঘনাদার গল্পকে 'tall tales' বলেছিলেন।[৮৫] কেমব্রিজ ইংলিশ ডিকশনারি অনুসারে 'tall tales' বলতে বোঝায় 'a story or fact that is difficult to believe.'[৮৬] বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব তৈরি করার মূল উপাদান কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যগত ভ্রান্তি নয়, কিংবা মিথ্যা, অস্তিত্বহীন ভৌগোলিক পটভূমি নয়। তথ্যগত জায়গায় প্রেমেন্দ্র মিত্র চেষ্টা করেছেন যতদূর সম্ভব নির্ভুল থাকার। বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব তিনি নির্মাণ করেছেন সেইসব দূর দূরান্তের বিপদসংকুল অভিযানে বাঙালি, বাগাড়ম্বর সর্বস্ব ঘনাদাকে অংশভুক্ত করে এবং তাকেই নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করে। বাঙালি অভিযান নায়কের কাহিনি বর্ণনা করতে করতে তাকে অবিশ্বাস্য করে তোলাটা যখন বাঙালি অভিযান নায়কের উপস্থিতির ফলেই সম্ভব হয়, তখন বিদ্রূপটি ব্যক্তি অভিযান নায়ক তথা ঘনাদার ওপর বর্ষিত হয় না, বর্ষিত হয় বাস্তবতা থেকে মুখ ফেরানো বাঙালির অভিযান ভাবনার ওপরেই।

যে বাস্তবতার বোধ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র অভিযান কাহিনির প্রতি কৌতুকের মোড়কে ছুঁড়ে দেবেন বিদ্রূপ, সেই বাস্তবতার ধারণা বাংলায় সঞ্জাত হয়েছিল *কল্লোল* পত্রিকার মাধ্যমে, যা কেবলমাত্র একটি পত্রিকা হয়েই থাকেনি, হয়ে উঠেছিল নতুনতর সাহিত্য আন্দোলনের অভিজ্ঞান। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলবেন, "তথাকথিত 'বস্তুনিষ্ঠা' বা Realism এর দিকে প্রবল ঝোঁক। 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'বসুমতী', 'বঙ্গবাণী', ইত্যাদি সমকালীন পত্রিকায় যে 'বাস্তব' প্রবণতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল, 'কল্লোলগোষ্ঠী' তাকেই আরও তীব্র, তীক্ষ্ণ করে তুললেন।"[৮৭] যদিও সেই বাস্তবতার ধারণায় অনেক খামতি ছিল বলে মনে করেছেন গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, তবু বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্তত বাস্তবতার পরিচয় তিনি স্বীকার

করে নিয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) বলেছেন, "কল্লোলের বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রে ছিল না, ছিল বর্ণনার ক্ষেত্রে। ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চেহারায়।"[৮৮] প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন এই কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে অন্যতম। এই কল্লোল সাহিত্য আন্দোলনের পিছনেও কাজ করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব। স্বদেশী আন্দোলন শেষ হতে না হতেই প্রথম মহাযুদ্ধের ঝড় বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছিল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার মাধ্যমে। পাশাপাশি যুদ্ধে সাহায্য করলে স্বরাজ লাভের যে আশা দেখানো হয়েছিল, তাও ভেঙে গিয়েছিল অচিরেই। সমস্ত মিলিয়ে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছিল বাঙালি লেখকদের মধ্যে। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলবেন, "কেবল সাহিত্য সম্পর্কে নয়, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, নৈতিক চেতনা— এককথায় সমগ্র জীবন সম্পর্কে এক সংশয়-পীড়িত মূল্যবোধ দেখা দিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালপর্বে।"[৮৯] ১৯২৯ সালে *কল্লোল* পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলেও তার চেতনা রয়ে গিয়েছিল লেখকদের মনে। সেই বাস্তবতার বোধ থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধক্লান্ত, মন্বন্তরে ধ্বস্ত বাংলায় অভিযান কাহিনি আসলে যে হাস্যকর বাকসর্বস্বতা তা ফুটিয়ে তুলতে দ্বিধা করেননি প্রেমেন্দ্র মিত্র।

বাস্তব সচেতন বিদ্রূপসহই অভিযান কাহিনি লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বাস্তব সচেতনতার কারণেই ঘনাদা সিরিজের ছদ্ম অভিযান কাহিনিতেও স্পষ্ট রেখেছেন তার রাজনৈতিক নীতিগত অবস্থান। 'পোকা' গল্পে নাৎসীদের প্রবল জাতিবিদ্বেষ ও ইহুদি নির্যাতনের মাধ্যমে কীভাবে হিংস্র হয়ে উঠেছে জ্যাকব রথস্টাইন, পঙ্গপালের বাহিনী দ্বারা খাদ্যশস্য নষ্ট করিয়ে দুর্ভিক্ষের আয়োজন করেছে পৃথিবী জুড়ে তার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক, ফ্যাসিবাদ বিরোধী অবস্থান বজায় রেখেই। 'কাঁচ' গল্পে জার্মানির অ্যাটম বোমা তৈরিতে বাধ সেধেছেন ঘনাদা, একই অবস্থান থেকে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যেখানে যেখানে মানবসভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছে সেখানে

সেখানে মানবতার পক্ষই নিতে দেখে গেছে ঘনাদাকে। 'মশা' কিংবা 'টল' গল্পে অনায়াসেই আমরা সে উদাহরণ পাব। হোক না সেসব ঘনাদার মিথ্যা বাগাড়ম্বর, তাতেও কিন্তু নৈতিকভাবে ধ্বংসাত্মক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষ নিতে ভুলচুক হয় না ঘনাদার। আবার ইতিহাস-বিস্মৃত অতীতের যেসব কাহিনি *ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস*-এ শোনান প্রেমেন্দ্র মিত্র, ঘনাদার বাগাড়ম্বর সেখানেও যথোপযুক্ত ভঙ্গিমায় উপস্থিত থাকলেও গতানুগতিক ইতিহাস চর্চার বাইরে শাসকের ষড়যন্ত্র ও শোষণের, ইউরোপের সাম্রাজ্যলোলুপ অত্যাচারের সর্বোপরি ইতিহাসের ইউরোপকেন্দ্রিকতার (Eurocentrism) সমালোচনা হয়ে ওঠে সেসব কাহিনি।

ঘনাদা-সিরিজের অধিকাংশ কাহিনি ছোটগল্প আকারে পরিবেশিত হলেও উপন্যাসও রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে *অমৃত* পত্রিকায় ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ৪ শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'সূর্য কাঁদলে সোনা' উপন্যাসটি। স্পেনের অভিযাত্রী ফ্রান্সিসকো পিজারোর (১৪৭৮—১৫৪১) পেরু অভিযান ও ইনকা সাম্রাজ্য ধ্বংসের ইতিহাস ও কল্পনা আশ্রিত উপন্যাস সূর্য কাঁদলে সোনা। এ উপন্যাসের গল্প তথা *ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস*-এর কাহিনিগুলি কিন্তু মেসের ঘরে বসে বলা নয়। কলকাতার এক কৃত্রিম জলাশয়ের ধারে বিকালের আড্ডায় বসে শোনানো। শ্রোতারাও সেখানে প্রবীণ নাগরিক। শ্রোতাদের মধ্যে যেমন আছেন ভোজনবিলাসী রামশরণবাবু, মেদভারে বিপুল সদাখুশি ভবতারণবাবু, তেমনি আছেন ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাবু। শিবপদবাবুর উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক বিশেষণ হিসেবে বারবার ব্যবহার করবেন 'মর্মরের মত মস্তক যার মসৃণ, ইতিহাসের অধ্যাপক সেই শিবপদবাবু'।[৯০] প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসচর্চার ধারার বিরুদ্ধাচারণ করে বিকল্প দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখাবেন বলেই ইতিহাসের অধ্যাপক সম্পর্কে এই ঠাট্টাটুকু

অব্যাহত রেখেছেন লেখক। সুদীর্ঘ উপন্যাসজুড়ে স্পেনের অভিযাত্রীদের দক্ষিণ আমেরিকা তথা পেরু আবিষ্কার, সোনার দেশের অনুসন্ধান এবং সেখানের আদি বাসিন্দাদের ওপর প্রবল অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। পাশাপাশি স্পষ্ট করেছেন সেইসময়ের রাষ্ট্র ও অভিযাত্রীর সম্পর্ক।

রাষ্ট্রের শাসক ও অভিযাত্রীর সম্পর্ক যেন চুক্তিমাফিক লেনদেনের। অভিযাত্রী পাবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে ছাড়পত্র ও অভিযানের প্রাথমিক রসদ। রাষ্ট্র পাবে নতুন খুঁজে পাওয়া ভূখণ্ড থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের ভাগ। তার সঙ্গে বাড়তে পারে সাম্রাজ্যও। পাশ্চাত্যে অভিযাত্রী ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের মূলগত কাঠামোটা এইরকম হলেও, উনিশ শতকে শিল্পবিপ্লবে ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সমৃদ্ধ ইউরোপের তুলনায় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইউরোপে অভিযান এতটা সহজ ছিল না। স্পেনের মতো শক্তিশালী রাষ্ট্র অভিযানের মাধ্যমে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে উদ্যোগী হলেও অনিশ্চিত সেইসমস্ত অভিযানে অসীম লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় করতে সম্মত হতো না সর্বদা। ঘনাদা তার কাহিনি বর্ণনার মধ্যে জানিয়েছেন, "অভিযাত্রীদের উৎসাহ দেবার জন্যে স্পেনের ব্যবস্থা বড় চমৎকার। নিজের রাজকোষ থেকে স্পেন একটি পয়সা খরচ করবে না। ধনপ্রাণ পণ করে যদি কেউ নতুন দেশ আবিষ্কার আর জয় করতে পারে সম্রাটের নামে তাহলে তারই সম্পদের ছিটেফোঁটা তাকে দেওয়া হবে অনুগ্রহ করে। সেই সঙ্গে গালভরা লম্বা লম্বা খেতাব বিলোতেও স্পেন সরকার মুক্তহস্ত।"[৯১] তবু ভাগ্যান্বেষী অভিযাত্রী, যারা স্পেন তথা ইউরোপে প্রতিপত্তির শিখরে উঠতে পারেনি, অথচ স্বপ্ন এবং স্বপ্ন সফল করার জেদ যাদের দুর্বার তেমন লোকজনের অভাব হয় না স্পেনে। তাদের তাহলে অভিযানের খরচ জোগায় কারা? মহাজনরা। অভিযাত্রীদের তারা অর্থ ধার দেয় অভিযান সফল হলে বহুগুণে তা ফেরত পাওয়ার আশায়। কিন্তু অভিযান সর্বদা সফল হয় না। উপন্যাসে দেখা যায় আমেরিকা আবিষ্কারের পর সেই

মহাদেশের আরও গভীরে আরও দক্ষিণে যাওয়ার জন্য উৎসাহ তৈরি হলেও মহাজনরা ক্রমশ হাত গুটিয়ে নিয়েছে। কারণ কিংবদন্তী শুনে যে বিপুল মুনাফার আশা তারা করেছিল, তার ফল বিশেষ মেলেনি। তাছাড়া অভিযানে টাকা ঢালার ক্ষেত্রে কতদিনে সে অভিযান সফল হয়ে লাভের বখরা মিলবে তার কোনো হিসেব থাকে না। অভিযাত্রী বেঁচে নাও ফিরতে পারে। "তাদের আরম্ভ করা অভিযান হয় সফল হবে, কিন্তু ভিন্ন লোকের হাতে। তারা আমলই দেবে না আর কারুর সঙ্গে আগেকার কোন চুক্তিকে।"[৯২] তাই উপন্যাসে আমরা দেখি পানামায় অভিযানের অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে ঘনরাম দাস তথা গানাদো অর্থাৎ ঘনাদার পূর্বপুরুষেরই বুদ্ধিতে পিজারো অনুগ্রহ চেয়েছে স্পেন সম্রাটের। সেখান থেকে নতুন দেশ আবিষ্কার ও জয় করবার অধিকার পিজারোকে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খরচের ভার বহন করার দায়িত্ব নিয়েছে স্পেন সরকার এবং নতুন প্রদেশের গভর্নর ও ক্যাপটেন জেনারেল হওয়ার স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে পিজারোকে। অবশ্য 'কাউন্সিল অফ ইন্ডিজ' অর্থাৎ নতুন মহাদেশে সংক্রান্ত সব কিছু যারা সম্রাটের হয়ে তত্ত্বাবধান করে তাদের নজরদারিতেই অভিযান করতে হবে পিজারোকে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে অভিযান ব্যক্তিগত উৎসাহের ব্যাপার কেবল ছিল না, ছিল সাম্রাজ্যবিস্তার ও অর্থনীতির জটিল অঙ্কের ওপর দাঁড়ানো এক কর্মকাণ্ড। নিছক রোমহর্ষক উত্তেজনা নয়, রাজনৈতিক এক জটিল প্রক্রিয়া।

উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই, পিজারো একাধিকবার সোনার দেশ খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। ব্যর্থও হয়েছেন। সুমিতা দাস তার *কলম্বাসের পর আমেরিকা* (২০১৫) গ্রন্থে জানাচ্ছেন, ১৫১৩ সালে অভিযানে বেরিয়ে পিজারো প্রথম পেরু দেশের সোনার কথা জানতে পারেন। এরপর ১৫২১ সালে নতুন অভিযান চালানোর জন্য তিনি 'কোম্পানি অফ দ্য লেভান্ত' নামে সংস্থা নির্মাণ করেন। তারপর সোনার দেশের সন্ধানে অভিযানে যান। সঙ্গী হয় দিয়েগো দে

আলমাগরো (১৪৭৫—১৫৩৮)। কিন্তু ১৫২৪ সালে তাকে খালি হাতে পানামায় ফিরতে হয়। এরপর ১৫২৬ সালে আবার অভিযানে গিয়ে পিজারো বালসা কাঠের সুবিশাল ভেলা ও তাতে সোনা সহ মূল্যবান সামগ্রী দেখে উন্নত এক সভ্যতার হদিশ পান। উপন্যাসেও এসবই অভিযানের প্রতিকূলতার কথা বলতে বলতে বিবৃত করেছেন লেখক। সুমিতা দাস জানাচ্ছেন, ১৫২৮ সালে প্রথম পেরুর উপকূলে পৌঁছায় পিজারোর জাহাজ ও সেখানে বন্ধু সুলভ আতিথেয়তা পায়। সেখানে ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি দেখতে পায় পিজারো। এই আবিষ্কৃত সূর্যের দেশের সুবৃহৎ নগরীগুলি দখল করার মতো সামর্থ্য না থাকলেও পেরুর উপকূলের জায়গা সম্পর্কে পিজারো ঘোষণা করেন, "আমাদের প্রভু সম্রাট ও কাস্তিলের রাজমুকুটের নামে আমি আমাদের আবিষ্কৃত এই দেশ ও অন্য সব কিছুর দখল নিচ্ছি।"[৯৩] সাধ্য না থাকলেও দখলদারির মানসিকতা যে পিজারোর বরাবরই ছিল তা উপন্যাসের বয়ানেও আমরা স্পষ্ট দেখি। পেরু পৌঁছানোর আগেই পিজারোর অভিযান সম্পর্কে ঘনাদা বলেছেন, "সসৈন্যে তীরে নেমে কোথাও লুঠপাঠ করে, কোথাও ভদ্রভাবে বিনিময় করে সোনাদানার জিনিস ও অলঙ্কার যা তাঁরা সংগ্রহ করেছেন তা চোখ ধাঁধাবার মতো।"[৯৪]

১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে ফেরে পিজারো। রাজা পঞ্চম চার্লসের (১৫০০—১৫৫৮) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার পর ১৫৩২ সালে পেরু দখল করতে যায় পিজারো। উপন্যাসে বর্ণিত আছে স্পেনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিজারোর গ্রেপ্তার হওয়ার বৃত্তান্ত। দীর্ঘকাল আগে অভিযানের জন্য সংগৃহীত দেনার দায়ে তাকে গ্রেপ্তার হতে হয়। সেইসময় অভিযাত্রীদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার চেহারাও ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক,

> বিশেষ করে জীবনমরণ তুচ্ছ করে যারা নতুন মহাদেশ আবিষ্কারে সর্বস্ব পণ করছে তাদের প্রতি মুগ্ধ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তখন এত বেশী যে

কোনো মহাজনের হাতে তাদের একজনের নিগ্রহ জনতাকে ক্রমশঃ অস্থির করে তুলেছে।[৯৫]

অভিযান নায়কদের ইতিহাস জুড়ে প্রশস্তিই উচ্চারিত হয়েছে চিরকাল। ঔপনিবেশিকদের কাছে তারা শ্রদ্ধা ও সম্মানই পেয়ে এসেছে; কিন্তু বিজিত উপনিবেশগুলিতে কী ভূমিকা তারা পালন করেছে, কেমন প্রবল অত্যাচার তারা নামিয়ে এনেছে সে কথায় নিশ্চুপ থেকেছে ইউরোপ-কেন্দ্রিক ইতিহাস। ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাবুকে ‘মর্মরের মতো মসৃণ যার মস্তক’ বলে ঠাট্টা করা সেই কারণে সামগ্রিক ইতিহাস লিখন চর্চাকেই বিদ্রূপ করা হয়ে ওঠে। বিকল্প ইতিহাসের পাঠ দিতে থাকেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘সূর্য কাঁদলে সোনা’তে। সেখানে দক্ষিণ আমেরিকার সরল আদি-বাসিন্দাদের ওপর পিজারো তথা স্পেনের শ্বেতাঙ্গ অভিযাত্রীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার বর্ণিত হয়। ঘনাদা বলবেন, “এই ফ্রানসিসকো পিজারোর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সৈন্যরাও অসাধ্য সাধন করে। অসাধ্য সাধন অবশ্য নিজেদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক গুণ বেশী দেশোয়ালীদের মারকাট আর লুটতরাজ।”[৯৬] আবিষ্কৃত জনপদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে শোষক ও শোষিতের। ফলে সেখানকার সাধারণ অধিবাসীদের মোহভঙ্গ হয়েছে— “এর আগের বার অজানা শ্বেতাঙ্গ এই বিদেশীদের লোক দেবতার মত অভ্যর্থনা করেছে। এবারে সেই দেবতার আসল পরিচয় ধরা পড়ে গেছে অনেকের কাছেই।”[৯৭] শ্বেতাঙ্গদের লোলুপ পরিচয় না জানা থাকায় তাদের কাছে পিজারোদের এই হীন তান্ডব বিস্ময়াতীত লাগে। ঘনাদা বলছেন,

কারুর কোন ক্ষতি তারা যখন করেনি তখন তাদের ভয় করবার কিছু নেই এই বিশ্বাসে তারা সরল আন্তরিকতার সঙ্গে গৌরাঙ্গ বিদেশীদের তাদের বসতিতে স্বাগত জানায়। কিন্তু বিদেশীরা এ প্রীতির জবাব দেয়

খোলা তলোয়ার নিয়ে তাদের তাড়া করে তাদের ঘরবাড়ি যা কিছু সব লুটেপুটে নিয়ে।[৯৮]

ফলে ক্রমশ পিজারোরা বাধা পেয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে। রক্তনদী বইয়ে দিয়ে পিজারোরা জয় করতে করতে গেছে নতুন আবিষ্কৃত ভূখণ্ড। পেরুর সম্রাট তথা ইংকা আতাহুয়ালপাকে (১৫০২–১৫৩৩) বন্দী করার ক্ষেত্রেও ভয়ংকর মিথ্যাচারের ও গণহত্যার সাহায্য নিয়েছিল পিজারো। নির্মম সেই ষড়যন্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন লেখক।

এই সমগ্র হত্যাকান্ড ও সাম্রাজ্য বিজয়ের মূল লক্ষ্য ছিল সোনা। পেরুতে সেইসময় সোনার ছড়াছড়ি। সূর্য উপাসক ইংকাদের কাছে সোনা হল সূর্য দেবের চোখের জল। সেখান থেকেই উপন্যাসটির নাম ‘সূর্য কাঁদলে সোনা’। তবে শুধু কী তাই? সোনার দেশ পেরু স্পেনীয় সভ্যতাগর্বীদের পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠেছিল বিষাদেরও দেশ। ‘কাঁদলে’ শব্দের ব্যঞ্জনায় সেই পরাধীন ও দখলীকৃত হওয়ার যন্ত্রণাও ধরে রেখেছেন লেখক। সূর্য কাঁদলে সোনা জমে ওঠে পেরুতে। আর পেরুবাসীদের চোখের জল ঝরিয়ে সোনায় ভরে ওঠে ইউরোপ। ইউরোপের কাছে তখন সোনা মানে বিপুল অর্থ-সম্পদ। সুমিতা দাস জানাচ্ছেন ইউরোপে সেইসময় চার পাউন্ড সোনা দিলে একটি জাহাজ কিনতে পারা যেত। স্পেনীয়রা পেরু থেকে প্রতিদিন আদায় করতে থাকে তিনশো থেকে ছয়শো পাউন্ড সোনা।[৯৯] এই বিপুল সোনার লুঠের সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দেওয়া হতে থাকে পেরুর নিজস্ব উন্নত সংস্কৃতি। প্রযুক্তিতে যে উন্নত ছিল পেরু তার বর্ণনা উপন্যাসেও মেলে, “পথও বেশ দুর্গম। তবে ইংকা স্থপতিরা সেখানে পাহাড় কেটে পথ বানাবার এমন আশ্চর্য বাহাদুরী দেখিয়েছেন, তখনকার ইউরোপে অন্তত যার তুলনা ছিল না।”[১০০] ইউরোপের সভ্যতাগর্বী ধারণা আসলে যে কতটা ভ্রান্ত, উপনিবেশগুলির

নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতারও যে ছিল স্বতন্ত্র গতিপথ যা রুদ্ধ হয়েছে ইউরোপের ঔপনিবেশিক চাপে তা বুঝিয়ে গিয়েছেন লেখক উপন্যাস জুড়ে।

পিজারো তাই এই উপন্যাসের নায়ক নয়। নায়ক ঘনাদার পূর্বপুরুষ ঘনরাম দাস তথা গানাদো। যার বুদ্ধিবলে সব বাধা কাটিয়ে পিজারোরা পৌঁছাতে পেরেছে পেরুতে, কিন্তু স্পেনীয়দের ভয়াবহ এই অত্যাচার ও শঠতা দেখার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রতিকারের চেষ্টা করতে থেকেছে সে। ঘনাদা তার গল্পে শুনিয়েছেন, "কাকসামালকা শহরে কিছুক্ষণ আগে যে হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র হাত নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও এই অবিশ্বাস্য পরিণামের নিমিত্তমাত্র হিসাবেও তাঁর কিছুটা দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না।"[১০১] তাই একদিকে যেমন ঘনরাম তথা গানাদো পেরুবাসীদের উপাস্য ভীরাকোচা দেবতা সেজে নারীলোলুপ স্পেনীয় সৈন্যদের শাস্তি দিতে থেকেছে, অন্যদিকে আতাহুয়ালপাকে মুক্ত করার পরিকল্পনা নির্মাণ করেছে। যদিও বাস্তবে আতাহুয়ালপার শেষপর্যন্ত স্পেনীয়দের হাতে মৃত্যুই ঘটেছিল। সুমিতা দাস জানাচ্ছেন "বন্দি করার আট মাস পর বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুক্তিপণ দেওয়ার পরও শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হল ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপাকে।"[১০২] তার আগেই অবশ্য উপন্যাসের প্লট বদলেছে। গানাদো তার সঙ্গিনীকে নিয়ে পেরু ত্যাগ করেছে স্পেনীয় সৈন্যদের বোকা বানিয়ে।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে গানাদোর বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, সাহস ও শক্তির নানা নজির তৈরি হয়েছে। নেপথ্যে থেকে গানাদোই হয়ে উঠেছে পেরু অভিযানের প্রধান নায়ক। তবে হিংস্র অর্থলোভী স্পেনীয়দের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেই দেখা গিয়েছে তাকে। ডন মোরালেসকে উদ্দেশ্য করে সে জানিয়েছে,

> স্পেনের আমি শত্রু নই, অবিচার অন্যায় নীচতা দম্ভ পাশবিকতা লোভ, পৃথিবীর সব সাধারণ মানুষের মতো আমি শত্রু শুধু এই সব কিছুর। নতুন আশ্চর্য এক দেশ আবিষ্কৃত হোক আগ্রহভরে আমি তা চেয়েছিলাম, সে আবিষ্কারের পথ এমন পৈশাচিকতায় নোংরা, রক্তে পিচ্ছিল হবে আমি ভাবতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত যথাসাধ্য তাই এ পাপের অভিযানে বাধা দিতে চেষ্টা করেছি।[১০৩]

গানাদোর এই অবস্থান যেন অভিযান সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নীতিগত অবস্থানের পরিচয়। নতুন আবিষ্কৃত দেশের প্রতি কেমন হওয়া উচিত ছিল আবিষ্কর্তাদের ব্যবহার তার পরিচয়ই তিনি এঁকে দেন গানাদোর মাধ্যমে। তাই গানাদোকে আমরা দেখি পেরুর নানা উপভাষাকে আয়ত্ত করতে, সেখানের মিথ, ধর্মাচার, লোক বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে সশ্রদ্ধ আগ্রহ ভরে জানতে, সেখানকার মানুষদের বিপদে পাশে দাঁড়াতে, সেখানের সুন্দরী নারীর প্রতি যৌন লালসায় নয়, প্রেমে মুগ্ধ হতে।

নীতিগত অবস্থানে বিজয়ী নয়, বিজিতের পক্ষ, শাসক নয় শোষিতের পক্ষই নিতে দেখা গেছে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। 'সূর্য কাঁদলে সোনা'তে যেমন, তেমনই এই উপন্যাসের পূর্বকাহিনি 'দাস হলেন ঘনাদা'তেও। বিজিত ও নিপীড়িতের পক্ষ নিতে যাতে ভুল না হয়ে যায় কখনো, চিরকাল যাতে উত্তরসূরি মনে করে রাখে ইতিহাস, তাই একদা পর্তুগীজদের মাধ্যমে বাল্যাবস্থায় ইউরোপে ক্রীতদাস হিসেবে চালান হওয়া ঘনরাম তথা গানাদো যখন মুক্তি পান ক্রীতদাসত্ব থেকে, তখন নিজেই চেয়েছিলেন, "আমার বংশ যদি ভবিষ্যতে থাকে তাহলে এ ইতিহাস চিরকাল স্মরণ করাবার জন্যে পদবী দিন দাস।"[১০৪] শোষিত দাসত্বের ইতিহাস তিনি স্মরণ করিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন উত্তরপ্রজন্মকে, যাতে শ্রেণিগত পক্ষ নিতে ভুল না হয় কখনো। এ ইতিহাস গর্বের সঙ্গে বলেছেন যে উত্তরসূরি ঘনাদা তারও পক্ষ নির্বাচনে ভুল যে নেই তাও

স্পষ্ট হয়ে যায়। ‘সূর্য কাঁদলে সোনা’ লেখার ছয়-সাত বছর আগে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন ‘সুতো’ নামের ঘনাদা সিরিজের একটি গল্প। সে গল্পে পেরুর ইতিহাস চর্চা তখনও হয়তো অসম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু পক্ষ ছিল বরাবরই সুনির্দিষ্ট। তাই সে গল্পে পিজারো আর তার পেরু অভিযান সম্পর্কে আমরা ঘনাদাকে বলতে শুনি, “হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতাকে যদি জয় করা বলো, খুনি আর শয়তানকে যদি বলো বীর।”[১০৫] গল্পের পর গল্পে এই নির্যাতিত, পরাধীন, শোষিতের পক্ষ অবলম্বন করে গেছেন আসলে লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রই। কখনো ঘনাদার বক্তব্যের মাধ্যমে, কখনো বা তার পূর্বপুরুষের। প্রথাগত অভিযান কাহিনিকে ভাঙতে তিনি আঙ্গিক ও নীতিগত অবস্থান দুদিকেই ঘটিয়েছেন বাঁকবদল।

ঘনাদা সিরিজের নায়ক ঘনাদা কিংবা তার পূর্বপুরুষ। ফলে অভিযান নায়ক হিসেবে সর্বদা পুরুষকেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে এই সিরিজে। তবে অভিযান নায়ক যেখানে নিজেই বাঙালির কল্প অভিযান ও অভিযাত্রীর প্রতি বিদ্রূপ, সেখানে এই বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু পুরুষ অভিযাত্রীই হয়ে উঠেছে। এতকাল বাংলা অভিযান সাহিত্যে যে লিঙ্গের জয়জয়কার চলেছে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিদ্রূপ সেই পুং-অভিযাত্রীদের থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। বরং ‘সূর্য কাঁদলে সোনা’তে পেরুর সূর্যসেবিকা কয়া অ্যাডভেঞ্চারে সফলভাবে সামিল হওয়ার পরেও গানাদো যে তাকে কেবল রক্ষা করার কথাই ভেবেছে, তার জন্য সমালোচনাই করেছেন লেখক ঘনাদার বক্তব্যের মাধ্যমে,

> অবলা অসহায় একটি মেয়ে হিসেবে তাকে রক্ষা করার দায়িত্বটুকুই শুধু স্মরণ রেখে তার স্বাধীন সত্তার কথা যেন ভুলেই ছিলেন এ কয়দিন। আর যাই হোক গানাদোর কিন্তু তা ভোলা উচিত হয় নি। পেরুর কুজকো আর সৌসায় সদ্য কৈশোর পার হওয়া যে মেয়েটি একলা সাহস ও বুদ্ধির এতবড় কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আসতে পেরেছে,

অজানা বিদেশে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে পরগাছা দুর্বল কোনো লতার মত অক্ষম অসহায় হয়ে যাবে ভাবাই ভুল।[১০৬]

ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে তাই গানাদো, "নিরুপায় বোঝা হয়ে থাকবার মেয়ে যে তুমি নও সে কথা আমার মনে রাখা উচিত ছিল। জীবনে এ ভুল আর করব না।"[১০৭] এখানেই নারীকে উদ্ধারকামী হিসেবে দেখার যে মানসিকতা অভিযান সাহিত্যে চলে আসছে, হেমেন্দ্রকুমার রায় কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযান উপন্যাসেও যার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হয়ে গেছে তার সঙ্গে।

একথা তবু খেয়াল রাখা প্রয়োজন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের অধিকাংশ অভিযান উপন্যাসে নারী অভিযাত্রী অনুপস্থিত। 'মনু দ্বাদশ' উপন্যাসে নিকির ভূমিকা শুধু পরজের প্রেমে, পরজের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে পালিয়ে যাওয়া এবং সন্তান ধারণ করায় সীমাবদ্ধ। যদিও 'মনু দ্বাদশ'-এ মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত গোষ্ঠীর কথা রয়েছে এবং বলবীর্যে তারা কম যায় না, কিন্তু প্রধান সমস্ত চরিত্ররা সেখানে পুরুষই। আবার 'সূর্য যেখানে নীল' উপন্যাসে নূরনের সঙ্গিনী থীটার অভিযাত্রী হিসেবে উপস্থিতি দেখা গেলেও, থীটাকে সেখানে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে এবং পুরুষ-নূরনকেই তাকে উদ্ধার করার জন্য বিপদে ঝাঁপ দিতে দেখা যায়। অ্যাডভেঞ্চারে মেয়েদের গলগ্রহ বলে ভাবার পুরাতন ধাঁচটি নিয়ে 'সূর্য কাঁদলে সোনা'তে প্রশ্ন তুললেও, অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যের নারী-পুরুষের লিঙ্গ রাজনীতি নির্ধারিত ছকটি প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পেরেছেন, একথা বলা যাবে না।

ঘনাদা সিরিজে আরও তিনটি উপন্যাস লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে অনেক দূরবর্তী হলেও বিশ্বযুদ্ধ প্রভাবিত পরবর্তী রাজনীতির কিছু কিছু ছাপ রয়ে গেছে সেই উপন্যাসগুলিতেও। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে *মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা*-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর পরিণাম দেখার পরেও উন্নত দেশগুলি তখনও বাড়িয়ে চলেছে পারমাণবিক অস্ত্র সম্ভার। বিজ্ঞানের উন্নতি বনাম মানব সভ্যতার অস্তিত্ব, এই সঙ্কটকালে ঘনাদাকে মঙ্গল গ্রহে পাঠাচ্ছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সেখানের প্রাণীরা মানুষেরই মতো সর্বপ্রকারে, কেবল পুরুষহীন তারা। সেই মাঙ্গলিকদের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে ঘনাদার। পৃথিবীর তুলনায় নাকি প্রাণের বিকাশ ও বিবর্তন আরো আগে হয়েছিল সেখানে। ফলে অনেক আগেই মাঙ্গলিকরা পারমাণবিক যুগে পৌঁছায় এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে গোটা গ্রহকেই ধ্বংস করে ফেলে। কিছু মাঙ্গলিক মাটির তলায় আশ্রয় নিলেও সেই সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। মঙ্গলগ্রহের বর্তমানকে বর্ণনা করতে করতে ঘনাদা যেন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই সাবধানবাণী দিয়ে রাখেন, "হাওয়া ফুরিয়ে জল উবে গিয়ে সূর্যের মারাত্মক আলট্রা-ভায়োলেট আর মহাকাশের কসমিক রশ্মির বর্ষণে ওপরে টিকে থাকা যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন মাঙ্গলিকদের যারা তখনও বেঁচে ছিল সবাই ওই পাতাল রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়, কিন্তু সেখানেও নিয়তির নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পায় না।"[১০৮] আসলে 'মনু দ্বাদশ'-এ মানবসভ্যতার যে পরিণতি দেখিয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, এখানে মঙ্গলগ্রহেরও সেই পরিণতি। তার কারণও অভিন্ন, নিজেদের মধ্যেকার ভয়াবহ পারমাণবিক যুদ্ধ। 'মনু দ্বাদশ'-এর মানবসভ্যতার মতো এখানেও বন্ধ্যাত্ব গ্রাস করছে মাঙ্গলিকদের। পুরুষহীন মঙ্গলগ্রহের ইতিহাস যাতে সচল থাকে, অস্তিত্ব ও বংশ পরম্পরা যাতে টিকে যায় তার জন্যই সেখানে থেকে যেতে বাধ্য হচ্ছে ঘনাদার দুই সঙ্গী। নিজের মিথ্যা তথা গুলকে আঁটোসাটো করতে চেয়ে সঙ্গীদের বর্তমান অনস্তিত্বের কথা যেমন ঘনাদা জানাচ্ছেন, তার সঙ্গে অস্তিত্বের সংকটে বিপদগ্রস্ত জাতির পাশে দাঁড়ানোর বার্তাটুকুও রেখে দিচ্ছেন সহজেই।

‘তেল দেবেন ঘনাদা’ উপন্যাসটি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে *আনন্দমেলা*-এর পূজাবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয় ‘মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা’। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘনায়মান শক্তি-উৎসের বিপন্নতা এই উপন্যাসের মূল বিষয়। তেল কিংবা কয়লার জোগান ফুরিয়ে এলে কীভাবে বলবৎ রাখা যাবে শক্তির ভাণ্ডার, তা নিয়ে গবেষণা যেমন চলেছে, পাশাপাশি শক্তির উৎসগুলির নিয়ন্ত্রণকারীরা হয়ে উঠেছে সর্বেসর্বা। সেই প্রসঙ্গে আরব দেশগুলির সমালোচনাও যেমন উঠে এসেছে উপন্যাসে, তেমনি নতুন শক্তির উৎস যারা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে, “জানি যে, তারা সমস্ত পৃথিবীকে নতুন এক মহাজনি সাম্রাজ্যের ক্রীতদাস করে রাখতে চায়।”[১০৯] এর বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক দ্যুবারিদের লড়াই, যার সহায় হয়েছেন ঘনাদা। দ্যুবারির বক্তব্য, “আমরা সাম্রাজ্য গড়তে চাই না। পৃথিবীর সকলের জন্যে নিতান্ত সস্তায় এমন অঢেল এনার্জির ব্যবস্থা করতে চাই, যা আকাশ-বাতাসকে কোথাও এতটুকু নোংরা করবে না।”[১১০] ধ্বংসপ্রবণ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে মুনাফা ও আধিপত্য করতে চাওয়া মানুষদের বিরুদ্ধে, মানবকল্যাণবাদী বৈজ্ঞানিকদের পক্ষ নিয়েছেন ঘনাদা। পাশাপাশি স্বচ্ছ থেকেছে সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদল সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টি। আরব দেশগুলির তেলের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও তেলের দাম বাড়ানোর প্রসঙ্গে ঘনাদা বলেছেন, “দিনকাল বদলেছে। নইলে আরব দেশগুলির মতো সামান্য ক্ষমতার কোনও রাজ্য আগেকার দিনে বেয়াদবি করলে গ্রেট ব্রিটেন দেখতে-না-দেখতে তিনটে ম্যান অফ ওয়ার পারস্য উপসাগরে পাঠিয়ে সব ঠাণ্ডা করে দিত।”[১১১] এখন বদল ঘটেছে কোথায়? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন আর নেই সেই ক্ষমতায়; কিন্তু আমেরিকার মতো শক্তিধর দেশগুলির পক্ষেও যে তা করা সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ ঘনাদা বুঝিয়েছেন, “এক দলের এয়ারক্র্যাফট কেরিয়ার সেখানে দেখা দিতে-না-দিতেই আর-এক নিশান-ওড়ানো কেরিয়ারকে কাছাকাছি টহল দিতে দেখা যাবে নিশ্চয়।”[১১২] স্পষ্টতই প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানে

আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার দ্বৈরথকে ইঙ্গিত করেছেন। দ্বিমেরু বিশ্বে পরিণত হওয়া পৃথিবীতে কোনো একক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যে যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা নেই তা বুঝিয়ে রেখেছেন লেখক। 'মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা'ও এই দ্বিমেরু বিশ্বের পটভূমিতেই রচিত হয়েছে। দুনিয়া জুড়ে ফাটকা পুঁজির প্রসার ক্ষমতা ততদিনে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শেয়ার বাজারে লগ্নি হওয়া সেই পুঁজি আত্মসাৎ করে, মানুষের সেবায় ব্যয় করতে চাওয়া নুটসনকে পালাতে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে ঘনাদা তার পক্ষ নেওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল থেকেছেন।

ঘনাদার সমগ্র সিরিজ জুড়েই এই পক্ষ নেওয়া নিয়ে নীতিগত অবস্থানটিই আসলে ছদ্ম নায়ক, গুলবাজ ঘনাদাকে সত্যিকারের নায়ক করে তুলেছে। যতোই বাগাড়ম্বর তার থাকুক না কেন, যতোই বানিয়ে তোলা হোক না কেন তার ঝুঠা-অ্যাডভেঞ্চার, শোষিত ও নির্যাতিতের পক্ষে, গণতন্ত্র ও মানবতার পক্ষে মতামত দিতে কখনো ভুল হয়নি তার। অ্যাডভেঞ্চারের বিদ্রূপ করে রচিত যে ছদ্ম অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ, সেই ঘনাদা-সিরিজেই প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখিয়ে গিয়েছেন বাঙালি অ্যাডভেঞ্চার নায়কের নীতিগত অবস্থান আসলে কী হওয়া উচিত ছিল।

বাংলা অভিযান উপন্যাসের ধারায় প্রেমেন্দ্র মিত্র একদিকে যেমন মামাবাবু সিরিজের মাধ্যমে নায়কের প্রথাগত চেহারা ও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এলেন, তেমনি কল্পবিজ্ঞানমূলক অভিযান উপন্যাসগুলিতে বিজ্ঞানের প্রবল দৌরাত্ম্য ও তার সুবিধা ও ভয়াবহতার বহুমাত্রিক চিহ্ন ফুটিয়ে তুললেন। পাশাপাশি অবস্থান নিলেন ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আর ঘনাদা সিরিজের মাধ্যমে বাঙালির বাকসর্বস্ব অভিযান-প্রিয়তার সমালোচনা করতে করতেই রাষ্ট্র ও অভিযাত্রীর সম্পর্কে কীভাবে থেকে যায় সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের চাহিদা, দেখিয়ে দিলেন তাও। কল্পনার অ্যাডভেঞ্চারকে বাস্তববিমুখ না করে তুলে, বাস্তবের যে রাজনীতি অন্তর্লীন থেকে যায় অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে, ফুটিয়ে তুললেন তার স্বরূপ।

নির্দেশিকা ও টীকা

১. গ্রন্থ হিসেবে *কুহকের দেশে*-এর দ্বিতীয় সংস্করণটির সন্ধান পাওয়া যায় যা ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের পৌষে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দাম ছিল দুটাকা ছয় আনা। এর আগে ১৯৪০ সালের একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় *কুহকের দেশে* প্রথম সংস্করণের দাম ছিল এক টাকা। প্রথম সংস্করণটির বর্তমানে সন্ধান পাওয়া যায় না। দে'জ পাবলিশিং কর্তৃক প্রকাশিত *মামাবাবু সমগ্র*-তে সম্পাদক ১৯৬৩ সালে গ্রন্থরূপে *কুহকের দেশে* শ্রীপ্রকাশ ভবন থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানালেও, তার আগেই গ্রন্থরূপে *কুহকের দেশে* উপন্যাসটির হদিশ মেলে।

২. Hourihan, Margery, *Deconstructing the Hero,* Routledge, London and New York, 1997, page no. 57

৩. "One aspect of the identity, as we have seen, is a matter of race but the hero is also dominant over the lower orders of his own people. He is the symbol of an elite."-- Hourihan, Margery, *Deconstructing the Hero,* Routledge, London and New York, 1997, page no. 61

৪. এই 'gentleman' এর স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে হেরিয়ান বলছেন— "The notoriously unstable signifier 'gentleman' suggests education and polite manners, but often also implies an intellectual and moral superiority which justifies and naturalizes the class structure of the society."-- Hourihan, Margery, *Deconstructing the Hero,* Routledge, London and New York, 1997, page no. 62

৫. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, মামাবাবু সমগ্র, দে’জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১০, পৃ-১৩

৬. ঐ, পৃ-১৪

৭. ঐ

৮. ঐ

৯. ঐ

১০. ঐ, পৃ-৩০

১১. ঐ, পৃ-৮৫

১২. ঐ, পৃ-৮৬

১৩. ঐ, পৃ-২১

১৪. ঐ, পৃ-৬০

১৫. ঐ, পৃ-৮১

১৬. ঐ, পৃ-৯৭

১৭. ঐ, পৃ-১০১

১৮. ঐ, পৃ-১০৫

১৯. ঐ

২০. ঐ, পৃ-৯৩

২১. ঐ, পৃ-১৮০

২২. ঐ, পৃ-১৭৩

২৩. ঐ, পৃ-১৮৪

২৪. ঐ

২৫. ঐ, পৃ-২২৪

২৬. ঐ, পৃ-৭৭

২৭. ঐ

২৮. ঐ

২৯. ঐ, পৃ-২০৯

৩০. ঐ, পৃ-৮৮

৩১. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, 'সম্পাদকীয়', *কল্পবিজ্ঞান সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৯

৩২. ঐ, পৃ-১৩৭

৩৩. ঐ, পৃ-১৩৯

৩৪. ঐ

৩৫. ঐ, পৃ-১৫৮

৩৬. ঐ

৩৭. ঐ

৩৮. ঐ, পৃ-১৬৩

৩৯. ঐ, পৃ-১৬৫

৪০. ঐ, পৃ-১৯৮

৪১. ঐ, পৃ-২৩৪

৪২. ঐ

৪৩. ঐ, পৃ-২৩৫

৪৪. ঐ, পৃ-১৯৪

৪৫. ঐ, পৃ-২৪৮

৪৬. ঐ

৪৭. ঐ, পৃ-৩১৯

৪৮. মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস-প্রথম খণ্ড*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ-৫

৪৯. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *কল্পবিজ্ঞান সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৩২১

৫০. ঐ, পৃ-৩২০

৫১. ঐ, পৃ-৩২১

৫২. ঐ, পৃ-৩৪৩

৫৩. ঐ, পৃ-৩৬৩

৫৪. ঐ

৫৫. ঐ, পৃ-৪০১

৫৬. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, 'সম্পাদকীয়', *কল্পবিজ্ঞান সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৭

৫৭. ঐ, পৃ-১০

৫৮. ঐ, পৃ-৩০৯

৫৯. ঐ, পৃ-৩০৮

৬০. ঐ, পৃ-৩১৬

৬১. ঐ, পৃ-৪২১

৬২. ঐ

৬৩. ঐ, পৃ-৪৪৯

৬৪. ঐ, পৃ-৪৪৮

৬৫. গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ*, পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ২০১০, পৃ-৩০

৬৬. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *কল্পবিজ্ঞান সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৪৪০

৬৭. ঐ

৬৮. ঐ, পৃ-৪৩১

৬৯. ঐ, পৃ-৪৩০

৭০. ঐ, পৃ-৪৫৬

৭১. রাসেল, ব্রার্টান্ড, *রাজনৈতিক আদর্শ,* তৃতীয় সংস্করণ, হক, আবুল কাসেম ফজলুল (অনু.), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ-৮০

৭২. নীটশে, ফ্রেডরিক, *জরথুস্ত্র বললেন,* মহীউদ্দীন (অনু.), দিব্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ-২১

৭৩. বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজী, 'মাৎসর্যকথা ও নীট্‌শে', *আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮, দ্রষ্টব্য পৃ-১১১-১৭৪

৭৪. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *কল্পবিজ্ঞান সমগ্র,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৪৫৬

৭৫. চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত (সম্পা), 'প্রেমেন্দ্রমিত্রের মনুদ্বাদশ সম্বন্ধে কয়েকটি অনুমান', *পরিকথা,* দ্বাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, দক্ষিন চব্বিশ পরগণা, মে ২০১০, পৃ-৩০৬

৭৬. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *কল্পবিজ্ঞান সমগ্র,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ-৪৫৬

৭৭. ঐ, পৃ-৪৯১

৭৮. ঐ, পৃ-৪৮৮

৭৯. ঐ, পৃ-৪৯১

৮০. মুখোপাধ্যায়, মধুশ্রী, *'পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র',* সুর, নিখিল এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ (অনু.), সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭, পৃ-২৪৯

৮১. সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭,* দ্বিতীয় সংস্করণ, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ-৪২১

৮২. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র-১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ-২১

৮৩. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র-৩,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ-৪১৯

৮৪. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র-২,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯, পৃ-৬৪৩

৮৫. ১৯৭৪ সালে *SPAN* পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, "ghana-da is a teller of tall tales, but the tales always have a scientific basis. I try to keep them as factually correct and as authentic as possible."-- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র-১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ-৯

৮৬. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tall-tale , last seen 4 july, 2022

৮৭. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য,* দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃ-১৭৬

৮৮. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোলযুগ, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ-৮২

৮৯. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য,* দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃ-১৪৪

৯০. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ-২০

৯১. ঐ, পৃ-১৫৬

৯২. ঐ, পৃ-৬৬

৯৩. দাস, সুমিতা, *কলম্বাসের পর আমেরিকা,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-১১৭

৯৪. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ-৯২

৯৫. ঐ, পৃ-১১৯

৯৬. ঐ, পৃ-২০২

৯৭. ঐ

৯৮. ঐ

৯৯. দাস, সুমিতা, *কলম্বাসের পর আমেরিকা,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-১২৪

১০০. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ-৩০৩

১০১. ঐ, পৃ-২৫১

১০২. দাস, সুমিতা, *কলম্বাসের পর আমেরিকা,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ-১২৭

১০৩. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ-৪২৪

১০৪. ঐ, পৃ-১৮

১০৫. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র-১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ-১৮১

১০৬. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ-৪২৬

১০৭. ঐ

১০৮. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র-২,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯, পৃ-৪৮৮

১০৯. ঐ, পৃ-৫১০

১১০. ঐ, পৃ-৫১৫

১১১. ঐ, পৃ-৫০৪

১১২. ঐ

উপসংহার

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থির চালচিত্র বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে দ্বন্দ্বর্জজর করে তোলার পাশাপাশি শিশু সাহিত্যের অঙ্গনে সূচনা করেছে বিবিধ পরিবর্তন। এই পরিবর্তন স্থির রূপ পরিগ্রহণের তুলনায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চালিয়ে গেছে অবিরাম ভাঙা-গড়া। উপনিবেশবাদের যে প্রভাব উনিশ শতকের পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল শিক্ষিত-বাঙালি অংশের মধ্যে, শিশু সাহিত্যেও তার প্রভাব সুস্পষ্ট। উপনিবেশের শিশু সাহিত্যের ধরন স্বীকৃতি দিতে থেকেছে ঔপনিবেশিক ইউরোপের মতাদর্শকে। তবু সেই পাশ্চাত্য-চর্চার পদ্ধতি ও বিষয়সমূহ বাঙালির ধ্যানধারণায় এনে হাজির করেছে নানা বাঁকাচোরা প্রশ্ন। সামাজিক বন্দোবস্ত সম্পর্কে আত্মতুষ্টির বদলে তৈরি করেছে আক্ষেপ। এই আক্ষেপ সারবত্তা পেতে থেকেছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের বদল ঘটতে থাকার ফলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অপ্রস্তুতভাবে জড়িয়ে পড়া সাধারণ বাঙালি নিজেকে আবিষ্কার করেছে নতুনতর বিশ্বে। পাশাপাশি কৃষিতে বিপর্যয়, খাদ্যশস্যে ঘাটতি, কল কারখানার বৃদ্ধি ও উৎপাদন সম্পর্কের বদলের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা আঘাতপ্রাপ্ত হতে থেকেছে। ঘেরাটোপে বন্দী জীবনের বিপরীতে নতুন আবিষ্কৃত বিশ্ববোধ বাঙালিকে আগ্রহী করেছে অজানা পৃথিবী থেকে অর্জন করতে তথ্যমূলক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। বিশ্বযুদ্ধে উন্নত দেশগুলির প্রযুক্তির আক্রমণাত্মক চেহারা আর ক্ষমতার দাপট জগতে শক্তিশালীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাকে বিশ্বাসী করে তুলেছে। অস্থির পৃথিবীর অজানা পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বাঙালি নির্মাণ করতে চেয়েছে নতুন স্বরূপ। তাই অভিযানে আগ্রহী হয়েছে বাঙালি। উপনিবেশের বাসিন্দার পক্ষে, আর্থ-রাজনৈতিক আটক ও সামাজিক রীতি-রেওয়াজের বন্ধন পেরিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়া সহজ হয়নি। আকাঙ্ক্ষা আর অতৃপ্তির দ্বন্দ্ব থেকে বাঙালি সৃষ্টি করেছে অভিযান সাহিত্য।

নতুন-জানা বিশ্বের উপযুক্ত হয়ে উঠবে আগামীর বাঙালি, এই আকাঙ্ক্ষা থেকে অভিযান সাহিত্য বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের মধ্যে জায়গা করে নিতে থেকেছে। অভিযান সাহিত্য হয়ে উঠেছে বিশেষ এক সাহিত্য বর্গ— স্থানিক সরণ, অভিজ্ঞতা অর্জন, বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা, আবিষ্কার ও নায়ক যার অপরিহার্য উপাদান। হেমেন্দ্রকুমার রায় এই অভিযান সাহিত্যকে প্রথম নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন বাংলায়। ইউরোপে অভিযান সাহিত্য তখন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত। ফলে ইউরোপকেন্দ্রিকতা তার মধ্যে দেখা যাওয়াই স্বাভাবিক। হেমেন্দ্রকুমারের কাহিনির আদলের মধ্যেই যে কেবল ইউরোপীয় অভিযান কাহিনির ছাপ পড়েছে তাই নয়, নায়ক নির্মাণের রাজনীতিও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের দর্শনকে স্বীকৃতি দিয়ে পরিচালনা করেছে হেমেন্দ্রকুমারের অভিযান নায়কদের। ফলে হেমেন্দ্রকুমারের নায়করা হয়ে উঠেছে উপনিবেশবাদী ধ্যানধারণায় গ্রস্ত ও পুরুষতান্ত্রিক পেশিশক্তির আস্ফালনে মুখর। হেমেন্দ্রকুমার ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্যের ধারাই অধিকাংশ অভিযান উপন্যাসে অনুসরণ করেছেন। নায়কের নৈতিক অবস্থান, অপর সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, অভিযানের উদ্দেশ্য হেমেন্দ্রকুমারের অভিযান সাহিত্যকে ঔপনিবেশিক শিকল থেকে মুক্ত হতে দেয়নি। ফলত বিশ শতকের বাঙালির সশস্ত্র সংগ্রামের প্রচেষ্টা, অনুশীলন সমিতির উদ্যোগ, অসহযোগ আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী ধারণার অগ্রগতি পটভূমিতে থাকলেও, হেমেন্দ্রকুমারের বাঙালি অ্যাডভেঞ্চারিস্ট চরিত্রদের মধ্যে ধর্ম, লিঙ্গ, জাতি প্রতিটি বিষয়ে উদারমনস্কতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতি অনুগত মনোভাবই ধরা পড়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযান উপন্যাসগুলি ঔপনিবেশিক মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এমনটা বলা চলে না; কিন্তু স্বল্প সংখ্যক অভিযান উপন্যাসের মধ্যেও ঔপনিবেশিক ভাবনায় তিনি নানামাত্রিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে তার অভিযান

উপন্যাসগুলি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অভিযান উপন্যাসের মতো একমুখী নয়। বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' ইউরোপীয় মতাদর্শের ছাঁচে গড়ে উঠলেও 'হীরামানিক জ্বলে' সেই ছাঁচকে ভেঙে বেরিয়েছে। উপনিবেশ চিন্তা 'হীরামানিক জ্বলে'তে উপস্থিত থাকলেও তা ইউরোপীয় উপনিবেশ ভাবনার বিপরীতে, হিন্দু পুনর্জাগরণ ও হিন্দু উপনিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। ফলশ্রুতিতে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করতে চাওয়ার প্রচেষ্টা সেখানে ধরা পড়বে। তবে একথাও খেয়াল রাখা প্রয়োজন, ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের বিপরীতে হিন্দু-উপনিবেশের স্বপ্ন, ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চারের মূল ছকটি ভেঙে দিতে পারে না। আবিষ্কার ও দখলদারি সেখানেও তাই হয়ে উঠেছে সমার্থক। শক্তিশালী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ন্যায়সঙ্গত করা হয়েছে আধিপত্যকে। পাশাপাশি অপর সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রেণি-ধর্ম-শিক্ষা মাত্রাগুলি দুস্তর ব্যবধান বাড়িয়েছে। পরাধীন ভারত হয়ে উঠেছে পরাধীন হিন্দু-ভারত। ভারতীয়ের ক্ষমতায়ন অর্থে হিন্দু ভারতীয়ের ক্ষমতায়নই কাম্য থেকে গিয়েছে। পুরুষকার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে উদারতা দেখালেও ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত বিভেদমূলক মানসিকতা কার্যকর থেকে গিয়েছে 'হীরা মানিক জ্বলে'তে, হোক না যতই তা বিভূতিভূষণের রোমান্টিকতায় মায়ামেদুর। সামন্তবাদ ও নবায়মান পুঁজিবাদের সংঘাতে ধ্বস্তপ্রায় সামন্তবাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি পুঁজিবাদের মুনাফা সর্বস্ব কর্কশতার বিরুদ্ধাচারণ করেছে যেমন, সামন্তবাদী রক্ষণশীলতার পিছুটানকেও স্বীকৃতি দিয়েছে একই সঙ্গে।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মতো বিভূতিভূষণের অভিযান উপন্যাস একমুখী ঔপনিবেশিক গ্রস্ততায় আচ্ছন্ন থাকেনি। 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসে সাম্রাজ্যলোলুপ যুদ্ধ ও ধ্বংসের বিপরীতে বিভূতিভূষণের মানবদরদি অবস্থানটি উজ্জ্বল হয়ে আন্তর্জাতিকতাবোধকে স্পর্শ করেছে। যুদ্ধ, দারিদ্র্য, মৃত্যুতে আক্রান্ত চীনের সঙ্গে একাত্মতাবোধ অভিযানের উৎকণ্ঠার মধ্যেও এনেছে মরমি

মনোভাব। পাশাপাশি অভিযান নায়কের ব্যক্তিক বিপদ-মোকাবিলার কাহিনি বলতে গিয়ে একটি সামগ্রিক জাতির বাঁচার লড়াইয়ের বর্ণনা হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি। 'মিসমিদের কবচ' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ হেমেন্দ্রকুমারের সভ্যতাগর্বী অভিযান-নায়কদের দৃষ্টিভঙ্গির তো বটেই, এমনকি নিজের উপন্যাস 'চাঁদের পাহাড়'-এ নেওয়া অবস্থানেরও বিপরীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তথাকথিত সভ্যতার হাতে নির্যাতিত আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষের প্রতীকী প্রতিশোধের কাহিনি হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি।

মতাদর্শগতভাবে ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত না হয়েও বিভূতিভূষণের অভিযান উপন্যাসগুলি রোমান্টিকতার স্পর্শে ও লেখকের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনে একরৈখিক থাকেনি। লিঙ্গ রাজনীতির প্রশ্নেও দ্বিধাজর্জর অবস্থান দেখা গিয়েছে বিভূতিভূষণের অভিযান উপন্যাসে। পুরুষতান্ত্রিকতা ভেঙে বেরোতে না পারলেও, পুরুষকার ও নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্ন নিয়ে টানাপোড়েন বিভূতিভূষণের অভিযান উপন্যাসগুলিকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। যুদ্ধ ও হত্যাই যে কেবল পুরুষকারের চিহ্ন নয়, শিল্পসৃষ্টিও আসলে বীরত্বের চিহ্নবহ, এই নিয়ে তর্ক করতে দেখা যাবে 'হীরামানিক জ্বলে' উপন্যাসের চরিত্রদের। 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসে চীনের নারী সৈন্যদের পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কিংবা বিদেশী নারীদের তুলনায় ভারতীয় নারীদের পিছিয়ে থাকা অবস্থার প্রসঙ্গও যেমন আছে, তেমনই নারীকে উদ্ধারকামী ও পুরুষকে উদ্ধারকর্তা মনে করা পুরুষতান্ত্রিক ধারণাও ক্রিয়াশীল থেকেছে। নারী-পুরুষ প্রশ্নে দ্বন্দ্বজর্জর অবস্থানটি বজায় থেকেছে বিভূতিভূষণের।

প্রেমেন্দ্র মিত্র অভিযান উপন্যাস রচনাকালে বিভূতিভূষণের থেকে অনেক বেশী রাজনীতি সচেতন। অভিযান সাহিত্যের ধারায় বহমান ইউরোপকেন্দ্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী ছকটি তিনি ভেঙেছেন সচেতনভাবেই। মামাবাবু-সিরিজে নায়কের অনায়ক-সুলভ চেহারা ও স্বভাব,

দখলদারির লোভমুক্ত বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অভিযানের পরিকল্পনা, অপর সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি, ইউরোপীয় অভিযান কাহিনির ছকটি ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাককাল থেকে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও দাপট প্রেমেন্দ্র মিত্রকে উৎসাহিত করেছে কল্পবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে অভিযান উপন্যাস লিখতে; কিন্তু বিজ্ঞানের এই প্রবল অগ্রগতি যেভাবে ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে দুটি বিশ্বযুদ্ধে তা লেখককে বিজ্ঞান সম্পর্কে মোহাচ্ছন্ন হতে দেয়নি। মানুষের রাজনীতি যে বিজ্ঞানকে ধ্বংসাত্মক করে তুলতে পারে সেই মোহহীন সমালোচনার পাশাপাশি ফ্যাসিবাদ বিরোধী অবস্থানকে দৃঢ়তার সঙ্গে মেলে ধরেছেন লেখক। *কল্লোল* পত্রিকার সূত্র ধরে আসা বাস্তবতার ঝোঁক তার অভিযান কাহিনির মধ্যেও বাস্তব পৃথিবীর শ্রেণি শোষণ ও বর্ণবৈষম্যের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছে। বাস্তবের রাজনীতি, তার কল্পবিজ্ঞান নির্ভর অভিযান কাহিনিকেও সমাজবাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছে। 'পিঁপড়ে পুরাণ' কিংবা 'পাতালে পাঁচবছর' উপন্যাসে যার প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক বোধ তার অভিযান সাহিত্যকে একনায়কতন্ত্র তথা ফ্যাসিবাদ বিরোধী অবস্থানে অটুট রেখেছে। 'শুক্রে যারা গিয়েছিল', 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস' ইত্যাদি উপন্যাসে কিংবা ঘনাদা-সিরিজে যার অজস্র প্রমাণ মিলবে।

বিভূতিভূষণের অভিযান উপন্যাসে আছে উপনিবেশ চিন্তার বৈচিত্র্য, আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিযান উপন্যাসে উপনিবেশবাদের বিরোধিতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি আস্থা এবং যুদ্ধবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান। তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভিযান নায়করা ইউরোপীয় অভিযান নায়কদের মতো কিংবা তাদেরই অনুসরণকারী বাঙালি অভিযান নায়কদের মতো নতুন ভূখণ্ডের খোঁজে বেরোয় না। অজানা জনজাতির মুখোমুখি হলে প্রভু তথা শাসক হয়ে ওঠার চেষ্টা করে

না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের আন্তর্জাতিকতা রাজনৈতিক অভিজ্ঞান থেকে সৃষ্ট। দুই বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক হানাহানি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুনাফাসর্বস্বতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজভাবনাকে আরও শাণিত করেছে। পাশাপাশি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি, আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, দ্বিধা ও সংশয় অভিযান উপন্যাসকেও গভীরতার মাত্রা দিয়েছে। 'মনু দ্বাদশ'-এর মতো উপন্যাস তাই অভিযান উপন্যাস হয়েও দার্শনিক বিতর্কে সমৃদ্ধ রূপ পেয়েছে, পাশাপাশি পরমাণু যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা ও আগামী পৃথিবীর পরিণাম সম্পর্কে বাস্তবসম্মত আশঙ্কাকে প্রকাশ করেছে।

যে সাম্রাজ্যবাদী দর্শনকে স্বীকৃতি দিতে দিতে জনপ্রিয় হয়েছে ইউরোপীয় অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্য এবং তার দ্বারা প্রভাবিত বাংলা অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্য, সেই সাম্রাজ্যবাদের দর্শনই ভয়াল রূপ ধারণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ঘটিয়েছে। আর বিশ্বযুদ্ধে অনিচ্ছায় জড়িয়ে পড়া ভারতবর্ষ তথা বাংলা আক্রান্ত হয়েছে প্রবল দুর্ভিক্ষে, অর্থনৈতিক মন্দায়। যন্ত্রণাকাতর সেই বাংলায় দাঁড়িয়ে, অপারগ বাঙালির কাল্পনিক অভিযানের বিদ্রূপ হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র তুলে ধরেছেন ঘনাদা চরিত্রটিকে। বাঙালির অভিযানপ্রীতিকে ঘনাদার মিথ্যা কাহিনির সমতুল্য রূপে দেখিয়ে বাঙালির বাস্তবতার দিকে নির্দেশ করেছেন তিনি। পাশাপাশি নীতিগত অবস্থানের ক্ষেত্রে লেখক ঘনাদাকে দাঁড় করিয়েছেন ফ্যাসিবাদের বিপক্ষে, ঔপনিবেশিকদের বিপক্ষে, শোষিত মানুষের পক্ষে। মুনাফালোভী, উন্নতিগর্বী সভ্যতা পৃথিবীকে নিয়ে যাবে ধ্বংসের পথে, 'মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা' উপন্যাসে লুকিয়ে আছে সেই অশনিসংকেত। রাষ্ট্র ও অভিযাত্রীর সম্পর্ক সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যে সূত্রকে মেনে গড়ে উঠেছে ইউরোপে, দেশ আবিষ্কার আর দেশ দখলের যে সমার্থকতা সৃষ্টি হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপ থেকে, তার রূপ স্পষ্ট করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র 'সূর্য কাঁদলে সোনা' উপন্যাসে। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের বিপরীতে বিকল্প এক

ইতিহাসের, শোষণ ও শোষিতের ইতিহাসের চর্চা করতে সচেষ্ট হয়েছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বাঙালির ছদ্ম-অ্যাডভেঞ্চার প্রীতির মস্করা করতে করতে পরাধীন ভারত ও তারপর স্বাধীন অথচ তৃতীয় বিশ্বের দেশ হয়ে থাকা ভারতবর্ষের অভিযান কাহিনির ভিন্ন বয়ান নির্মাণ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে, ঔপনিবেশিক নৈতিকতায় গ্রস্ত যে অভিযান কাহিনি বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে সূচিত হয়েছিল হেমেন্দ্র কুমার রায়ের মাধ্যমে, সমসময়ের জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও বিশ শতকের বিশ্ব পরিস্থিতি যে অভিযান কাহিনিকে ইন্ধন জুগিয়েছিল, অপরবর্তনীয় একরৈখিকতায় সেই অভিযান কাহিনি আটক থাকেনি। ঔপনিবেশিক ধারণার গ্রহণ-বর্জনের অসহজ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাকে বিচিত্র পথগামী করে তুলেছেন বিভূতিভূষণ। মতাদর্শের হেরফের না ঘটলেও মানবপ্রীতি ও মমত্ববোধে বিভূতিভূষণের অভিযান উপন্যাস হয়ে উঠেছে সংবেদনায় ভরা। অপরদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সচেতন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বরাজনীতির সঙ্গে যোগ রেখে, সাম্রাজ্যবাদ ও একনায়কত্ব বিরোধী অবস্থান নিয়ে এবং আধুনিকতার সংকটকে ধারণ করে নির্মাণ করেছে মতাদর্শের ভিন্নতা। অভিযান সাহিত্যের যাত্রাপথে ঘটেছে নিয়ত ভাঙচুর ও বাঁকবদল। সুদূর অজানায় কল্পনার ডানা মেলেও অভিযান সাহিত্যের চোখ থেকে গিয়েছে বাস্তবের পৃথিবী ও তার রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের দিকে। সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে তাই অভিযান কাহিনির শরীরী কাঠামো ও নৈতিকতা বদলেই চলেছে। বিশ শতক অতিক্রম করে এসেও তার পরিবর্তনশীলতা থমকে যায় নি। সেই পরিবর্তনের স্বরূপ ভিন্নতর গবেষণার বিষয় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

গ্রন্থ তালিকা, পত্রপত্রিকা ও অন্তর্জাল

ক. আকর গ্রন্থ

- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-১,* জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০১ বঙ্গাব্দ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-২,* জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০২ বঙ্গাব্দ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-৪,* জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী-৫,* জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ভাদ্র ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *কল্পবিজ্ঞান সমগ্র,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬
- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *কিশোর ঘনাদা সমগ্র,* শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ২০১১
- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *কিশোর সাহিত্য সম্ভার,* শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১
- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৩
- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র-১,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০
- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র-২,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯
- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র-৩,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০
- মিত্র, প্রেমেন্দ্র, মামাবাবু সমগ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *আবার যখের ধন,* দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *কিশোর সাহিত্য সম্ভার,* শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *ছোটদের অমনিবাস,* এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১১
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *জয়ন্ত-মানিক সমগ্র-১,* দেব সাহিত্য কুটীর প্রা: লি:, কলকাতা, ২০২০
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *জয়ন্ত-মানিক সমগ্র-২,* দেব সাহিত্য কুটীর প্রা: লি:, কলকাতা, ২০২০

- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *জয়ন্ত-মানিক সমগ্র-৩*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রা: লি:, কলকাতা, ২০২০
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *জয়ন্তের কীর্তি*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০৮
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *দেড়'শ খোকার কাণ্ড*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রা: লি:, কলকাতা, ২০০৮
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার-জয়ন্ত-মানিক অ্যাডভেঞ্চার সমগ্র*, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১৯
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *বিমল-কুমার সমগ্র ১*, দেবসাহিত্য কুটীর প্রা: লি:, কলকাতা, ২০২১
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *রহস্যের আলোছায়ায়*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২১
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮২
- রায়, হেমেন্দ্রকুমার, *হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৭৬
- সেন, অশোক (সম্পা.), *অ্যাডভেঞ্চারের গল্প*, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০

খ. সহায়ক গ্রন্থ

খ.১. বাংলা

- আব্বাস, খাজা আহম্মদ, *ফেরে নাই শুধু একজন*, সরকার, শ্রীনেপালশঙ্কর (অনু.), জিজ্ঞাসা, কলকাতা, মাঘ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ
- কবিরাজ নরহরি (সম্পা.), *উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০৯
- গঙ্গোপাধ্যায়, আশা, *বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)*, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৫৯
- গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ*, পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ২০১০
- ঘোষ, কালীচরন, *জাগরণ ও বিস্ফোরণ (১৭৫৭-১০৯৭)*, প্রথম খণ্ড, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৭
- ঘোষ নির্মাল্য কুমার, *বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্য পাঠের ভূমিকা*, ছোঁয়া, কলকাতা, ২০২০
- ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.), *সাময়িক পত্রের আলোকে প্রথম মহাযুদ্ধ*, পারুল, কলকাতা, ২০১৫

- ঘোষ বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯
- ঘোষ বিনয় (সম্পা), *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* তৃতীয় খণ্ড, বীক্ষণ, কলকাতা, ১৯৬৪
- চট্টোপাধ্যায় গৌতম, *রুশবিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন,* অবভাস, কলকাতা, ২০১৬
- চট্টোপাধ্যায় পার্থ, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার,* আনন্দ, কলকাতা, ২০১৯
- চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে মুক্তচিন্তা,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, মাঘ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, *বঙ্কিম রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ
- চট্টোপাধ্যায়, শরৎ, *শরৎ রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, শরৎ সমিতি, কলকাতা, কার্তিক ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ
- চৌধুরী, দুলাল এবং সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পাদকমণ্ডলী), *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ,* দ্বিতীয় সংযোজন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* নবম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৮
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৯
- দত্ত রায়, তিস্তা, *বাংলা শিশু সাহিত্য রায়বাড়ি ও পরম্পরা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪
- দত্ত, শ্রীক্ষীরোদকুমার, *ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি,* অনুশীলন সমিতি ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন কমিটি, কলকাতা, ১৯৭৭
- দাস, অমিতাভ, *শ্রীকান্ত: শিল্প ও জীবন,* রূপা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬
- দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সম্পা.), *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,* প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দি ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৩৭
- দাস, সুমিতা, *কলম্বাসের পর আমেরিকা,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১৫
- নীটশে, ফ্রেডরিক, *জরথুস্ত্র বললেন,* মহীউদ্দীন (অনু.), দিব্য প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪
- পাল, বিপিনচন্দ্র, *নবযুগের বাংলা,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১২
- বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন (সম্পা.), *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন,* বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলকাতা, ১৯৮১
- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, *আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য সনদ,* প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১২
- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, *রবীন্দ্রনাথ: শিশু সাহিত্য,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০০

- বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *আবার শিশুশিক্ষা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১০
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস,* কারিগর, কলকাতা, ২০১৩
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *বাংলা শিশু সাহিত্যের ছোট মেয়েরা,* গাঙচিল, কলকাতা, আষাঢ় ১৪১৪ বঙ্গাব্দ
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র, *যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র,* তৃতীয় সংস্করণ, মিত্র এণ্ড ঘোষ, কলকাতা, ১৯৪৪
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশী থেকে পার্টিশন ও তারপর,* দ্বিতীয় সংস্করণ, রায়, কৃষ্ণেন্দু (অনু.), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০১৬
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামসুন্দর, *ভারত ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ,* মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ
- বসু, অঞ্জলি (সম্পা.), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান,* দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬
- বসু, বাণী (সং), *বাংলা শিশুসাহিত্য: গ্রন্থপঞ্জী,* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা, ১৯৬২
- বাগল যোগেশচন্দ্র এবং মুখোপাধ্যায় শুভেন্দুশেখর, *হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত,* তালপাতা, কলকাতা, ২০০০
- বোভেয়ার, সিমোন দ্য, *দ্বিতীয় লিঙ্গ,* সিংহ কঙ্কর (অনু.), র‍্যাডিকাল, কলকাতা, ২০১১
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* দ্বাদশ সংস্করণ, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০
- ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকমল, *রচনা-সংগ্রহ,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৬
- ভট্টাচার্য, সুভাষ (সম্পা.), *সংসদ বাংলা অভিধান,* পঞ্চম সংস্করণ, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, কলকাতা, ২০১৩
- মার্কস কার্ল, *ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী (৬৬৪-১৮৫৮),* প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১
- মাৎসুলেনকো, ভিক্তর, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,* পাল, বিজয়(অনু.), প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৭
- মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, *খগেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী,* ভারতী সাহিত্য প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯
- মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, *শতাব্দীর শিশু সাহিত্য (১৮১৮-১৯৬০),* আকাদেমি সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯
- মিত্র মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, *ঠাকুরমা'র ঝুলি,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
- মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৫৫

- মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৫৬
- মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ
- মুখোপাধ্যায়, মধুশ্রী, *পঞ্চাশের মন্বন্তরে চার্চিলের ষড়যন্ত্র,* সুর, নিখিল এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ (অনু.), সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭
- রাসেল, ব্রার্টান্ড, *রাজনৈতিক আদর্শ,* তৃতীয় সংস্করণ, হক, আবুল কাসেম ফজলুল (অনু.), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২
- রায়, অলোক, *বিশ শতক,* প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬
- রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য,* দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০
- লাহিড়ী, অবনী, *তিরিশ চল্লিশের বাংলা,* সেরিবান, কলকাতা, ২০১৫
- শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ২০০৯
- সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৫
- সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, *ভবঘুরে শাস্ত্র,* সিংহ, রণজিৎ (অনু.), চিরায়ত, কলকাতা, ২০০৯
- সুইফট, জনাথন, *গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত,* মজুমদার, লীলা (অনু.) সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, ২০১১
- সেনগুপ্তা, সুবোধচন্দ্র (প্রধান সম্পা.) এবং বসু, অঞ্জলি (সম্পা.), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান-প্রথম খণ্ড,* সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৩
  সেন, নবেন্দু, *বাংলা শিশু সাহিত্য তথ্য, তত্ত্ব, রূপ ও বিশ্লেষণ,* পুথিপত্র, কলকাতা, ২০০০
- সেন, সুকুমার, *ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮
- সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (?-ষোড়শ শতাব্দী),* প্রথম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৬
- সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী),* দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
- সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৮০১-১৮৮০),* তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

- সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১৮৯১-১৯৪১)*, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৬
- সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোলযুগ, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ
- সেহানবীশ, চিন্মোহন, *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে,* রিসার্চ ইন্ডিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৬০
- হালদার, জীবনতারা, *অনুশীলন সমিতির ইতিহাস,* র‍্যাডিকাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০১৬
- হালদার, জীবনতারা, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতির ভূমিকা,* প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৮৯

খ.২. ইংরাজি

- Abrams, M.H., *The Mirror and the Lamp*, Oxford University Press, New Delhi, 1953
- Albert Edward, *History of English Literature*, Fifth Edition, Oxford University Press, New York, 2003
- Arnold, Matthew, *Culture & Anarchy*, Cambridge at the University Press, London, 1966
- Burke, John, An illustrated *History of England*, Book Club Associates, London, 1981
- Cohen, J.M. (Ed.), *The Four Voyages of Christopher Columbus*, Penguin Books, Middlesex, 1969
- Cawelti, John G., *Adventure, Mystery and Romance*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1976
- Daiches, David, *A Critical History of English Literature-Volume IV*, Second Edition, Allied Publishers Private Limited, New Delhi, Mumbai, Kolkata,
- D'Ammassa, Don, *Encyclopedia of Adventure Fiction*, Facts On File, New York, 2009Chennali, Nagpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Lucknow, 2004
- Engels Frederick and Marx Karl, *On the National and Colonial Questions (Selected Writings)*, Ahmed Aijaz (Ed.), Leftword, Delhi, 2011
- Glenn W. and Stowe, William W. (editors), *The Poetics Of Murder*, Most, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, Sandiego, Newyork, London, 1946
- Harari, Yuval Noah, Sapiens *A Brief History of Humankind*, Vintage Books, London, 2014
- Hourihan, Margery, *Deconstructing the Hero,* Routledge, London and New York, 1997
- Las, J., *The Hero: Manhood and Power*, Thames and Hudson, London, 1995
- Pakenham, Thomas, *The Boer War*, Illustrated Edition, Random House, London, 1994
- Stefanson, Dominic, *Man as Hero: Hero as Citizen*, School of History and Politics, The University of Adelaide, 2004

- Thomson, David, England in the Nineteenth century (1815-1914), Penguin Books, Middlesex, 1966

খ.৩. পত্রপত্রিকা

- চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত (সম্পা), *পরিকথা,* দ্বাদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, দক্ষিন চব্বিশ পরগণা, মে ২০১০
- ভট্টাচার্য, বীতশোক এবং সামন্ত, সুবল (সম্পাদকমণ্ডলী), *এবং মুশায়েরা,* ডন কুইকসোট সংখ্যা, কলকাতা, ২০০৭
- ভৌমিক, তাপস (প্রধান সম্পা.), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা,* পুরাতন প্রকাশনী সংখ্যা, কলকাতা, প্রাক শারদ ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

খ. ৪. আন্তর্জালিক তথ্যসূত্র

- Arnoulad, Jaques, and Venayre, Sylvain, *THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF ADVENTURE,***https://www.publicbooks.org/the-history-and-philosophy-of-adventure/,** 3rd January 2015, last seen 29 June, 2022
- Farmer, Doyen, *The evolution of adventure in literature and life,* https://www.santafe.edu/~jdf/papers/adventure4.pdf, last seen 29 June, 2022
- https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tall-tale , last seen 4 july, 2022

রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা
তত্ত্বাবধায়ক

সৈকত ব্যানার্জী
গবেষক